ব হু রূ পে—

বহুরূপে

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড,
কলিকাতা-৩৭

প্রকাশক :
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস

প্রথম সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

প্রচ্ছদপট
শিল্পী : শ্রীধীরেন বল

মুদ্রাকর :
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭

মূল্য সাড়ে ছয় টাকা

এই লেখকের

পঞ্চপ্রদীপ (গল্প-সংগ্রহ)	২.৫০
প্রধূমিত বহ্নি (উপন্যাস)	৪.০০
ভস্মাবশেষ (উপন্যাস)	৪.০০

উৎসর্গ

কল্যাণীয়া শ্রীমতী ছন্দাকে

জ্যাঠামণি

ভ্রমণকাল—ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৬৫ (ইং সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮)। ১৩৬৬ সনের বৈশাখ হইতে চৈত্র মাস পর্যন্ত 'প্রবাসী' মাসিক পত্রে "জটার জালে" নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে; নতুন নামকরণ করেছেন শ্রদ্ধেয় শ্রীসজনীকান্ত দাস। ছবিগুলি উত্তর-প্রদেশ সরকারের প্রচার বিভাগ থেকে পেয়েছি, ছবির ব্লকগুলি 'প্রবাসী'র সৌজন্যে প্রাপ্ত। এই উপলক্ষে তাঁদের সকলকেই আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। ইতি

লেখক

"যে রূপ দেখিনু সই, স্বরূপে তোমারে কই
জল ভরিতে বিসরিনু।"

জ্ঞানদাস
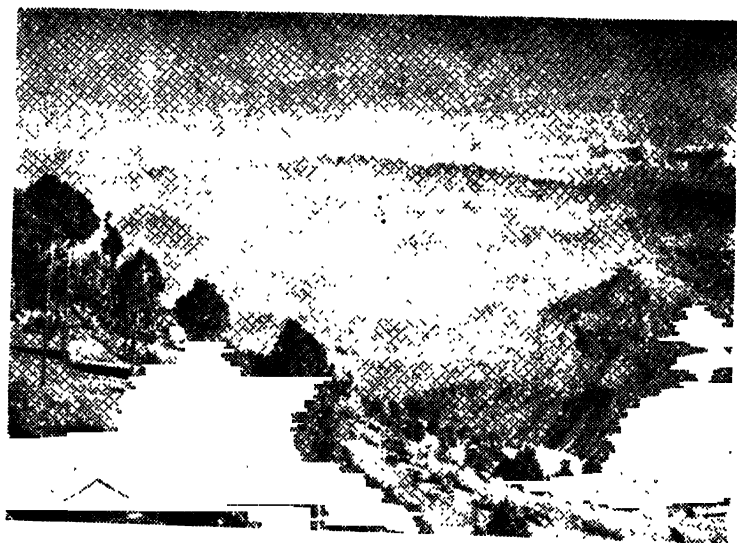
বিচিত্র হিমালয়

কেদারনাথ

ত্রিযুগীনারায়ণের মন্দির

অলকানন্দা
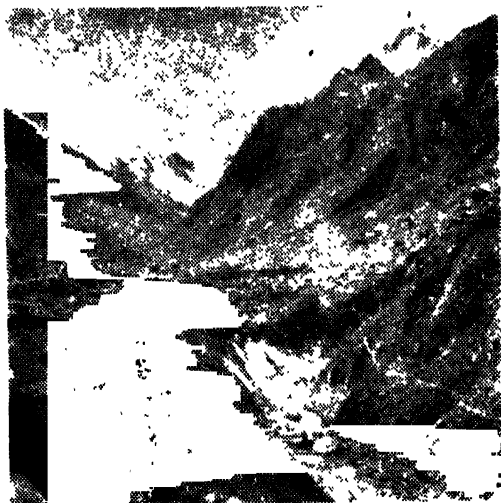
বদরীনাথ—দূর থেকে

পিপুলকুঠির পথ
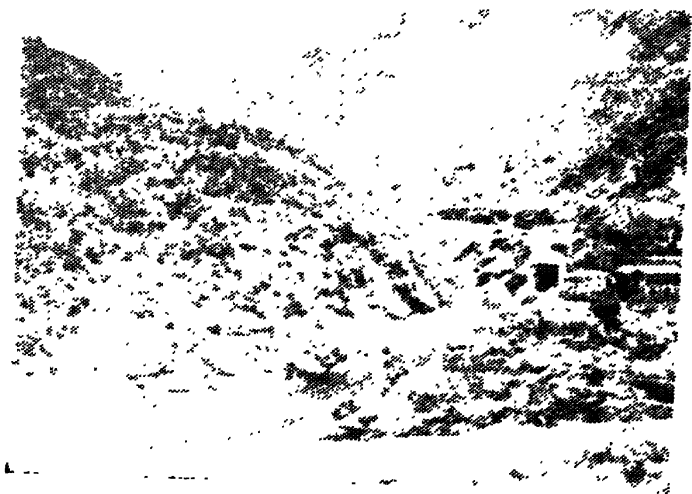
রুদ্রপ্রয়াগ

ঋষিকেশের গঙ্গা

গৌরীকুণ্ড

জয় কেদারনাথজীকী—

মাটির দিকে চোখ। সামনের দিকে ঝুঁকে পা দুটিকে টেনে টেনে শম্বুকগতিতে এগিয়ে চলছিলাম। যেন পায়ের নীচের পাথরের মতই ভারী পা দুটি; আর তেমনই শক্ত। পেশীগুলি প্রায় অসাড়, মুড়তে গেলেই কনকনে ব্যথা লাগে হাঁটুতে। অকারণে বলা যায় না। প্রায় চার মাইল খাড়া চড়াই একরকম একদমে পার হয়ে এসেছি—মোট ৩,০০০ ফুটেরও বেশী। মনের মধ্যে তাড়া তো ছিলই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রকৃতির তাড়না। নির্দয় মনিব অনিচ্ছুক ঘোড়াকে যেমন মারে, প্রায় তেমনই করেই সারাটা পথ আমার উপর কশে চাবুক চালিয়েছে বৃষ্টির ধারা। থামবার উপায়ই ছিল না।

সে কি বৃষ্টি! মুষলধারে বৃষ্টিপাত কথাটা ছেলেবেলা থেকেই বইয়ে পড়ে আসছি। বাংলাদেশের স্বাভাবিক স্বর্গমর্ত্য একাকার করা ধারাবর্ষণ দেখে মনে করেছি যে, ওকেই বুঝি বলে মুষলধারে বৃষ্টিপাত। আসল জিনিস সেই দিনই সকালে প্রথম দেখলাম। তেমন গায়ে গায়ে লাগা পেঁজা তুলোর আঁশের মত ধারা মোটেই নয়। ধারা বলেই মনে হয় না। উপর থেকে যা পড়ছে তা এক একটি ফোঁটা ঠিকই, তবে মুষলের মতই মোটা এবং ভারী। সে আবার বরফের মুষল। আমার আপাদমস্তক পুরু বর্ম দিয়ে ঢাকা হলে কি হবে? তিন-চার পরতের গরম জামা বা মোজা ভেদ করেও ওর এক একটি ফোঁটা যেন চামড়ায় গিয়ে লাগে। তবু সেখানেই শেষ নয়। সে ফোঁটা চামড়া ভেদ না করেও ওর ভিতর দিয়ে নির্ঘাত হাড়ে ঢুকে তাতে কাঁপন লাগিয়ে দেয়। ওদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার একমাত্র উপায়ই হল যথাসম্ভব ছুটে চলা। পাঁচটি মিনিটও দাঁড়িয়ে ভিজতে গেলে শিরার মধ্যে উষ্ণ রক্তও যে জমে বরফ হয়ে যাবে!

চোখ দুটি খোলা থাকলেও সামনের কিছুই চোখে পড়ছিল না। ছাতা খুলে মাথায় দিয়েছি। ওতেই তো চোখ—মানে চোখের সামনের সম্পূর্ণ

দৃশ্যটাই ঢাকা পড়ে গিয়েছে। [illegible] আবার চোখের দৃষ্টি পড়ে আছে নিজেরই চরণ দুখানির উপর। তাও ওই আত্মরক্ষারই জন্য। খাড়া চড়াই পার হয়ে অপেক্ষাকৃত সমতলভূমিতে এসে কোথায় একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচব, না তখনই শুরু হল এই নতুন উৎপাত।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য—উৎপাত করছে বাঁধানো পথ। নিশ্চয়ই আমাদের সুবিধার কথা ভেবেই পথ বাঁধিয়েছেন কর্তারা ; পাকা করেছেন কাঁচা রাস্তা। কিন্তু সে কি পাকা করা! আড়াআড়ি করে পাতা হয়েছে পাথরের ইট, বল্লমের মত উঁচু হয়ে আছে ওদের মাথাগুলি। প্রতি দুখানা ইটের মাঝেই ইঞ্চি দুয়েক ফাঁক। ওই সব ফাঁকে খাঁজে খাঁজে অতি সন্তর্পণে পা ফেলে অত্যন্ত সতর্ক ভাবে পা টিপে টিপে চলছিলাম। হোক না কম এ পথে পা পিছলে ধরাশায়ী হবার সম্ভাবনা, কিন্তু চতুর্গুণ ভয় জাগে পায়ের অঙ্গুলিগুলি এবং গোড়ালির নিরাপত্তার জন্য। পা ফেলতে একটু যদি ভুল হয় তো এক বা একাধিক অঙ্গুলি চক্ষের পলকে একেবারে বিপরীতমুখী হতে পারে। তা যদি নাও হয়, জুতোর কল্যাণে অঙ্গুলিগুলি বেঁচেও যদি যায় তা হলেও অসতর্ক ভাবে ফেললে পা মচকাবে নির্ঘাত।

সেই ভয়েই সামনের দিকে ঝুঁকে সমস্ত মনোযোগ দুই চোখের ভিতর দিয়ে তীক্ষ্ণধার শিলাকীর্ণ পথের উপর নিবদ্ধ করে শম্বুকগতিতে এগিয়ে চলছিলাম। এমনই অবস্থায় কানে এল—জয় কেদারনাথজীকী—

অতিপরিচিত সম্ভাষণ। ঋষিকেশে বাসে উঠে বসবার পর থেকেই সকলের মুখেই ওই সম্ভাষণ শুনে শুনে এতদিনে রীতিমত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। অভ্যস্ত হয়েছি ঠিক ওই ভাষাতেই প্রতিসম্ভাষণ করতেও। শ্রীকেদারনাথের পথে এই হল গিয়ে রীতি। সুতরাং মনের কোন তাগিদেরও প্রয়োজন হল না, বচনেন্দ্রিয় প্রতিধ্বনির মতই উচ্চারণ করল, জয় কেদারনাথজীকী—

তার পরেই কানে এল, আ তো গয়ে, বাবুজী।

সচেতন হয়ে অনুধাবন করল মন যে, ওটি চেনা স্বর। নিমন্ত্রণের অপেক্ষা না করেও সেই দেবপ্রয়াগ থেকে যে আমাদের সঙ্গে আসছে, আমাদের সমস্ত দুষ্টবুদ্ধি বিরক্তির বিষে ডুবিয়ে যাকে ছাড়াবার জন্য পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করেও আমরা সফলকাম হই নি, সেই আমাদের পাণ্ডারই কণ্ঠস্বর। সুতরাং হাতের বাঁকা ছাতাটি সোজা করে নিজেও থেমে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম।

সঙ্গে সঙ্গেই হাতের ছাতা মাটিতে পড়ে গেল, মাথা থেকে পা পর্যন্ত

বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারের শিহরণ অনুভব করলাম যেন। দুটি চোখের দৃষ্টি এক নিমেষেই অচল হয়ে গেল।

মরি মরি! কি অপূর্ব দৃশ্য! অদূরে শ্রীকেদারনাথের মন্দির। তার পিছনে দুর্গাপ্রতিমার চালচিত্রের মত বিচিত্র কারুকার্যখচিত অমলধবল পর্বতশ্রেণী। কিরীটমণ্ডিত অর্ধবৃত্তের আকার। যেমন বিরাট তেমনই বিচিত্র। গায়ে গায়ে লাগা পাহাড়, নীচে থেকে ধাপে ধাপে আকাশ পর্যন্ত উঠে আবার বিপরীত দিকে ধাপে ধাপে নেমে এসেছে। গঠনের পারিপাট্যে ব্যষ্টির বৈশিষ্ট্য নিশ্চিহ্ন হয়েও সমগ্রের বিপুল ও বলিষ্ঠ একতা বৈচিত্র্য হয়ে প্রস্ফুটিত। মনে হয় যেন একখানি পাথরই কুঁদে কুঁদে গড়া হয়েছে ওই বিশাল চালচিত্র। এক একটি শিখর যেন এক একটি কলকা—ময়ূরপুচ্ছের আকার। ওর নীচে খাঁজকাটা মসৃণ বক্ষে স্তবকে স্তবকে খোদাই করা কারুকার্য, আগাগোড়া রুপোর। পিছনে নির্মেঘ আকাশের নিবিড় নীলিমার পটভূমিকায় বৃষ্টিবিধৌত নির্মল শুভ্রতা-অপার্থিব আলোকে ঝলমল করছে।

বরফ-ঢাকা কেদারনাথ পর্বতশ্রেণী। জড়প্রকৃতির আকস্মিক সৃষ্টি গঠনের পারিপাট্যে অপ্রাকৃত মহিমায় মহিমান্বিত। একখানি যেন ছন্দোবদ্ধ পাথরের কবিতা।

প্রথম দর্শন অবশ্য নয়। পূর্বেও দেখা গিয়েছে এই পর্বতশ্রেণী। অগস্ত্যমুনি ছাড়বার পর থেকেই থেকে থেকে আভাস পেয়েছি তুষারধবল এই কেদারনাথ শৃঙ্গের। অনেক পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে হাতছানি দিয়েছে এই শুভ্র মহিমা। কিন্তু তা ছিল ওই ইঙ্গিতই—আভাসের আমন্ত্রণ মাত্র। সমগ্রের সম্পূর্ণ প্রকাশ দেখলাম এই প্রথম। দেখে অভিভূতের মত চেয়ে রইলাম।

পাণ্ডা আবার বললে, ওই দেখ বাবু, কেদারনাথজীর মন্দির।

দেখবার জন্য চোখ নামাতে হল। কেবল তুলনায় নয়, আসলেও ছোট। সাদাসিধে পাথরের মন্দির। মঠের আকার। চূড়ায় ত্রিশূল, না চক্র—হয়তো বা দুই-ই এক সঙ্গে। সোনালী রঙ—সোনারও তৈরি হতে পারে। এত দূর থেকেও মনে হল যে ঝকঝক করছে।

দক্ষিণ-ভারতের একাধিক বিরাট আকাশচুম্বী অনবদ্য কারুকার্য-খচিত একাধিক মন্দির দেখা চোখ আমার। সেই চোখেও পলক পড়ে না। যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখছি। পরিবেশের সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছে

ওই ছোট্ট মন্দিরটি—যেমন [illegible] জননীর ললাটে ছোট্ট সিন্দূর-বিন্দুটি।

কী আছে ওই মন্দিরে যার আকর্ষণে এই দুর্গম পথে পায়ে চলার দুঃসহ ক্লেশ হাসিমুখে সহ্য করে দেশদেশান্তর থেকে অগণিত নরনারী এখানে ছুটে আসে?

অবসন্ন পা দুটিতে কোথা থেকে যে অত শক্তি এল কে জানে! বাকি পথটুকু যেন লাফিয়ে লাফিয়েই অতিক্রম করলাম। মন্দাকিনীর উপরকার পুল পার হয়ে আবার খানিকটা চড়াই ভেঙে সোজা গিয়ে উঠলাম মন্দিরে। ধূলাপায়ে দেবদর্শনই তো শাস্ত্রের বিধান।

পূজার উপকরণ পাণ্ডাই সংগ্রহ করে নিয়ে এল। কি এক রকমের এক মুঠো ডাল, দু-একটি পেড়াজাতীয় মিষ্টান্ন, চন্দন-কুমকুমের সঙ্গে আরও কি কি বুঝি মিশিয়ে খানিকটা ঘন তরল পদার্থ এবং কিছু ফুলপাতা। পুরোহিত বিনা বাক্যব্যয়ে মন্দিরের দ্বার খুলে দিল।

প্রায় একতলার সমান উঁচু নিরাবরণ চত্বর। আয়তনে তেমন বড় না হলেও ফাঁকা মাঠের মধ্যে বেশ বড় দেখায়। ওটা অতিক্রম করলে সঙ্কীর্ণ বারান্দা বা নাটমন্দির। ওর পিছনে দু-ধাপ সিঁড়ি। নামলে তবে মন্দির। বিরাট সিংহদ্বারের কবাটের গায়ে মোটা মোটা পেরেকের বড় বড় ছাতাগুলি দূর থেকেও দেখা যায় ঝকঝক করছে। তা ছাড়া অলঙ্করণ বলতে একমাত্র চোখে পড়ে চত্বরের কেন্দ্রস্থলে পাথরের বৃষভমূর্তি। সমগ্র অনুভূতি এক সুগভীর শূন্যতার। শ্মশানচারী শিবের মন্দিরের পরিবেশ শ্মশানের মতই রুক্ষ ও রিক্ত। যাত্রীর ভিড় যদি না থাকে তো ওখানে দাঁড়ালে গা ছমছম করে।

ওর চেয়েও বেশী গায়ে কাঁটা দিল ঢং ঢং ঘণ্টার আওয়াজ শুনে। চত্বর থেকেই মন্দিরের প্রবেশ-পথে লোহা না দস্তার প্রকাণ্ড দোদুল্যমান ঘণ্টা চোখে পড়েছিল আমাদের। ওই ঘণ্টা বাজিয়ে যাত্রীর উপস্থিতির জানান দিতে হয় মন্দিরের দেবতাকে। ওটা যাত্রীরই অবশ্যকর্তব্য হলেও থমথমে পরিবেশে এসে মনের তৎকালীন বিহ্বল অবস্থায় করতে ভুলে গিয়েছিলাম আমরা। সে ত্রুটি সংশোধন করে দিল আমাদেরই পাণ্ডা।

গমগম করে উঠল প্রতিধ্বনি। বাতায়নহীন বদ্ধ ঘরে যেন আছাড় খেয়ে পড়তে লাগল ক্রমান্বয়ে এক দেওয়াল থেকে আর এক দেওয়ালের গায়ে।

সে যেন গুরুগম্ভীর মেঘগর্জন। আর কেবলই কী ধ্বনি! যেন কায়া আছে তার। নিজের দেহে সে ধ্বনির স্পর্শ অনুভব করছি, ওর চাপ পড়ছে আমার মাথার উপর, পিছন থেকে আমাকে যেন ঠেলে এগিয়ে দিচ্ছে তা।

রোমাঞ্চিত দেহ ও অভিভূত মন নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলাম।

একটিমাত্র প্রবেশদ্বার বাদ দিলে নীরন্ধ্র মন্দির। ভিতরে অন্ধকার। নিবিড়, তবে নিশ্ছিদ্র নয়। মন্দিরের এক কোণে একটি মাত্র প্রদীপ জ্বলছে। ওর প্রভাবেই ঈষৎ স্বচ্ছ হয়েছে অন্ধকার। তার ভিতর দিয়ে আবছায়া মত চোখে পড়ে শ্রীকেদারেশ্বরের বিরাট বিগ্রহ।

না, বিগ্রহ নয়। চোখ দুটি মোটামুটি অভ্যস্ত হতেই বুঝতে পারলাম যে, সেটি বিপুলায়তন এক শিলাখণ্ড, না, সম্পূর্ণ একটি পাহাড়ই! তবে নিঃসংশয়ে অসাধারণ। নীচের দিকটা যেমনই মোটা তেমনই সূক্ষ্ম ওর চূড়া। উচ্চতায় আমার মত লম্বা মানুষকেও ছাড়িয়েই উঠেছে বোধ করি। বিচিত্র গঠন—স্তরে স্তরে বিন্যস্ত বিভিন্ন উপকরণসজ্জায় সজ্জিত সুগঠিত একখানি যেন নৈবেদ্য। ঠিক শিখর থেকেই নাতিগভীর মোটা একটি রেখা ব্রাহ্মণের উপবীতের মত ভিত্তি পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। তাতেই আরও স্পষ্ট হয়েছে স্তর থেকে স্তরের পার্থক্য। দুই বা ততোধিক পাহাড় পরস্পরের নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে যেন এক বিচিত্র পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

আবছায়া রূপ নিঃসংশয়ে মনকে অভিভূত করবার মতই। সাধ হল আরও অভিনিবেশ সহকারে দেখবার। কিন্তু সময় কোথায়? পাণ্ডা তাড়া দিয়ে বললে, শীগগির পূজা কর বাবু, ভোগের সময় হয়ে এল।

পূজার অনুষ্ঠান অনাড়ম্বর। কিন্তু উপাসক ও উপাস্যের সম্বন্ধ এখানে অন্তরঙ্গ। কেবলই ফুলপাতার অঞ্জলি দেওয়া নয়, সুযোগ পেলাম চন্দন-কুমকুম বিগ্রহের অঙ্গে স্বহস্তে লেপন করবার। বার বার মাথা ঠেকিয়ে প্রণামও করলাম বিগ্রহকে—না আলিঙ্গন? দুটি হাতেই কেবল নয়, ললাট ও বুকেও নিবিড় স্পর্শ অনুভব করলাম। তৈলাক্ত কোমল স্পর্শ। কতকাল ধরে লক্ষ লক্ষ ভক্তের অর্ঘ্য ঘৃত-মধু-চন্দন-কুমকুম কঠিন শিলাদেহের উপর স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে কোমল ও পেলব করে রেখেছে শ্রীকেদারেশ্বরের স্পর্শ।

কিন্তু বড় ঠাণ্ডা। নিঃসংশয়ে পাথর। স্বয়ম্ভূ নিশ্চয়ই—মাটি ফুঁড়ে যে উঠেছিল তা বেশ বুঝতে পারছি। তবু মন ভরে না।

এই কি শিব? কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের মিল দেখতে পাই নে। আর

কল্পনাই বা কেন বলি। ধ্যানের মন্ত্রে দেবাদিদেব মহাদেবের যে মূর্তি কল্পিত হয়েছে সেই রজতগিরিনিভ, অহিভূষণ, পিনাকপাণি, মহাযোগীশ্বর মূর্তি চোখ ফোটবার পর থেকেই তো কত বার কত ভঙ্গিতে দর্শন করেছি। এ কেদারেশ্বর তো সে শিব নন!

বারে বারেই তাকাচ্ছি দেখেই বোধ করি আমাদের পাণ্ডা আমার মনের অবস্থা অনুমান করে আশ্বাসের স্বরে বললে, সন্ধ্যার পর আরতি হবে বাবু। তখন দেখবেন কেদারনাথজীর শৃঙ্গারবেশ।

সে তো সাজ-সজ্জার চটক। তাতেই কি দূর হবে যে অভাববোধ এখন আমার মনকে এমন পীড়া দিচ্ছে? আবার ফিরে তাকাই। দর্শন এখন আর তেমন কষ্টসাধ্য নয়। অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়েছে চোখ। ঘৃত-প্রদীপের শিখাও এখন মনে হয় অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল। সেই আলো পড়েছে শ্রীকেদারেশ্বরের দেহে; বেশ দেখা যায় এখন। কিন্তু যা দেখছি তা তো আকার-ময়, কেবলই আয়তন। নিঃসংশয়ে বিরাট, কিন্তু মহিমা কোথায়? আর এ যে দেখছি কৃষ্ণবর্ণ! ঘৃত-প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোকে মনে হয় যে, সমস্ত মন্দিরে এতক্ষণ ছড়িয়ে ছিল যে অন্ধকার তাই যেন মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে পুঞ্জীভূত হয়ে কঠিন আকার পরিগ্রহ করেছে।

অতৃপ্ত অন্তর নিয়েই বেরিয়ে এসেছিলাম, হঠাৎ কানে এল আমার সঙ্গীর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর: ওই দেখুন মণিদা, আসল কেদারনাথ।

বুঝতেই পারি নি এতক্ষণ যে বৃষ্টি থেমে গিয়ে রোদ উঠেছে। আর তাও কি যেমন তেমন রোদ! গলিত সোনার ঢল নেমেছে যেন! মুখ ফিরিয়ে অনেকখানি চোখ তুলে সেই রোদে আবার দেখলাম মন্দিরের পিছনে সেই বিরাট চালচিত্র। সঙ্গে সঙ্গেই বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটি প্রায় এক হাত লাফিয়ে উঠল যেন। ঠিকই তো বলেছে জিতেন—ওই তো কেদারনাথ!

ওই তো মহাদেব—বিপুল মহিমাসমন্বিত রজতশুভ্রদেহ শঙ্করের প্রত্যক্ষ প্রকাশ। ওই তো স্পষ্ট দেখছি তাঁর কটিতে শার্দুল-চর্মের সংক্ষিপ্ত আবরণ, ওই তো তাঁর ত্রিশূল, ওই তো ফণিভূষণ তাঁর বাহুতে ও গলায়, ওই তো তাঁর উন্নতগগনস্পর্শী মস্তকে বিপুল জটার নিবিড় বন্ধন থেকে সদ্যোমুক্ত জাহ্নবীর কল্লোলিত প্রবাহ, ওই তো তাঁর শুভ্র ললাটের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত তৃতীয় নয়নে ধিকিধিকি জ্বলছে বহ্নিশিখা। কিন্তু অতি প্রশান্ত হাস্যময় মুখ।

সদ্য-মেঘমুক্ত মধ্যাহ্ন-সূর্যের কোমল সোনালী কিরণে উদ্ভাসিত হয়েছে

পিছনের তুষারমৌলী পর্বতশ্রেণী। শিখরের সঙ্গে শিখরের পার্থক্য এখন বেশ বোঝা যায়; স্পষ্ট চোখে পড়ে এক একটি শিখরের বিচিত্র গঠন—ত্রিশূলেরই আকার যেন ওদের একটির। তীক্ষ্ণ বাটালি দিয়ে কোঁদা পাথরের পিচ্ছল মসৃণতার মত ফাঁকে ফাঁকে খাঁজগুলিও আরও স্পষ্ট হয়েছে। বেশ দেখা যায় এক একটি পাহাড়ের সারা অঙ্গ জড়িয়ে জড়িয়ে শূন্যগর্ভ শুষ্ক জলপ্রপাতের লম্বিত গতিপথগুলি। বরফের নীচে স্বাভাবিক পিঙ্গলবর্ণ পাহাড়ের মেখলার, ঊর্ধ্বে এক একটি শৃঙ্গ পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘরাশিকে ভেদ করে মোটা মোটা রেখায় বিক্ষিপ্ত করে উপরে উঠে গিয়েছে। রূপের মধ্যে অরূপের আভাস এনেছে সোনালী রোদ; সেই সোনাই আবার শূন্য গভীরতাকে পূর্ণ করে বর্ণ ও আকার দিয়েছে তাকে। সোনার জলে স্নান করে তুষারের শুভ্রতা এখন আরও বেশী শুভ্র, খাঁজ ও গহ্বরের স্বাভাবিক অন্ধকার আবার ওরই প্রতিফলনে অগ্নিশিখারই মত চিক চিক করছে।

জিতেন আবার বললে, পূজো যদি করতে হয় তো ওই শিবকেই। আমি চললাম ওই উপরে।

খপ করে হাত ধরে ফেললাম তার। বললাম, এখান থেকেই প্রণাম কর।

যাওয়া কি আর হয়—পায়ে পায়ে বাধা। অথচ কতদিন থেকেই সাধ, মহাপ্রস্থানের পথে নিজেও একবার যাত্রা করে পরখ করে নেব সশরীরে স্বর্গে যাবার উদ্দেশ্যে পঞ্চপাণ্ডব আসলে কতখানি ক্লেশ সহ্য করেছিলেন। মনের সাধ মুখেও প্রকাশ করে বলতাম যখনই কোন অন্তরঙ্গের সাক্ষাৎ মিলত। বলেছিলাম একদিন জিতেনকেও।

বিচিত্র প্রকৃতির মানুষ ওই জিতেন। ওর নিজের মুখেই ওর চল্লিশ বছরের জীবনের অনেক বিচিত্র কাহিনী শুনে মাঝে মাঝে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়েছি আমি। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা—যেমন জেলখানার সাহচর্যের ভিতর দিয়ে—তেমন বেশী না থাকলেও যেটুকু ছিল তারই জন্য ওর কোন কাহিনীই অবিশ্বাস করতে পারি নি। জীবনের যাত্রাপথে প্রায় প্রত্যেক মানুষকেই মাঝে মাঝে গতি পরিবর্তন করতে হয়। কিন্তু ও যখনই গতি পরিবর্তন করেছে তখনই একেবারে বিপরীত দিকে। কিশোর বয়সে কোন দাদার কাছে যেন তার দীক্ষা হয়েছিল যাকে সাহিত্যের ভাষায় বলে অগ্নিমন্ত্র তাইতে। পরে সে

দীক্ষা নিয়েছিল আধ্যাত্মিক গুরুর কাছে। রীতিমত মস্তক মুণ্ডন করে, কৌপীন বহির্বাস ধারণ করে পিতৃদত্ত নাম পর্যন্ত বর্জন করে গুরুর আশ্রয়ে গুরুভাইদের সঙ্গে সাধনাও শুরু করেছিল সে। তৃতীয় পর্বে সে আবার গৃহী—তার গুরুদেবের আদেশেই নাকি সে বিয়ে করে সংসারী হয়েছে।

তার সঙ্গে দেখা আমার হয়েছে কম, কিন্তু দেখেছি তার প্রায় প্রত্যেকটি রূপই। আজ সে স্বদেশী ডাকাত, কাল সে চোরাকারবারী; আজ তার গৈরিক বসন, কাল সে স্যুট পরে স্ত্রীকে নিয়ে সিনেমায় যাচ্ছে হলিউড-মার্কা ছবি দেখতে। কাল গিয়েছে তার অর্ধাশন, আজ সে দু হাতে খোলামকুচির মত টাকা ছড়াচ্ছে। কোন্‌টা যে তার আসল রূপ তা ঠিক করতে পারি নি। তবে গত বছর দুই যাবৎ মনে হচ্ছিল যে, অনেক ঘাটের জল খাওয়ার পর শেষ পর্যন্ত সে অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত এক বন্দরে জীবন-তরণীর নোঙর ফেলেছে।

ধূমকেতুর মতই মাঝে মাঝে আবির্ভাব হত তার। কিন্তু আমার কাছে আবদার ও আমার উপর দৌরাত্ম্য তার চলত—যেমন ছিল বছর পঁচিশ আগে ঢাকা জেলের রাজবন্দী-ওয়ার্ডে আমাদের বাধ্যতামূলক সহ-অবস্থানের সময়ে। বছরে অন্ততঃ একটি বার আমাকে সে তার বাসায় টেনে নিয়ে যেতই। সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করে এবং তার স্ত্রী বেচারীকে সাধ্যাতীত পরিশ্রম করিয়ে চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় দিয়ে অতিথিসৎকার করত সে।

সেই জিতেন—বছরখানেক আগে তাকে একদিন আমার এক আড্ডায় পেয়ে কথায় কথায় মুখ ফুটে মনের ইচ্ছা প্রকাশ করে ফেলেছিলাম। বলেছিলাম পরিহাসের সুরেই, কিন্তু শুনে সে রীতিমত বিস্মিত হয়েই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, এই শরীর নিয়ে খাস হিমালয়ের চড়াই-উতরাই ভাঙতে পারবেন আপনি ?

উত্তর দিয়েছিলাম, নিশ্চয়ই পারব, তবে লক্ষ্মণভাই যদি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন।

সেই আমার কৃতকর্মের ফল। ভাদ্র মাসের গোড়ার দিকে একদিন সে ঝড়ের মত আমার ঘরে ঢুকে বললে যে, পনর দিনের মধ্যে আমি যদি স্বেচ্ছায় তার সঙ্গে মহাপ্রস্থানের পথে তার সহযাত্রী না হই তবে সে আমাকে তার কাঁধে তুলে নিয়েই নির্দিষ্ট দিনে যাত্রা শুরু করে দেবে।

আমার সব ওজর-আপত্তি তার উৎসাহের ঝড়ের মুখে একমুষ্টি শুষ্ক তৃণের মত উড়ে গেল।

একরাশ পাতলা ও মোটা, সচিত্র ও অচিত্রিত ইংরেজী ও বাংলা বই আমার টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে উপসংহারে সে বললে, আমাদের আগে গিয়ে যাঁরা কেদারবদরী দেখে এসেছেন তাঁদের লেখা ভ্রমণকাহিনী এগুলি। অবসরমত চোখ বুলিয়ে নেবেন একবার।

আমি হাত দিয়ে বইগুলি সরিয়ে রেখে উত্তর দিলাম, আমি নিজেই যখন ওদিকে যাচ্ছি তখন নিজের চোখ দুটির উপর অপরের অভিজ্ঞতার ঠুলি চাপাতে যাব কেন? আমি যেতে চাই সংস্কারমুক্ত মন আর সাদা খোলা চোখ নিয়ে।

কিন্তু মন বাদ দিলেও দেহ থাকে, চোখ বাদ দিলেও দেহের অবশিষ্ট যা থাকে তার প্রয়োজনকে তো তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সে প্রয়োজন মেটাবার জন্ত অভিজ্ঞজনের পরামর্শ নিতে হল।

অভিজ্ঞতা যে বিচিত্র তার প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া গেল পরামর্শের বৈচিত্র্য থেকেই। সকলেই বলেন যে, যথাসম্ভব হালকা হয়ে চলতে হবে। কিন্তু তাঁরা যে ফর্দ দাখিল করেন তার প্রত্যেকটিই দীর্ঘ এবং কোন দুজনের দেওয়া "অবশ্য প্রয়োজনীয়" দ্রব্যের তালিকা সম্পূর্ণ এক নয়। খতিয়ে দেখে চমকে উঠি—তিল তিল করে নিলেও এ যে নির্ঘাত তাল হয়ে উঠবে। দুর্বল মনের উপর চাপ পড়ে—এ কোন্ বনবাসে চলেছি যে এত সব খুঁটিনাটি জিনিস অবশ্যই সঙ্গে নিতে হবে! সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করতে রীতিমত হাঁপিয়ে উঠলাম। মনে মনে একটু যেন বিরক্তও হলাম জিতেনের উপর—সেই তো ওই পাণ্ডববর্জিত দেশে আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

কতকটা ওই রকম মনের অবস্থা নিয়ে যাত্রার দিন দুই আগে জিতেনের বাসায় গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম যে বেশ একটু অতিরঞ্জিত করেই সুরমাকে বলব তার স্বামীর পাল্লায় পড়ে আমার নাজেহাল অবস্থার কথা। কিন্তু যা ঘটল তা সম্পূর্ণ বিপরীত।

গিয়ে দেখি যে, জিতেন বাসায় নেই। তাতে অবশ্য আতিথ্যের কমতি হল না। কিন্তু তার স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে দেখি যে, কেমন যেন থমথম করছে সে মুখ। ও যে বজ্রগর্ভ মেঘ তা টের পেলাম একটু পরেই। চায়ের পেয়ালাটি আমি নিঃশেষ করবার আগেই সুরমা বললেন, ওকে নাচিয়ে যে তুললেন, শেষরক্ষা করতে পারবেন তো?

চমকে উঠে বললাম, আমি নাচিয়ে তুললাম ওকে? তাই বলেছে নাকি জিতেন?

বলতে হবে কেন? আমি কি এতই বোকা?—বলে আমার মুখের দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসলেন তিনি।

ওই হাসির অর্থ বুঝি। ওতে ইঙ্গিত রয়েছে আমার সমগ্র অতীত জীবনের দিকে। অতীতে আমি যে ছেলে-ছোকরাদের নাচিয়ে বেড়িয়েছি, আরামের গৃহ থেকে টেনে এনে দুর্যোগের রাত্রে দুর্গম পথে তাদের ঠেলে দিয়েছি তা তো আমার অস্বীকার করবার জো নেই। সুতরাং অমন মিথ্যা অভিযোগটিও হাসিমুখে হজম করে উত্তরে সুরমাকে বললাম, তুমি ভাবনা করো না দিদি। কত লোকই তো আজকাল ওদিকে যাচ্ছে, নির্বিঘ্নে ঘরে ফিরেও আসছে তারা।

সুরমা বললে, অত লোককে তো আমি চিনি নে, চিনি আপনাকে।

মানে—আমি যে নির্বিঘ্নে ফিরে আসতে পারব, সে বিশ্বাস তোমার নেই—তাই বলছ নাকি সুরমা?

না না: বেশ যেন অপ্রতিভ হয়েই সুরমা প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু পরক্ষণেই মুখের ভাব একেবারে বদলে গেল তাঁর। করুণ চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে অনুনয়ের স্বরে তিনি আবার বললেন, তবু আপনার সঙ্গে উনি যাচ্ছেন বলেই ওঁকে ছেড়ে দিলাম আমি। ওঁর সব ভার রইল আপনার উপর।

এ কথারও প্রতিবাদ করা চলে না। সুতরাং মনে মনে আমি অস্বস্তি বোধ করতে থাকলেও আশ্বাসের স্বরেই সুরমাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে, প্রবাসে জিতেনকে আমিই আগলে রাখব। সুরমার আশঙ্কার কোনই কারণ নেই।

একেই বুঝি ইংরেজীতে বলে টেবিল ওলটানো। ওর প্রথম ফল হল এই যে, জিতেনের সম্ভাব্য প্রয়োজনের কথা ভেবে আবার নতুন করে অবশ্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ফর্দ প্রস্তুত করলাম আমি—নতুন করে কেনাকাটাও করতে হল। ফলে লটবহর যা জমল তার আকার হিমালয়কে মনে করিয়ে দেবার মতই।

রেলের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় সহযাত্রীদের সঙ্গে অনেক ঝগড়া করে দুজনেই গলদঘর্ম হয়ে অনেক কষ্টে বাক্স বিছানা ঝোলাঝুলি যথাসম্ভব নিরাপদ স্থানে গুছিয়ে রাখবার পর চারিদিকে চেয়ে যখন বুঝতে পারলাম যে, অন্ততঃ সে রাত্রে শোয়া দূরে থাক্, পা দুটিকে কোন বেঞ্চের নীচেও সম্পূর্ণ ছড়িয়ে দিয়ে বসতে পারব না তখন জিতেনকে উদ্দেশ করে বললাম, গাড়িতে উঠে বসলে কি হবে, এ জন্মে আমার আর সশরীরে স্বর্গে যাওয়া হল না।

আমার উদ্দেশ্য ছিল একটু লঘু পরিহাস করা—যাতে তৎকালীন অসহ্য অবস্থা কতকটা সহনীয় হয়। কিন্তু জিতেন অপ্রত্যাশিত গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করে বসল, কেন?

চেয়ে দেখি বেশ ভার ভার মুখ তার—কেমন যেন অন্যমনস্ক ভাব। তথাপি পরিহাসের স্বরটি বজায় রেখেই আমি বললাম, দেখছ না আমার লটবহর—আমার পাপের বোঝা! এই নিয়ে কেউ স্বর্গে যেতে পারে?

হঠাৎ কি যেন হল জিতেনের। সে আমার মুখের দিকে চেয়ে প্রায় উদ্ধত স্বরেই বললে, এর চেয়েও বড় বাধা আছে মণিদা, জানেন, কি তা?

কি?

কর্তব্যজ্ঞান।

সর্বনাশ! বলে কি জিতেন! এরই উপর নির্ভর করে আমি এই দুর্গম পথে প্রায় নিরুদ্দেশযাত্রা করছি!

কিন্তু এখন আর ফেরবার উপায় নেই। গাড়ি চলতে শুরু করেছে।

ভোর হল লাকসার স্টেশনে। দিনের আলো স্পষ্ট হয়ে চোখে ধরা পড়বার আগেই হিমালয় চোখে মায়াকাজল বুলিয়ে দিল যেন।

মায়াকাজলই হবে। নইলে ইতিপূর্বে পাহাড়-পর্বত কতই তো দেখেছি। এই তো গাড়িতে আসতে আসতেই হাজারিবাগ, গয়া ও মীর্জাপুর পার হতে হতে সারি সারি কত পর্বতশ্রেণী দেখে এলাম। কিন্তু সেই ভোরের আলোতে হিমালয়ের যে রূপ চোখে পড়ল তা মনে হল অদৃষ্টপূর্ব।

নাই বা ঝলকে উঠল তার তুষারের মুকুট, নাই বা মেঘলোককে ছাড়িয়ে উঠল তার উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ। তথাপি সহজ তার আকর্ষণ, আর তা অপ্রতিরোধ্য।

উত্তরে দিগন্ত অদৃশ্য হয়েছে। গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ঠিক চোখের সামনেই যা দেখছি তা নিরেট পাহাড়ের দুর্গপ্রাকার যেন। রেলপথের সমান্তরালে চলেছে তো চলেইছে। কোথাও ফাঁক নেই, ছেদ থাকলে পিছনের সারিতে তার দ্বিগুণ ক্ষতিপূরণ। সেখানে আরও কঠিন পাথরের আরও নিরেট গাঁথনির দ্বিতীয় প্রাকার—আরও বিপুল তার আয়তন, উচ্চতায় সামনের সারিকে ছাড়িয়ে উঠেছে। কঠিন, কিন্তু রুক্ষ নয়; পাথর, কিন্তু কালো নয়—কেমন যেন গেরুয়া গেরুয়া রঙ।

কিন্তু তা কেবল পাদদেশে। চোখের পাতা ঈষৎ একটু তুলতেই গাড়িতে বসেই বেশ দেখা যায় যে, হাত তিনেক উঁচুতেই নিষ্প্রাণ পাষাণের বক্ষ বিদীর্ণ করে বিজয়ী প্রাণের ধ্বজা উড়ছে। বিপুল অরণ্যসম্পদে সমৃদ্ধ এই পর্বতশ্রেণী। বিরাট এক-একটি মহীরুহ সোজা আকাশে উঠে গিয়েছে। তাদের শাখায় শাখায় নিবিড় কোলাকুলি। নীচে লতাগুল্ম ও তৃণের প্রাচুর্য—নাম জানি না সব গাছের, তবে সব গাছই অচেনাও নয়। শাল-অশ্বত্থ চোখে পড়ছে, বড় বেশী চেনা আম-জামের হাতছানিও থেকে থেকে দেখতে পাচ্ছি। হঠাৎ বিপরীত দিকের জানলা দিয়ে চোখে পড়ে গেল সমতল-ভূমিতে পাশাপাশি কয়েকটি পেয়ারা বাগান এবং আরও একটু নীচে কার্পেটের মত সুদৃশ্য ও কোমলদর্শন সবুজ ধানের ক্ষেত।

তার পরেই দুদিকেই বড় রকমের একটি ছেদ পড়ল। গাড়ি একটি পুলের উপর উঠছে। নীচে ছোট একটি নদী ; ওর অপরিসর অগভীর গর্ভে শেষ বর্ষার নিস্তরঙ্গ—ঘোলা জল।

সহযাত্রী কজন রাজপুতানী প্রায় গানের সুরেই সমস্বরে বলে উঠল—জয় জয় গঙ্গামাইকী জয়।

আমি চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম, এই গঙ্গা নাকি হে জিতেন ?

হেসে উত্তর দিল সে, তা গঙ্গা না হলেও তাঁর কোন সহচরী নিশ্চয়ই হবেন। ইনিও তো জটার জাল থেকেই বেরিয়ে আসছেন দেখতে পাচ্ছি।

ততক্ষণে গাড়ি পুল পার হয়ে এসেছে, নদী আর চোখে পড়ে না। সুতরাং জিতেন যাকে জটার জাল বলে বর্ণনা করল সেই অরণ্যসমন্বিত পর্বতশ্রেণীর দিকে চেয়ে আমি অন্যমনস্কভাবে বললাম, হরিদ্বার এসে গেল নাকি ?

তাও আবার জিজ্ঞেস করছেন ?—উত্তর দিল জিতেন : দেখছেন না গেরুয়া রঙ ? হরিদ্বার সন্ন্যাস-আশ্রমের আশ্রয় বলেই পাহাড়ও এখানে সন্ন্যাসীর গেরুয়া ধারণ করছে।

সত্য হলেও অর্ধসত্য। ওই বর্ণনা খাটে বড়জোর মাটি থেকে হাত তিনেক উঁচু পর্যন্ত। তার পরেই অন্য রঙ। দেরাদুনের পথ। পাহাড় এখানে সত্য হলেও যেন গৌণ ; মুখ্য দৃশ্য এদিকে বন। কি ডাইনে কি বাঁয়ে, কি মাটিতে কি পাহাড়ের চূড়ায় চোখে পড়ে কেবল গাছ আর গাছ।

ছাড়া ছাড়া আলাদা আলাদা গাছ নয়, অসংখ্য বৃক্ষের বিরাট ও বিপুল সমগ্রতা। শেষ বর্ষার প্রকৃতি—ইন্দ্রের উদার ও অপরিমেয় দাক্ষিণ্যে সমৃদ্ধ। নীচে পাহাড়ের শিলাময় দেহের মত উপরে গাছের শাখাগুলিও নিবিড় পত্রপুঞ্জের অন্তরালে অদৃশ্য। পাতায় পাতায় একাকার। চোখে যা পড়ে তা কেবল পুঞ্জ পুঞ্জ বর্ণ। সবুজ নয়, যেমন দেখেছিলাম কেরল রাজ্যে—রাজধানীর প্রবেশদ্বারে, কন্যাকুমারীর ছায়াশীতল পথের ধারে ধারে। ভারতের এ উত্তর সীমা দক্ষিণ সীমান্তের ঠিক বিপরীত না হলেও অন্য রকম নিশ্চয়ই। অরণ্যের নিবিড় শ্যামলিমা এখানে নবদুর্বাদলশ্যাম নয়। এই যদি শ্যামবর্ণ হয় তো গোকুলের শ্যামচাঁদ ছিলেন নিঃসংশয়ে কালো।

তবে অবিসংবাদিত এ দৃশ্যের বৈশিষ্ট্য। যে দেশে আমরা থাকি, প্রায় হাজার মাইল দীর্ঘ যাত্রাপথে যে সব জনাকীর্ণ জনপদ ও পল্লী আমরা পার হয়ে এলাম তাদের সঙ্গে এ রাজ্যের পার্থক্য স্থূল ইন্দ্রিয়ের কাছেও প্রকট। এ যদি স্বর্গের দ্বার হয় তবে স্বর্গ নিশ্চয়ই পৃথিবী থেকে ভিন্ন।

আমার পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অধিকাংশই এরই মধ্যে ওই পার্থক্য সম্বন্ধে তীব্রভাবে সচেতন হয়েছে। স্তরের পর স্তর নিবিড় শ্যামবর্ণ পর্বতশ্রেণীর দিকে চেয়ে মনে হয় যে, উত্তাল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ শ্যামল সমুদ্র যেন অকস্মাৎ কোন দেবাদিদেবের দর্শন লাভ করে সসম্ভ্রম বিস্ময়ে নির্বাক ও নিশ্চল হয়ে গিয়েছে। এ যুগের দুর্দান্ত দ্রুতগামী বাষ্পীয় শকটেও যেন সংক্রামিত হল আদিযুগের সেই সম্ভ্রম ও বিস্ময়ের এক একটি পরমাণু। শ্লথ হল গাড়ির গতি, স্তব্ধ হল লৌহগজের তীক্ষ্ণ কর্কশ বৃংহিত।

বাইরে মাঝে মাঝে বসতি চোখে পড়ে, কিন্তু জনপ্রবাহ ক্ষীণ। সহযাত্রীরা অনেকেই নেমে গিয়েছে, গাড়ির ভিতরে ভিড় এখন অনেক কম। জিতেন দেখছি তন্ময় হয়ে হিমালয়ের শোভা দেখছে। সকলের মধ্যেই যেন কিছু-না-কিছু সংক্রামিত হয়েছে ধ্যানমগ্ন গিরিরাজের শান্ত গাম্ভীর্য।

সুতরাং হরিদ্বার স্টেশন দেখে তেমন বিস্মিত হলাম না। হৈ-হল্লা একেবারে নেই। প্ল্যাটফর্মের উপরেই কয়েকটি গাছ—একটি তো বিশাল মহীরুহ। সেটিরই নীচে খান-দুই টেবিল পাশাপাশি সাজিয়ে সরকারী রেস্তোরাঁর চায়ের দোকান বসেছে। রুটির সঙ্গে যে মাখন পেলাম তা দুধ না দই থেকে সদ্যতোলা সাদা রঙের টাটকা জিনিস—যেমন গন্ধ তেমনি স্বাদ। যিনি প্রাতরাশ পরিবেশন করছিলেন তিনিই পিছনে প্ল্যাটফর্মের বাইরে একটি

পাকাবাড়ি দেখিয়ে আমাকে বললেন যে, ওইটিই খোদ রেলদপ্তরের পরিচালিত হোটেল।

এতক্ষণ বুঝতে পারি নি, এবার বুঝলাম, কত উঁচু দিয়ে আমাদের গাড়ি চলে এসেছে। প্রাসাদের মত উঁচু বিশ্রামগৃহ। তবু এখানে দাঁড়িয়েই তার ছাদের উপরটা বেশ দেখতে পাচ্ছি—যেন একটু এগিয়ে গিয়ে পা বাড়ালেই সে পা গিয়ে পড়বে ওই ছাদের উপর। শহর আরও নীচে। বিহ্বলের মত একবার উত্তরে পাহাড় ও দক্ষিণে শহর দেখছি লক্ষ্য করে, পরিবেশক ভদ্রলোকটি আবার বললেন, এই হোটেলেই উঠতে পারেন আপনারা। সরকারী হারে ভাড়া দিতে হবে, খাবেন আমাদের নিরামিষ রেস্তোরাঁতে।

নিরামিষ কেন!—আমি বিস্মিত হয়ে বললাম।

উত্তর পেলাম: এ তো তীর্থস্থান। এখানে মাছ-মাংস খাওয়া বা দেওয়া বারণ।

নাতিদীর্ঘ প্ল্যাটফর্মটির এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত আবার নিরীক্ষণ করে দেখলাম। গাড়ি চলে গিয়েছে। প্ল্যাটফর্ম প্রায় শূন্য। সোনা-ঝলমল রোদ ছড়িয়ে পড়েছে খোলা জায়গায়, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে গলে গলে পড়ছে আমাদের 'মুখের 'পরে, চোখের 'পরে।' কেমন যেন সংশয় জাগল মনে—রেলের স্টেশন নাকি এটি! কণ্বমুনির আশ্রম মনে করতেও বাধা নেই।

॥ ২ ॥

আশ্রমেই গিয়ে উঠলাম। কল্পনার আশ্রমের সঙ্গে বাস্তবের মিল যথেষ্ট। তবে নবযুগের নতুন সংস্করণ এটি। দেবতা এখানে রোগক্লিষ্ট মানুষ, সাধনা তাদের সেবা। কনখলে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাশ্রম—মানে আধুনিক হাসপাতাল। স্বহস্তে রোগীর সেবা করেন মিশনের সাধু ও ব্রহ্মচারীরা।

অতিথিশালাও আছে। সেখানে ঘরের আরাম। অতিরিক্ত লাভ সাধুসঙ্গ।

দেখবার মত কি আছে হরিদ্বারে? প্রশ্ন শুনে হাসলেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। ঐরাবতের অহঙ্কার চূর্ণ করেছিলেন জাহ্নবী স্বীয় প্রবল জলপ্রপাতের বেগে মুগ্ধ দাম্ভিককে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে। স্বামীজী যে ফিরিস্তি দিলেন তাও আমার জিজ্ঞাসার অহঙ্কার চূর্ণ করবারই মত। মাসখানেক ঘুরে ঘুরে দেখলেও এত সব দ্রষ্টব্য স্থানের কেবল বাহ্যরূপটাও বুঝি দেখা শেষ হবে না। সুতরাং লম্বা তালিকার দু-চারটি মাত্র জায়গায় লাল পেনসিলের টিক চিহ্ন দিয়ে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরেই বেরিয়ে পড়া গেল।

বাড়ি বলব, না আশ্রম? পথ চলতে চলতে যেদিকে তাকাই কেবল ওই প্রশ্নই মনে জাগে। গাছ আর গাছ। গাছের জন্য আকাশ যেন চোখেই পড়ে না। প্রাসাদের মত এক একখানা বাড়ি যেন ঢাকা পড়ে আছে বিরাট প্রাঙ্গণজোড়া অযত্নরক্ষিত বড় বড় বাগানের অন্তরালে। অধিকাংশই হয় মন্দির, নয় মঠ। ধর্মশালাও আছে। তাদের দু-একটি দখল করেছে পাঞ্জাবী বা সিন্ধী রিফিউজিরা। বাকিগুলি ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। ফাঁকা ফাঁকা লাগছে রাজপথও।

তবে শুনলাম, ঐ যে বড় বড় প্রাসাদগুলি এখন খাঁ খাঁ করছে, শূন্য পড়ে আছে বিরাট বিরাট এক একটি প্রাঙ্গণ, সেইগুলিই যে কোন একটি যোগের সময় মৌমাছির চাকের মত রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভরে উঠবে; পথের ধারে গাছের নীচেও তখন স্থান পাবে না অনেক যাত্রী।

তার মানে এখন যেমন আমাদের কলকাতা! মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম যে, কুম্ভমেলা বা অন্য কোন যোগস্নানের সময় এটি নয়।

কনখলের শান্তস্নিগ্ধ পরিবেশে শাশ্বত যোগভূমির আভাস পাচ্ছি যেন।

কিন্তু এই গঙ্গা নাকি! জিজ্ঞাসা করতে করতে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে যা দেখলাম তাতে মনটা দমে গেল।

নিঃসংশয়ে খরস্রোতা। ঘাটেই যে বড় বড় শিলাখণ্ডগুলি দেখছি জলের উপর মাথা তুলে আছে তাও মনে হল যেন স্রোতের টানে কাঁপছে। কিন্তু ওপার যে একেবারে চোখের সামনে। জলের কাছাকাছি নরম পলিমাটি চোখে পড়ছে, উপরে শ্যামল শস্যক্ষেত্র। যত তাকাই ততই মনে হয় যে পূর্ববঙ্গে এই ভাদ্র মাসে এরকম শুকিয়ে যাওয়া খাল আমরা তো দেখেছি দু-একখানা গ্রাম পরে পরেই।

তুলনায় অনেক বেশী প্রশস্ত যে কল্লোলিনী স্রোতস্বিনী, একটু পরেই রিকশা চড়ে পুলের উপর দিয়ে পার হয়ে গেলাম—তাও শুনি নহর, মানে সরকারী খাল।

ওপারে হরিদ্বার একালের শহর। রেডিয়োতে 'লারে লাপ্পা' জাতের গান কানে এল ; দেখলাম যে সিনেমাও আছে।

কিন্তু এসব ছাড়িয়ে রেলের সড়ক মাথার উপর রেখে অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে রিকশা থামল একসারি পর্বতশ্রেণীর পাদমূলে। সামনের টিলার উপর বিল্বকেশ্বরের মন্দির। সেটি অতিক্রম করে নীচের উপত্যকায় নামলে তবে মিলবে সতীকুণ্ড। এবার হাঁটা ছাড়া উপায় নেই। ভালই হল। শ দুয়েক মাইল চড়াই-উতরাই ভাঙবার সঙ্কল্প নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। এখানে একটু রিহার্স্যাল দেওয়া মন্দ কি!

শিবের জন্য সতী যেখানে তপস্যা করেছিলেন, এ নাকি সেই স্থান। প্রথমে ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়েছিলেন মহাদেব সাধিকার কাছে। চিনতে না পেরে বিরক্ত হয়েছিলেন সতী, ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন অপরিচিত পুরুষের দুঃসাহসিক ধৃষ্টতা দেখে। তার পর মহাদেব যখন সকৌতুকে হাসতে হাসতে নিজমূর্তি পরিগ্রহ করলেন তখন সে কী দুরবস্থা সতীর! না পারেন চলতে, না স্থির থাকতে।

কিন্তু কোথায় শিব আর কোথায় সতী! চাপ চাপ সিঁদুর আর রাশি-রাশি ফুল-পাতার অন্তরালে কোন বিগ্রহই স্পষ্ট দেখা যায় না। পূজা বলতে ঘটি ঘটি জল ঢালা আর কিছু ফুল-পাতা ছড়িয়ে দেওয়া। প্রধান অনুষ্ঠান যেন মন্দির-পরিক্রমা। তা ক্লান্তপদে ঘর্মসিক্ত দেহে তেমন মধুর লাগে না। মন্দিরের পরিবেশেও কোন মোহ নেই। পাহাড়টি নেড়া নেড়া, উপত্যকা মনে হয় অন্ধকার।

কেবল একটি ব্যতিক্রম—মরুভূমিতে ছোট্ট একফালি মরূদ্যানের মত। সতী-মন্দিরে যাবার সময় দুটিমাত্র পয়সা দিয়ে প্রায় এক সাজি ফুল কিনেছিলাম ছোট একটি মেয়ের কাছ থেকে। তখন ভাল করে দেখি নি তাকে, ফিরতি পথে দেখলাম। পাহাড়ী মেয়ে, বেঁটে গড়নের কিশোরী। জানু থেকে ঘাড়-গলা পর্যন্ত কালোপানা কম্বলের মত মোটা একখানি মাত্র বস্ত্রে ঢাকা। কিন্তু নিটোল সুগোল দুটি বাহু সম্পূর্ণ অনাবৃত ; তেমনি তার মাথা ও মুখখানিও। বেণী নয়—অযত্নবর্ধিত অসংস্কৃত কেশরাশি জটার মত ঝুলছে ওর পিঠে, কাঁধের উপর দিয়ে বুকের কাছে ; সাপের মত ফণা তুলে আছে ললাটের উপর। অমার্জিত মুখমণ্ডলে বেশ দেখা যায় চাপ চাপ ময়লা। তবু, অথবা বোধ করি সেই জন্যই আরও বেশী চোখে পড়ে তার পাকা সোনার মত রঙ, আপেলের মত গাল, কাকাতুয়ার ঠোঁটের মতই টুকটুকে লাল দুটি ওষ্ঠ, মুক্তার মত ঝকঝকে দন্তপংক্তি আর নৃত্যচটুলা পার্বত্য নির্ঝরিণীর মতই তার হাস্যোজ্জ্বল চোখ দুটির চঞ্চল দৃষ্টি।

সেই দৃষ্টির সঙ্গে আমার দৃষ্টি গিয়ে মিলতেই মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, দর্শন মিলা ?

ঘাড় নাড়লাম মন্ত্রমুগ্ধের মত। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে তাকালাম মেয়েটির দিকে। তখন যেন মনে আর তত ক্ষোভ নেই। মনে হচ্ছে যে মহাদেবের না হোক, গৌরীর দর্শন যেন পেয়েছি।

খাস হরিদ্বারের অন্য রূপ—যেন রাজ-সাজ। গঙ্গাতীরে বড় বড় মঠ, মন্দির—ভোলাগিরির আশ্রম, গীতাভবন, মায়াদেবীর মন্দির, আরও কত কি ! উঁকি দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত একটির ভিতরে ঢুকে গেলাম।

গঙ্গার তীরেই অনেকটা জায়গা নিয়ে বিরাট প্রতিষ্ঠান। শুনলাম যে, একাধারে শিক্ষা ও সাধনক্ষেত্র। জিজ্ঞাসুরা আশ্রমের টোলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, সংসারবিরাগী মুমুক্ষুরা করেন সাধন-ভজন।

মোটামুটি সংবাদ পেলাম একজন মাঝবয়সী সাধু না বিদ্যার্থীর মুখে। বাঙালী তিনি। একখানি খোলা বই হাতে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে পড়ছিলেন ; আমাদের দেখে নীচে নেমে এসে সহাস্যমুখে সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

কথা বলতে বলতে তাকিয়ে দেখছিলাম ছোট ছোট ঘরগুলি। অধিকাংশই তালাবন্ধ। যে দু-একখানি খোলা, তার ভিতরে খাটিয়া কি তক্তাপোশ চোখে

পড়ল। পরিপাটি শয্যার উপর গেরুয়া রঙের চাদর পাতা। রঙটুকু উপেক্ষা করলে যে-কোন সমৃদ্ধ কলেজের ছাত্রাবাস মনে করা যায়। প্রশস্ত প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে একটু বাগানের মত, ইট-সিমেণ্ট দিয়ে গাঁথা মসৃণ কয়েকটি বিশ্রামের আসন ও একখানা কাঠ ও বেতের আরাম-চৌকিও রয়েছে দেখলাম। সেটিতে বসে আছেন আর একজন সন্ন্যাসী। বৃদ্ধ তিনি, শীর্ণদেহ ; মুখের ভাব মনে হল ক্লিষ্ট।

কিন্তু বড় শান্ত পরিবেশ। রাস্তা পার হলেই গঙ্গা। তার ভীষণ গর্জন এখানে দাঁড়িয়ে শোনা যাচ্ছে যেন কুলুকুলু নাদ।

জিতেনকে একটি ঠেলা দিয়ে মৃদুস্বরে বললাম, থেকে গেলে হয় এখানে। দেবে থাকতে ?

জনান্তিকে বলেছিলাম, কিন্তু শুনে ফেলেছেন সাধু। তিনি সহাস্যকণ্ঠে বললেন, আচার্যকে বলুন। তাঁর অনুমতি হলেই থাকা যায়।

জিতেন আমার দিকে চেয়ে হাসল, দুষ্টুমির হাসি। বললে, তবে সাবধান, মণিদা, অভিমন্যুর দশায় পড়বেন না যেন। ঢোকবার আগে বেরুবার রাস্তা জেনে নেওয়া দরকার।

শুনে সাধু কিন্তু পরিহাসতরল কণ্ঠেই বললেন, ঢুকতে যদি পারেন তো বেরুবার রাস্তা খুঁজতে হবে না। তা সব সময়েই খোলা পাবেন।

আমি অপ্রতিভ বোধ করছিলাম। বললাম, এরকম স্থানে আসবার পর আবার ছেড়ে যায় নাকি কেউ ?

উত্তর হল : যায় বইকি। আর গেলে দোষও তো কিছু নেই। সন্ন্যাসী হলে তাঁর তো আর কোন বন্ধনই থাকে না।

একটু থেমে সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে নির্দেশ করে তিনি আবার বললেন, ওই যেমন উনি। প্রায় পাঁচ বছর এক মঠে থাকবার পর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন। এখন উনি পরিব্রাজক। এ আশ্রমে দু দিনের অতিথি মাত্র।

ফিরে তাকিয়েছিলেন তিনিও, কিন্তু আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। মনে হল যেন একটু বিরক্তই হয়েছেন তিনি।

অস্বস্তির ভাব বেড়ে গেল আমার মনে। তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

এবার সোজা ব্রহ্মকুণ্ড। কুম্ভস্নান তো ওখানেই হয়। কতশত বৎসর

আগে থেকে চলে আসছে, কে জানে। আজও এই বিশাল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সহস্র সহস্র সন্ন্যাসী ও লক্ষ লক্ষ গৃহী নরনারী নির্দিষ্ট যোগের সময় ওই কুণ্ডে একটি ডুব দেবার জন্য সকল রকম ক্লেশ সহ্য করে এখানে ছুটে আসেন। নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করেন তাঁরা যে, এর ফলে তাঁরা অমৃত লাভ করবেন। এত যার প্রতিষ্ঠা, অমন যার আকর্ষণ, কেমন সে কুণ্ড ?

দেখে কিন্তু নিরাশ হতে হল। কত শাস্ত্রে কত উপাখ্যান এই ব্রহ্মকুণ্ড সম্বন্ধে। তবু চোখে দেখে মনে হয় যে, ওর সার্থক বর্ণনা সেই শাস্ত্রকারই করেছেন যিনি বলেছেন যে, গঙ্গা এখানে ব্রহ্মার কমণ্ডলুর মধ্যে আবদ্ধ হয়েছিলেন। স্বয়ং ব্রহ্মার কমণ্ডলু বলেই আয়তনে যা একটু বড়।

দেখে আর একটি দৃশ্য মনে পড়ল। কন্যাকুমারীতে গিয়ে যে রাজকীয় হোটেলে আশ্রয় নিয়েছিলাম সেখানে দেখেছিলাম সমুদ্রের পুকুর—তিন তিনটি সমুদ্রের সঙ্গম যেখানে এবং যাদের একটি আবার মহাসমুদ্র, সেখানেই বেলাভূমিতে পাথরের উঁচু প্রাচীর তুলে একটি মাত্র মাঝারি আকারের ফুটোর ভিতর দিয়ে এনে খানিকটা সমুদ্রের জল আটক করে তরঙ্গভীত ভ্রমণকারীর সমুদ্র-স্নানের অক্ষম বাসনার আংশিক পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন কেপ হোটেলের কর্তৃপক্ষ। এও যেন তাই। সিমেণ্ট-কংক্রীটের বলয়-বেষ্টনীর মধ্যে গঙ্গার খানকটা জল। যার বেগ ধারণ করবার জন্য স্বয়ং মহাদেবকে তাঁর জটাজুটসমন্বিত বিশাল মস্তক তুলে দৃঢ়পদে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল সে জাহ্নবীর প্রবাহ হরকী-পৌড়ির বলয়-বেষ্টনীর বাইরে। তাড়াতাড়ি পুল পার হয়ে হরের পিঁড়ির শেষ সীমায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

এতক্ষণ পর পরিপূর্ণ তৃপ্তি।

সঙ্গম নয়, কিন্তু ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হবার পূর্বের অবস্থা ওখানে গঙ্গার। বিপুল তার আয়তন, প্রবল তার উচ্ছ্বাস। সামনে ডাইনে বাঁয়ে যেদিকে চাওয়া যায়, দেখা যায় শুধু জল আর জল। তরঙ্গ নেই, কুটিল আবর্ত নেই, আছে শুধু গতি—বিপুল বিশাল জলরাশির অবিরাম ক্ষুরধার গতি। আর আছে যেন নিঁখুত তানলয়সমন্বিত অসংখ্য জলতরঙ্গের সমাপ্তিহীন সুললিত ঐকতান সঙ্গীত।

ওপারে অনেক দূরে ডানদিকে দেখি স্তবকে স্তবকে কনখলের অগণিত তরুশ্রেণীর পুঞ্জীভূত নিবিড় শ্যামলিমা। বামে আকাশচুম্বী হিমালয় পর্বতশ্রেণীর কোলে কোলে মনোহারিণী নীলমায়ার চঞ্চল-নৃত্য। উভয়ের মাঝখানে শ্যাম

ও নীলের শিখর থেকে অনেক নীচে এক অস্পষ্ট ধূসর রেখা সমান্তরালে দিগন্ত পর্যন্ত প্রলম্বিত। বন্দিনী জাহ্নবীর চরণে আর একটি শৃঙ্খল ওটি। কনখল শহরকে বন্যার সর্বনাশা গ্রাস থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে আর একটি বাঁধ তুলে গঙ্গার মূল ধারাকে হিমালয়ের কোলের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। সেই জন্যই তো কনখলের ঘাটে দাঁড়িয়ে অমন শীর্ণ দেখেছিলাম গঙ্গাকে। ও তো জাহ্নবীর দাক্ষিণ্য নয়, মানুষের দয়ার দান। সেচবিভাগের বাস্তুকারেরা কল টিপে গঙ্গার মূল ধারা থেকে যতটুকু জল ছেড়ে দিয়েছেন, কনখলের খাল তার বেশী পাবে কোথায় ?

পাশের একজন যাত্রীর হাত থেকে তার দূরবীণ ধার নিয়ে তাই চোখে লাগিয়ে তাকালাম বাঁদিকে নীলাভ পর্বতশ্রেণীর দিকে। বেশ চোখে পড়ল এবার। তিনতলা বাড়ির সমান উঁচু বাঁধের গায়ে ধাক্কা খেয়ে মূল গঙ্গার বিপুল জলধারা দ্বিগুণ বেগে ওপারে হিমালয়ের কঠিন শিলাময় চরণপ্রান্তে গিয়ে প্রবল আবেগে আছাড় খেয়ে পড়ছে, আর পুঞ্জে পুঞ্জে ভেসে উঠছে অপরিমেয় শুভ্র ফেনরাশি।

কালিদাসের বিরহী যক্ষের মুখে মহাদেবের মাথায় বিপুল জটাজালের আশ্রয়ে স্বর্গ থেকে সদ্যঃ-অবতীর্ণা গঙ্গার বর্ণনা মনে পড়ে গেল ঃ

তস্মাদ্ গচ্ছেরনুকনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং
জহ্নোঃ কন্যাং সগর-তনয়-স্বর্গ-সোপান-পঙ্‌ক্তিম্।
গৌরীবক্ত্র-ভ্রূকুটি-রচনাং যা বিহস্যেব ফেনৈঃ
শম্ভোঃ কেশগ্রহণমকরোদিন্দু-লগ্নোর্মি-হস্তা ॥

মহাকবি তো এই কনখলেই গঙ্গার অবতরণ কল্পনা করেছিলেন, হয়তো এপারে কাছাকাছি কোন জায়গায় দাঁড়িয়েই গঙ্গার ফেনোচ্ছল মূর্তি দর্শন করেছিলেন তিনি। সেদিনের রূপটি একালে ঠিক তেমনই না থাকলেও আজও জাহ্নবী সপত্নী-বিদ্বেষে জর্জরিতা গৌরীর ভ্রূকুটিকে উপহাস করে ওপারে তেমনই ফেনার হাসি ফুটিয়ে ছুটে চলেছেন।

হরকী পৌড়ি কাশীর যে কোন ঘাটের মত। একটু দূরে দূরেই শাস্ত্রপাঠ বা কথকতা চলছে। সাধুরা বসে আছেন নানা ভঙ্গিতে। পাণ্ডারা শাস্ত্রীয় কৃত্য করাচ্ছেন তাঁদের যজমানদের দিয়ে। ফুলের মালা বা প্রিয়জনের মঙ্গলকামনায় জলন্ত প্রদীপ খরস্রোতা গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে যুবতীদের মত বৃদ্ধারাও দুরুদুরুবক্ষে শঙ্কিতনয়নে ওদের গতিপথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে

আছেন। শাস্ত্রালোচনা ও ধর্মানুশীলনের সঙ্গে সমান তালে চলেছে ব্যবসা। পায়ে পায়ে দোকান, পায়ে পায়ে ফেরিওয়ালা। পুরোদমে বেচা-কেনা চলছে—তীর্থমাহাত্ম্য প্রচারের পুস্তিকার সঙ্গে নানারকম ঔষধ, দেবভোগ্য মণ্ডামিঠাইয়ের সঙ্গে মৎস্যভোগ্য চার। আটার সঙ্গে আরও কি কি মিশিয়ে নাড়ুর মত আকারের মাছেদের মিষ্টান্ন। বড় বড় ডালায় তাই সাজিয়ে নিয়ে ছেলেবুড়ো স্ত্রীপুরুষ ঘুরে ঘুরে বেচছে সেই নাড়ু। নিজেদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা তাদের। শেষ বর্ষার ঘোলা জলে মাছ তেমন স্পষ্ট দেখা যায় না বলেই ওদের প্রতিযোগিতা আরও তীব্র। মাছ ভাসিয়ে তুলে যাত্রীকে দেখিয়ে তবে তার কাছে মাল বেচবে বলে কতজনের কত নাড়ুই অপচয় হতে দেখলাম। কোন লাভ নেই জেনেও তাদের মুখের দিকে চেয়ে না কিনে পারলাম না তাদের মাল। কিনতে হল একাধিক ফেরিওয়ালার কাছ থেকে।

সারি সারি খাবারের দোকানে সস্তা দামের রুটি-তরকারি ও ভাজাভুজি দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। জিতেন বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা। দোকানে খাবার তৈরি আছে, চারিদিকে আছে সাধুসন্ন্যাসী ও দরিদ্রনারায়ণ! দু-এক আনা, এমন কি দুটিমাত্র পয়সা খরচ করেও কাছে বসিয়ে অতিথিসৎকার করে পুণ্যসঞ্চয় করতে পার।

তবে ব্যতিক্রমও আছে। বড় বড় ইংরেজী ও দেবনাগরী হরফে নোটিশ চোখে পড়ল চলতে চলতেই—সমর্থ ব্যক্তিকে ভোজ্য বা ভিক্ষা দিয়ে অলসতার প্রশ্রয় দেবেন না।

একদিকে সেকালের প্রদোষ, আর একদিকে একালের উষা। যতই এগিয়ে যাচ্ছি ততই যেন উষার বর্ণচ্ছটা আরও প্রস্ফুটিত হচ্ছে। গঙ্গার বুকে সান-বাঁধানো চত্বরে ধর্ম-পিপাসু যাত্রীদলের ভিড়ের মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মর্মরমূর্তি দেখে মন্ত্রাভিভূতের মতই গতি থেমে গেল আমাদের। তৎক্ষণাৎ আমার স্মৃতির পটে একটি যুগের ইতিহাস স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল যেন—কত বেদনা আর কি গৌরবের সে ইতিহাস!

অতঃপর উত্তরাখণ্ডের পথে যতই এগিয়ে গিয়েছি ততই শুনেছি সুভাষবাবুর কথা। কুলি পাণ্ডা চটিওয়ালা আমাদের বাঙালী বলে চিনতে পারলেই পরক্ষণেই নেতাজীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করেছে। জ্বলন্ত বিশ্বাস তাদের যে, সুভাষবাবু জীবিত আছেন, আবার ফিরে আসবেন তিনি এবং তাঁর

আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবাসীর দুঃখ ও দারিদ্র্য সূর্যোদয়ে কুয়াশার মতই দূর হয়ে যাবে।

রাত্রে খুঁতখুঁত করেছিল মনটা। সকালে উঠেই জিতেনকে বললাম, চল, গঙ্গায় স্নান করে আসি।

সে সবিস্ময়ে বললে, আবার যাবেন সেই ব্রহ্মকুণ্ডে?

না, অতটা পারব না, উত্তর দিলাম আমি: তবে হরিদ্বারে এসেও গঙ্গাস্নান যদি না করি তবে দেশে ফিরে মুখ দেখাব কেমন করে? তাই ভাবছি যে, বাড়ির কাছেই কাল যাঁকে দেখলাম তিনি স্বয়ং গঙ্গা না হলেও তাঁরই তো দুহিতা বা দৌহিত্রী। ওখানেই একটা ডুব দিয়ে আসি, চল।

কিন্তু অতিথি-ভবনের পরিচ্ছন্ন আধুনিক স্নানাগার ছেড়ে গঙ্গায় যেতে রাজী হল না জিতেন। সুতরাং সর্বাঙ্গে তেল মেখে শুধু গামছাখানা দিয়ে বুক পিঠ ঢেকে একাই চললাম কনখলের গঙ্গায়।

আশ্চর্য ব্যাপার। এ তীর্থমাহাত্ম্য নাকি? না, উত্তরাখণ্ডের বিশিষ্ট আবহাওয়ায় দেহের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এটি?

"শহুরে" বলে বন্ধুমহলে অখ্যাতি আছে আমার। তার উপর আছে বুকের ব্যারাম; আক্ষরিক অর্থে অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর আমার দেহের চর্ম। কলকাতার বাসায় চৈত্র-বৈশাখ মাসেও গরম জলে স্নান করি আমি। অথচ সেই আমিই গঙ্গাস্নান করে তা উপভোগ করলাম!

একখানা পাথরের উপর বসে জলে হাত ডোবাতেই অবশ্য বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত হাত টেনে নিয়েছিলাম—এতই ঠাণ্ডা ওই জল। কিন্তু সাহস করে কোমর-জল পর্যন্ত নেমে তোয়ালেখানা ভিজিয়ে মুখে একবার বুলোতেই সবই বদলে গেল যেন। অনাস্বাদিতপূর্ব স্নিগ্ধ স্পর্শ। হাত-পা বুক-পিঠ যত রগড়াই ততই যেন বেশী করে বুঝি দেহমন জুড়িয়ে যাওয়া কাকে বলে। যত ডুব দিই ততই যেন আরও ডুব দিতে ইচ্ছা হয়। উপরে উঠে গা-মুখ মুছে শুকনো কাপড় পরবার পর মনে হল বুঝি নবজন্ম হয়েছে আমার।

ফিরে এসে দেখি যে জিতেন ঝোলাঝুলি বেঁধে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। আমাকে দেখেই সে বললে, আমি গঙ্গা দেখব ঋষিকেশে গিয়ে—দু-পাঁচ মিনিট নয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কেন জানেন?

নিজেই বুঝিয়ে বললে সে: ঋষিকেশের গঙ্গার বর্ণনা স্বামী বিবেকানন্দের

বইয়ে পড়েন নি? আমি পড়েছিলাম বাংলা পড়তে শেখবার পরেই। সে দিন যে কৌতূহলের বীজ পড়েছিল আমার মনের মাটিতে প্রায় ত্রিশ বছর পর তারই ফল ফলেছে এই আমাদের যাত্রায়। আসল যাত্রার শুরুও তো হবে ওই ঋষিকেশ থেকেই। সুতরাং এখানে আর সময় নষ্ট করা নয়।

বিদায় নিতে গেলে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বললেন, আপনাদের মালপত্র বইবার জন্য কুলি চাই তো? একজন এসেছিল আমার কাছে—সের প্রতি দু টাকা হারে মজুরি নেবে সে।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের চেনা লোক নাকি?

মুখ চেনা।

তবে থাক্: বললাম আমি: শুনেছি যে ঋষিকেশে কি একটা সরকারী না সরকার-অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান আছে, যার মারফতে কুলি নিলে মালপত্র খোয়া যাবার ভয় কম।

কিন্তু অতিথিশালায় ফিরে যেতেই একটি লোক সেলাম করে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গেই তেনজিংকে মনে পড়ে গেল আমার। তাঁরই আত্মজীবনীতে পড়েছিলাম যে, পার্বত্যপথের সঙ্গী তার মত বাহাদুর শেরপাকে 'টাইগার', মানে ব্যাঘ্র অভিধা দেওয়া হয়। সে সব মহারথীদের চোখে দেখি নি। কিন্তু এই লোকটিকে এক পলক দেখেই মন সায় দিয়ে ফেলল যে, একে বাঘ বলা যায়। বেঁটে গঠন, মোটা মোটা হাত-পা, চামড়ার রঙ গাঢ় হলুদ আর বাঘের মতই যেন মুখের আকার তার। আরও আশ্চর্য সাদৃশ্য এই যে, কালো ডোরা-কাটা একটি জামা গায়ে দিয়ে এসেছে সে। পার্থক্য কেবল তার মুখের ভাবে। চোখের দৃষ্টি তার নম্র, ভারী মিষ্টি ওষ্ঠ-প্রান্তের হাসিটুকু। ভয় জাগে না মনে তাকে দেখলে, বরং আশ্বাস পাওয়া যায়।

নাম কি তোমার, শের বাহাদুর?—জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

না হুজুর, বীর সিং।

তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে?

না হুজুর, দুসরা লোক দেব আমি। এখান থেকেই সে আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাবে।

শুনে ভাটা পড়ল আমার উৎসাহে; বললাম, তবে দরকার নেই, ঋষিকেশ গিয়ে দেখা যাবে।

কিন্তু ওরা নাছোড়বান্দা। লক্ষ্যই করি নি যে, পিছনে পিছনে এসেছে আমাদের। বাসস্ট্যাণ্ডে পৌঁছবার পর ওরাই আমাদের মালপত্র গাড়িতে তুলে দিল। আমি তাড়াতাড়ি টিকিট কিনে ড্রাইভারের পাশের সীটটি দখল করে বসতেই বীর সিং আবার আমাকে একটি সেলাম ঠুকে জিজ্ঞাসা করল, ওর টিকিট কিনেছেন, বাবুজী?

বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলাম, আমি কেন ওর টিকিট কিনতে যাব?

কিন্তু বীর সিং নির্বিকার। সে বললে, কোই হর্জ নহী বাবুজী। নিজের পয়সা দিয়েই টিকিট কিনবে ও। ঋষিকেশে আপনাদের খিদমত করবে। আমিও আসছি সেখানে—এর পরের গাড়িতেই।

বনের ভিতর দিয়ে পথ। বাস রেলের লাইন পার হল বার-দুয়েক। মাঝে মাঝে ঝরনা চোখে পড়ছে; ছোটখাটো জনপদও। কিছু কিছু সহযাত্রীদের নেমে গিয়ে আবার ফিরে আসতে দেখে বুঝতে পারছি যে মন্দির আছে ওখানে। আমার মন ও চোখ অন্য দিকে। ভারী সুন্দর দৃশ্য সব। ঝাঁ-ঝাঁ করা রোদ, দূরে দূরে পাহাড়, কিন্তু মোটামুটি সমতল ছায়াশীতল পথ। মাঝে মাঝে ঝরনা দেখে মনে হয় যেন ওরই মত আমিও 'যত কাল আছে বহিতে পারি।'

ঘণ্টা দুই পর বাস যেখানে গিয়ে থামল সে জায়গাটা শহর। কিন্তু জিতেনের মুখের দিকে তাকাতেই সে বললে, আমাদের যাত্রা হ'ল শুরু। আর রাজসিক আরামের খোঁজ করা নয়। এবার চলুন কোন ধর্মশালায়।

কোথায় ধর্মশালা? তা ছাড়া জীবনে কোনদিন ধর্মশালায় থাকিনি, কি করতে হয় ওখানে আশ্রয় পাবার জন্য তার কিছুই জানা নেই—দিশেহারা হয়ে পড়লাম বইকি! কিন্তু সুশৃঙ্খলভাবেই সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। কে একজন লোক আমাদের লটবহর নামিয়ে রাজপ্রাসাদের মতই বিরাট এক চারতলা বাড়ির দেউড়িতে কার যেন হেফাজতে সে সব রেখে খানিকটা দূরে আর একটা বাড়িতে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল আমাদের। কালীকমলী-ওয়ালার ধর্মশালার দপ্তর ওটি। ওখান থেকে টিকিট পেলেই থাকবার ঘরও খোলা পাওয়া যাবে।

কত দিতে হবে? কিছুই না। জমিদারি সেরেস্তার মত একটি দপ্তরে আধ-ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করবার পর যে যুবক কর্মচারীটি আমাদের নামধাম লিখে নিয়ে আমার হাতে একটি টিকিট দিল, সে আমার প্রশ্নের উত্তরে

সবিনয়ে বললে, বাবার ধর্মশালায় থাকবার জন্য ভাড়া লাগে না, বাবুজী। তবে সদাব্রতের জন্য কিছু দান করবার ইচ্ছা যদি হয় তো ওই বাক্সে ফেলে দিন।

ধর্মশালায় থাকবার ঘর ভালই। কিন্তু রান্নাঘরের অবস্থা দেখেই জিতেনের মুখ শুকিয়ে গেল। সে আমার দৃষ্টি এড়িয়ে বললে, হোটেলের মত কিছু এখানে আছে কি না খুঁজে দেখলে হয় না?

খুঁজতে হল না। রাস্তার ওপারেই পাঞ্জাবী হোটেল—আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য পাঞ্জাবী রিফ্যুজির উদ্যোগ।

খাওয়া সেরে ধর্মশালায় নিজের ঘরে যাব, দেউড়িতে ঢুকতেই দেখি সেই বাঘমুখো বীর সিং। বাবু মতন একটি যুবককে দেখিয়ে সে আমায় বললে যে, সরকারী সমিতির কেরানীকে একেবারে সঙ্গে নিয়ে এসেছে সে—এখন আমি রাজী হলেই কুলির সঙ্গে আমার চুক্তি পাকা হয়ে যেতে পারে।

কাগজপত্র ঠিকই আছে দেখলাম। সত্যিই রেজেস্টারী করা সমিতি—নাম—তীর্থযাত্রা মজদুর এজেন্সি। তা ছাড়া হরিদ্বারে থাকতে মনে যে জেদ ছিল তা আর এখন নেই। এই অপরিচিত দেশে অত সব লটবহর নিয়ে আমার মত দুর্বলদেহ লোক কত যে অসহায় তা বেশ বুঝতে পারছি তখন। আর যে লোকটি ইতিমধ্যেই আমি না চাইতেই এবং আমার অবজ্ঞামিশ্রিত ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করেই এতক্ষণ অত সাহায্য করেছে আমাদের, তার প্রতি নিজের অজ্ঞাতসারেই কৃতজ্ঞতায় সিক্ত হয়েছে আমার মন। সুতরাং তার সঙ্গেই চুক্তি করতে রাজী হয়ে গেলাম।

সের প্রতি দু টাকা হার। আমাদের দুজনের মাল এক মণ দশ সেরের জন্য মোট এক শত টাকা 'শুখা' মজুরি। তার মানে পথে কুলি খাবে তার নিজের খরচে, বাস ভাড়া দেবে তার নিজের মজুরি থেকে।

একুশ টাকা অগ্রিম দিলাম কুলিকে। তা থেকে এক টাকা সমিতির প্রাপ্য, দশ টাকা গেল বীর সিংয়ের পকেটে – বুঝি ওটা তার কমিশন।

॥ ৩ ॥

হৃষীকেশ না ঋষিকেশ ? ধাঁধা লেগেছিল হরিদ্বারে থাকতেই। দেবতার নামটিতেই অভ্যস্ত আমরা। কিন্তু বাসের গায়ে দেখলাম বড় বড় দেবনাগরী অক্ষরে লেখা রয়েছে ঋষিকেশ। এখানেও সর্বত্রই দেখি ওই বানান। ওইটিই যে যথার্থ নাম, অন্ততঃ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলাম একটু পরেই। হৃষীকেশ একক আছেন তাঁর নিজস্ব মন্দিরে, কিন্তু ঋষিদের দেখছি সর্বত্র।

শহর আর কতটুকু ? বাজার এলাকা অতিক্রম করে লছমনঝুলার দিকে যত এগিয়ে যাই ততই ঋষিদের দেখছি। দেখছি তাঁদের আশ্রম, তাঁদের তপোবন। গঙ্গার উভয় তীরেই ছোট বড় মঠ ও মন্দির। ওপারে গীতাভবন এবং এপারে স্বামী শিবানন্দের দিব্যজীবন সমিতির (Divine Life Society) নাম ও প্রতিষ্ঠা ভারতবিখ্যাত। গঙ্গার বুকে ছায়া পড়েছে এ সব নামকরা প্রতিষ্ঠানের প্রাসাদের মত ভবনের। তা ছাড়াও আরও কত আশ্রম। ঝোপের মধ্যে, গাছের নীচে, পাহাড়ের গায়ে গায়ে ছোট ছোট কুটির। পাকা গাঁথুনির বাড়িও ওই কুটিরই মনে হয়। যে কোন উপাদান কোন রকমে স্তূপাকারে সাজিয়ে মাথা গোঁজবার ঠাঁই আর কি। তবু ছবির মত বলতে যদি হয় তবে এদের সম্বন্ধেই বলব সে কথা।

লছমনঝুলা পার হয়ে নীলকণ্ঠ পর্বতের পাদমূলে স্বর্গাশ্রমের পথে চলতে চলতে বিস্ময়ে সম্ভ্রমে নির্বাক হয়ে যাই। পথের দু ধারেই সারি সারি আম গাছ—সাধুদের উদ্দেশে নিবেদিত ভক্তদের শ্রদ্ধার অর্ঘ। ছায়া-সুশীতল প্রায়-নির্জন পথ। গাছের ফাঁক দিয়ে ডান দিকে গঙ্গার পারে ও বাঁ দিকে পাহাড়ের গায়ে গায়ে সত্যিই শান্তির নীড় ঋষিদের আশ্রম চোখে পড়ছে শুনলাম যে অধিকাংশ কুটিরই সাধুরা নিজের হাতেই গড়েছেন। ইটের উপর ইট বা পাথরের উপর পাথর বসিয়ে মাটি দিয়েই লেপে দিয়েছেন হয়তো দেওয়াল। সামনে তেমনই সুমার্জিত ছোট একটু প্রাঙ্গণ। কোনটিতে দুচারটি ফুলগাছও আছে। আবার কোন কোন সাধুর কুটির বলতে হয়তো পর্বতের একটি সঙ্কীর্ণ গুহাই,—শুধু প্রবেশপথটুকু ঢাকবার জন্যই বাইরের উপাদান ব্যবহার করেছেন তাঁরা। এই রকম যাঁর যাঁর কুটিরে একা একা বাস করেন সাধুরা, আপন মনে সাধন-ভজন করেন।

স্বর্গাশ্রমের এলাকায় প্রবেশ করবার পর আর কণ্বমুনির আশ্রমের কথা মনে

পড়ে না। শকুন্তলা-অনসূয়া দূরে থাক্, গৌতমীকেও মনে করিয়ে দেবার মত কেউ নেই কোথাও। নেই কোন শিশুও। স্বয়ং ঋষিদের অবস্থিতিও এখানে প্রধানতঃ অনুমানসাপেক্ষ। আত্মগোপন করাই ধর্ম নাকি ওঁদের! রাজপথ থেকে বেশ একটু দূরে দূরেই তাঁদের কুটির। পথের ধারে এসে বসেন নি কেউ। বহু-পরিচিত ভিক্ষাপ্রার্থনা একবারও কানে এল না এখানে; কারও চরণে প্রণামী অর্পণ করবারও সুযোগ পেলাম না। কেবল দূর থেকে দেখলাম—কেউ হয়তো তাঁর কুটিরের প্রাঙ্গণে সুখাসনে উপবিষ্ট আছেন বা কমণ্ডলু হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে গঙ্গার ঘাটে নেমে যাচ্ছেন। নিরাসক্ত দৃষ্টি তাঁদের চোখে—হয়তো উদাস, হয়তো বা ঢুলু ঢুলু, ভাববিহ্বল। আর একটি জগতের কোন এক দুর্লভ বস্তু লাভ করেছেন বলেই বুঝি এ জগতে কিছুই যেন তাঁদের চাইবার নেই।

সামান্য ব্যতিক্রম দেখলাম কেবল একজনের মধ্যে। স্বর্গাশ্রমের এলাকায় প্রবেশ করেই দেখেছিলাম তাঁকে। পথের ধারে একটি গাছের নীচে বসে ছিলেন তিনি। আমরা বার বার তাঁর দিকে তাকাচ্ছি দেখে তিনি নিজেই আমাদের সম্ভাষণ করলেন বাংলায়।

আপনারা বাঙালী?

কিন্তু তার পর আর কোন কথা নয়, কেবল হাসি আর ইঙ্গিত।

জিজ্ঞাসা করলাম, কত দিন এখানে বাস করছেন আপনি?

ইঙ্গিতে বোঝালেন, কে ওসব হিসাব রাখে।

শান্তি পেয়েছেন?—মূঢ়ের মত প্রশ্ন আমার, হয়তো উদ্ধতও।

কিন্তু তিনি হাসলেন। সে হাসি যেন এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে।

বিস্ময়কর তাঁর ওই প্রথম সম্ভাষণটিই—আপনারা বাঙালী?

ভাষার যে ঐক্য, তার টান কি সংসারত্যাগী সর্বমোহমুক্ত সন্ন্যাসীর চিত্তকেও বিচলিত করে? তবে আমাদের দেশের কয়েকজন বড় বড় নেতা সে কথা বোঝেন না কেন?

ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল আমাদের কর্মসূচী। ঋষিকেশের গঙ্গা দেখবার জন্য অত সাধ জিতেনের। আমারও কম নয়। কিন্তু যেটি খাস ঋষিকেশের খাঁটি ঘাট সেখানে গিয়ে আমাদের দুজনেরই চক্ষুস্থির। একে

মাথার উপর দুপুরের সূর্য, তায় আবার ধুধু করছে বালির চর। এপারে কাছাকাছি একটিও গাছ নেই। লাফিয়ে লাফিয়ে বালি পার হয়ে জলের কাছে গিয়ে দেখি যে, হাত দশেক জায়গার মধ্যেই লাখখানেক গোল গোল উপলখণ্ড ছড়িয়ে পড়ে থাকলেও যতদূর চোখ যায় ততদূর পর্যন্ত আরাম করে বসবার মত জুতসই পাথর একখানিও নেই। স্বামীজী এ ঘাটের কোথায় যে বসে গঙ্গাদর্শন করেছিলেন তা ভেবে পেলাম না আমি। সুতরাং আমাদের গঙ্গাদর্শন আপাততঃ স্থগিত রেখে আগে লছমনঝুলা দেখাই স্থির করেছিলাম আমরা।

ধর্মশালার কাছে ফিরে এসে শুনি যে, সেদিন বাস আর ওদিকে যাবে না। কিন্তু ভাগ্য আমাদের সুপ্রসন্ন। একজন টাঙ্গাওয়ালা দুজন মহিলাকে তার গাড়িতে বসিয়ে আর দুজন যাত্রীর খোঁজ করছিল। শুনেই রাজী হয়ে গেলাম আমরা—মাথাপিছু ভাড়া দিতে হবে মাত্র আট আনা।

তখন তাকিয়ে দেখি নি তাঁদের দিকে। টাঙ্গাতে আমরা দুজন সামনের সীটে বসবার পর মাঝে মাঝেই তাঁদের কোন এক জনের মাথার সঙ্গে আমার মাথার ঠোকাঠুকি হতে থাকলেও সে সময় তাঁদের কারও মুখ দেখবার উপায়ই ছিল না। দুজনকেই প্রথম ভাল করে দেখলাম লছমনঝুলার উতরাইয়ের মুখে টাঙ্গা থেকে নেমে প্রথম যখন মুখোমুখি দাঁড়ালাম আমরা।

একজন বৃদ্ধা আর একজন যুবতী। উভয়েই রঙিন শাড়ি কুঁচিয়ে পড়েছেন; উভয়েরই গায়ে পুরোহাতা ব্লাউজ—গলা পর্যন্ত বোতাম আঁটা; পায়ে জুতো, বাঁ কাঁধে সুতী-কাপড়ের ঝোলা। ভদ্রঘরের হিন্দুস্থানী মহিলাদের সাজ। তবু এক নজরেই বোঝা যায় যে, ওঁরা সমতলবাসিনী নন। গৌরবর্ণে লালের চেয়ে হলুদের অংশ বেশী। হাতের আঙুল দেখলেই বোঝা যায় যে, রীতিমত পেটা শরীর ওই যুবতীর। গোলগাল মুখ, থেবড়া নাক ও ছোট ছোট চোখ। বৃদ্ধার লোলচর্মেও স্বাস্থ্যশ্রী আছে। যুবতীর চোখ দুটি অধিকতর বুদ্ধির দীপ্তিতে জলজল করছে।

সেই চোখ দুটি মেলে সোজা আমার চোখের দিকে চেয়ে যুবতী হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারাও কেদার-বদরীর যাত্রী তো?

ঘাড় নাড়লাম।

কুলি ঠিক হয়েছে আপনাদের?

হ্যাঁ।

কি হারে ঠিক হল ? জিজ্ঞাসা যাতে আমরা না ঠকি।

হিসাবটা তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে এবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আর কে আছেন আপনাদের দলে ?

উত্তর হল : কেবল আমি আর মা। আর কেউ নেই।

আমি বিস্ময়ে নির্বাক। বোধ করি আমার মনের অবস্থা অনুমান করেই মেয়েটি হাসতে হাসতে বললেন, এ আর কি এমন কঠিন পথ ? আমি একাই তো মাকে কৈলাসও দেখিয়ে এনেছি। আর ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি হয় তো আসছে বছর যাব গঙ্গোত্রী।

ভয় করে না আপনার ?—জিতেন এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল।

ভয় কেন করবে ?—একটু যেন উদ্ধত মেয়েটির স্বর।

আমি মোলায়েম স্বরে বললাম, মানে, দুর্গম পথ কিনা, তাই ও-কথা মনে হয় আমাদের।

আমাদের কাছে দুর্গম নয়।—মেয়েটি হেসে উত্তর দিলেন : এ পথে চলতে আপনাদের মত কষ্ট হয় না আমাদের। জন্ম থেকেই আমরা পাহাড়ে চড়াই-উতরাই ভাঙছি।

এই অঞ্চলেই বাড়ি বুঝি আপনাদের ?

না, আলমোড়া ছাড়িয়ে আমাদের বাড়ি। জন্ম নেপালে, কর্ম উত্তরপ্রান্তে। সুতরাং দুটি দেশই আমি আপন বলে ভাবতে পারি।—বলে একটু মুখ টিপে হাসলেন তিনি।

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, তবে তাতে একটু অসুবিধাও আছে। দু দেশের লোকেই কেমন যেন পর পর মনে করে আমাদের।

শেষের দিকে চলতে চলতে কথা বলছিলাম আমরা। ওটা উতরাইয়ের পথ—খাড়া গঙ্গার ঘাট, মানে পুল পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। দল ভেঙে গেল আমাদের—জিতেন দেখি অনেকটা নীচে নেমে গিয়েছে, আর বৃদ্ধা পড়েছেন অনেকখানি পিছনে। মেয়েকে তাঁর মায়ের সঙ্গে থাকতে বলে আমিও পা চালিয়ে এগিয়ে চললাম নীচের দিকে।

ডানদিকে লক্ষ্মণের মন্দির। দুর্গের মত সুরক্ষিত ভবন। ভিতরে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। সেটি অতিক্রম করবার পর নাটমন্দির। মূল মন্দির আমাদের দেশের মত—বারান্দা থেকে বিগ্রহ দেখা যায়, কিন্তু যাত্রীর অধিকার নেই ভিতরে গিয়ে পূজা করবার। ভারি সুন্দর পরিবেশ, চমৎকার চিত্র-বিচিত্র

দেওয়াল ও স্তম্ভগুলি। ভিতরে সুন্দর মূর্তি বিগ্রহের। হরিদ্বার ও ঋষিকেশে ক্রমাগত কদাকার বা আকারবিহীন দেবমূর্তি দেখে দেখে মনে যে ক্ষোভ জমে উঠেছিল এক নিমেষেই তা সব মুছে গেল যেন। সুগঠিত সুঠাম লক্ষ্মণের মূর্তি এখানে। দেহের বর্ণ কালো না নীল; চোখ দুটি সাদা। রামসীতার বনবাসকালে গোদাবরীর তীরে তাঁদের পর্ণকুটিরের সামনে সুদীর্ঘকাল রাতের পর রাত ধনুর্বাণ হস্তে অতন্দ্রনয়নে দণ্ডায়মান থেকে যে জিতেন্দ্রিয় মহাবীর স্বীয় কর্তব্যপালন করেছেন, শিল্পীর বাটালি ও তুলিতে আমার সেই কল্পনার লক্ষ্মণই এই মূর্তির মধ্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল যেন। সৌভ্রাত্র ও কর্তব্যপরায়ণতার সার্থক রূপায়ণ।

তবে পরিপূর্ণ তৃপ্তির মধ্যেও একটু বিহ্বল ভাব আমার। রামলক্ষ্মণকে মনে পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে দণ্ডকারণ্য আর লঙ্কা। বড়জোর অযোধ্যা যা এখান থেকে অনেক নীচে পথে ফেলে এসেছি আমরা। উত্তরাখণ্ডের সঙ্গে তাঁদের কি যে সম্পর্ক তা কিছুতেই মনে পড়ছিল না। শেষ পর্যন্ত সে কাহিনী শুনলাম মাত্র একটি টাকা পারিশ্রমিক দেবার শর্তে জিতেন ইতিমধ্যে যে পথপ্রদর্শক নিয়োগ করে বসেছে, তার মুখে।

এক লক্ষ পুত্র আর সওয়া লক্ষ নাতির সঙ্গে স্বয়ং রাবণকে বধ করে লঙ্কা জয় ও সীতা উদ্ধার করবার পর শ্রীরামচন্দ্র গুরুর মুখে জানতে পারলেন যে, ধর্মযুদ্ধে তিনি জয়ী হলে কি হবে, ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়েছে তাঁর। লক্ষ্মণেরও তাই। তপস্যা দ্বারা শিবকে তুষ্ট করতে না পারলে পাপক্ষালন হবে না তাঁদের। সুতরাং সেই গুরুর আদেশেই আবার রাজ্য ছেড়ে বনবাসে এসেছিলেন তাঁরা কৃচ্ছ্র সাধনা করতে। এই গঙ্গাতীরে এইখানেই নাকি লক্ষ্মণ তপস্যা করে পাপমুক্ত হয়েছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র তপস্যা করেছিলেন আরও অনেকখানি দুর্গম পথ অতিক্রম করে গিয়ে আরও উপরে দেবপ্রয়াগে।

শাস্ত্র, না কিংবদন্তী? বিচার করে স্থির করবার মত পাণ্ডিত্য নেই। কিন্তু শুনতে শুনতে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। ওপারে অন্ধকারবর্ণ ওই পাহাড়গুলির মতই বিষণ্ণ-গম্ভীর আমার মন। এও ভারতের শাশ্বত বাণীরই আর এক উপাখ্যানরূপ—যুদ্ধ দ্বারা কোন লাভ হয় না, ধর্মযুদ্ধে জয়ী হয়েও নয়।

হয়তো ভরত-শত্রুঘ্নও ওখানে তপস্যা করে থাকবেন—তাঁদেরও মন্দির কাছাকাছিই আছে। শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরও আছে ওখানে। কিন্তু আর কোনটিই দেখা হল না। ততক্ষণে স্বর্গাশ্রম হাতছানি দিয়েছে আমাদের।

স্বর্গাশ্রমের সীমান্ত সেটি হোক বা না হোক, আমাদের তপোবন পরিক্রমা শেষ হল বাবা কালী-কমলীওয়ালার সদাব্রতে গিয়ে। সেটি অবশ্য প্রকাণ্ড ভবন। অনেকগুলি দালান, দপ্তর, ভাঁড়ার ঘর, রন্ধনশালা আর স্বয়ং বাবার সমাধিমন্দির। অনেক লোকজন কাজ করছে দেখলাম; শুনলাম যে, এখান থেকেই সাধুরা নিয়মিতভাবে বিনামূল্যে তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপকরণ পান। প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে ঘণ্টা বাজে। সেই ধ্বনি শুনে শত শত সাধু তাঁদের কুটির বা গুহা থেকে বেরিয়ে চলে আসেন এখানে; সারি দিয়ে দাঁড়ান, খাবার নিয়ে আবার যাঁর যাঁর কুটিরে ফিরে যান। এক বেলা নয়, দু বেলা; দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এমনই চলে আসছে।

কি খাদ্য পান তাঁরা?—জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

রুটি বা ভাত আর ডাল।

ওতেই চলে সাধুদের। গীতার শ্লোক মনে পড়ল: বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

এখান থেকে খেয়া-নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে ওপারে যাবার সংক্ষিপ্ত পথ। খেয়ার কড়ি লাগে না, কারণ এও বাবার প্রতিষ্ঠানের যাত্রীসেবা।

ঘাট পর্যন্ত যেতে বেশ খানিকটা উতরাই ভাঙতে হয়। সেখানে গিয়েই দেখি সেই মা ও মেয়ে। বৃদ্ধা স্নান করে বসেছেন। সামনে ঘটিভরা জল, মেয়েটি তাঁর ঝোলা থেকে বের করছেন কিছু ফলমূল।

আমাদের দেখেই সহাস্য সম্ভাষণ মেয়েটির। আর শুধুই কি তাই? তৎক্ষণাৎ তিনি বেশ বড় একটি আপেল জিতেনের হাতে প্রায় গুঁজে দিলেন, আমাকে দিলেন দুটি কলা। সম্পূর্ণ সহজ ব্যবহার, যেন কতদিনের চেনা আমরা। আমার মুখের দিকে চেয়ে পরিহাসতরল কণ্ঠে তিনি বললেন, আপনার তো, চাচা, প্রায় আমার মায়েরই হাল। তাই নরম ফল দিলাম।

কটাক্ষ আমার দন্তহীনতার প্রতি; তাকিয়ে দেখি যে বৃদ্ধাও আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসছেন

কিন্তু হাসিতে কি সব ঢাকা পড়ে! ঢাকা পড়ে নি বৃদ্ধার পক্ককেশ, লোলচর্ম, নিষ্প্রভ দুটি চোখ; ঢাকা পড়ে নি তাঁর সারা মুখ জুড়ে চেপে আছে যে বিষণ্ণতার হালকা-কালো কিন্তু স্থায়ী মেঘখানি।

হঠাৎ মুখে এসে গেল : ছেলে নেই আপনার ?

বৃদ্ধা অঙ্গুলিসঙ্কেতে দেখিয়ে দিলেন যুবতীকে।

ঠিক বলেছেন : না বলে থাকতে পারলাম না আমি। ছেলে থাকলেও এর চেয়ে বেশী আর কি হত।

তার পর যুবতীকে উদ্দেশ করে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন কর্মস্থানের কথা বলছিলেন। চাকরি-বাকরি করেন নাকি আপনি ?

পরিচয় দিলেন তিনি। আলমোড়ার শহরতলিতে এক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। আরও বললেন, আলমোড়ার দিকে কখনও যদি যান, দেখা করলে খুশী হব আমরা।

জিতেন ফস করে বলে বসল, দেখা করতে হলে আরও একটু সূত্র চাই যে।

মেয়েটি হেসে উত্তর দিলেন, আমার নাম দাদা, গঙ্গোত্রী। ওখানে গিয়ে এই নাম বললে আমার বাসা খুব বেশী খুঁজতে হবে না।

বড় ভাল লাগছে এই বুদ্ধিমতী, সপ্রতিভ মেয়েটিকে। মুগ্ধদৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আমি বললাম, নামটা মনে হচ্ছে ঠিক রাখা হয় নি। যে রকম ছুটতে পারেন আপনি তাতে আপনার নাম হওয়া উচিত ছিল ভাগীরথী।

এবার মেয়েই অঙ্গুলিসঙ্কেতে তাঁর মাকে দেখিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, আমি ছুটছি তো ওঁর জন্যে।

তাই অনুমান করেছিলাম আমি। তথাপি খেয়া-নৌকাতে উঠে বসবার পর গঙ্গোত্রীকে চুপিচুপি বললাম, আপনার মায়ের যা বয়স তাতে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওঁকে ঘরে রাখাই তো ভাল।

গঙ্গোত্রী মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন, চেষ্টা কি আর কম করেছি! কিন্তু উনি মানেন না। আমি সঙ্গে না এলে হয়তো একাই বেরিয়ে পড়বেন।

নিজেও জানি, বৃদ্ধবৃদ্ধাদের স্বভাবই তাই। উত্তরে বলবার মত কোন কথা আমার মনে এল না। কিন্তু একটু থেমে গঙ্গোত্রীই আবার বললেন, তবু ভাবি যে, এই ভাল। তবু তো আশা আছে। আর আশা আছে বলেই বেঁচেও আছেন।

কিসের আশা ?—আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম।

উত্তর না পেয়ে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি গঙ্গোত্রী মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। একটু বিব্রত ভাব নাকি তাঁর!

তথাপি আমি জিজ্ঞাসা করলাম, Do you mean faith ?

গঙ্গোত্রী যেন উৎফুল্ল হয়ে উত্তর দিলেন, Exactly.

সংশয়ের ঘোরটা কেটে গেল আমার। আমি বললাম, তা ঠিক। অসীম শক্তি পাওয়া যায় ওই বিশ্বাস থেকে। তা তো চোখেই দেখছি। ওকে আফিম বললেও বলা হয় যে ওর শক্তি আছে।

খেয়া-নৌকা দিব্যজীবন সমিতির ঘাটে এসে ভিড়ল। নীচে নেমে গঙ্গোত্রী বললেন, আসবেন নাকি আশ্রমে আমাদের সঙ্গে? তবে আমাদের অনেক দেরি হতে পারে। স্বামী শিবানন্দের সঙ্গে দেখা করব। কিছু কথা আছে তাঁর সঙ্গে।

আমার অনিচ্ছা ছিল না। কিন্তু ঋষিকেশের গঙ্গা জিতেনের মাথায় ঢুকে রয়েছে। তার তাড়া খেয়ে আমাকেও তখনই ফিরতে হল।

সৌভাগ্য বলব, না দুর্ভাগ্য? বেশ একটু বেলা থাকতেই ঋষিকেশের গঙ্গার ঘাটে আবার গিয়ে পৌঁছলাম বলেই না পূর্ণ হল আবাল্যের একটি সাধ। কিন্তু ওই জন্যেই তালও কেটে গেল। ওপারে স্বর্গাশ্রমের পথে চলতে চলতে মনের বীণার সূক্ষ্ম তন্ত্রীটি আপনা থেকেই যেন উচ্চ সপ্তকে বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ সে তার ছিঁড়ে গেল।

ঘাটে দেখি সেই সন্ন্যাসী—কাল হরিদ্বারে যিনি একটিবার আমাদের দিকে তাকিয়েই অপ্রসন্ন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। আজ কিন্তু তিনি নিজেই হস্তসঙ্কেতে আমাদের আহ্বান করলেন।

খুব না হলেও বৃদ্ধ। জটাজূট নেই। তাঁর মুণ্ডিত মস্তকে পাকা চুল আবার ইঞ্চিখানেক বড় হয়েছে। মুখমণ্ডলেও খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি। চোখের দৃষ্টি মনে হয় অশান্ত।

আমারই মুখের দিকে চেয়ে তিনি হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলেন, কাল ওখানে কি বলছিলেন আপনারা? দীক্ষা নিয়ে আশ্রমে বাস করতে চান নাকি?

অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন। আমি লজ্জায় চোখ নামিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বললাম, না না।

শুনে যেন প্রীত হয়ে বললেন তিনি, অমন কাজও করবেন না। অনেক টাকা নিয়ে নিজে যদি আশ্রম করে বসতে পারেন তো ভাল। কিন্তু আর কোন আশ্রমে যাবেন না—তা সে যত নামকরা আশ্রমই হোক।

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এ কথা কেন বলছেন আপনি ?

ঠকে শিখেছি কিনা, তাই শেখাচ্ছি আপনাদের, যাতে আপনারাও না ঠকেন।

স্তব্ধ হয়ে তাঁর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকবার পর আমি বললাম, শুনতে আগ্রহ হচ্ছে আমার। বলবেন আপনার কথা ? অনেক সময় লাগলেও শুনব।

উত্তর হল : সময় কেন লাগবে ? মূল কথা তো একটি। আশ্রমেই আমি ছিলাম—প্রায় পাঁচটি বছর। তার পর আর থাকতে না পেরে বেরিয়ে এসেছি।—একটি বিখ্যাত আশ্রমের নাম করলেন তিনি।

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, জানেন, সম্পূর্ণ আশ্বাস তাঁরা আমায় দিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে আমার বাকি জীবনের সব ভার তাঁরা নেবেন। মুগ্ধ হয়ে চাকরি ছেড়ে, পরিবার ছেড়ে দীক্ষা নিয়ে আশ্রমে ঢুকেছিলাম। কিন্তু থাকতে পারলাম না।

কেন ?

কিছুই পেলাম না—না ঈশ্বর, না মানুষ।

কি করতেন আপনি সেখানে ?

ওই দেখুন—ও যা করছে।

সন্ন্যাসীর অঙ্গুলিনির্দেশ অনুসরণ করে দেখলাম একটি যুবককে। তারও সন্ন্যাসীর বেশ। কিন্তু জলভরা প্রকাণ্ড একটি ঘড়া কাঁধে নিয়ে ক্লান্ত পদে বালিচর ভেঙে ধীরে ধীরে উপরে উঠছে সে। অনেক উপরে একটি মন্দির, না মঠ। সেই দিকেই গতি যুবকটির।

মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমি বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর দিকে তাকাতেই তিনি আবার বললেন, আমাকে দিয়ে, মশায়, ওই রকম চাকর খাটিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু এই বুড়ো হাড়ে কি ওসব সয় !

কি উত্তর দেব ? মুখে আমার কথা ফুটল না। কিন্তু জিতেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, এখন তা হলে কি করবেন আপনি ?

একটি যেন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী বললেন, চেষ্টা করছি নিজের একটি আশ্রম করবার। আমার কয়েকজন শিষ্য আছে। চিঠি লিখেছি তাদের কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্য। গোয়ালিয়রের একজনের

কাছ থেকে কিছু আশ্বাসও পেয়েছি। তবে আপাততঃ চলেছি বদরীনাথ। একবার নীচে নেমে গেলে আর হয়তো এদিকে আসাই হবে না।

নিজের নাম তিনি বললেন সত্যানন্দ আশ্রম।

ফিরতি পথে জিতেন আমাকে বললে, শুনলেন তো মণিদা? আশ্রম আর সাধু দেখলেই অমন ঝুঁকে পড়বেন না। পড়লে হয়তো শেষে এমনি আফসোস করতে হবে।

চোখেমুখে দুষ্টুমির চাপা হাসি তার। দেখে আমি একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠেই বললাম, এতদিনে তোমার একজন দোসর পেলে বুঝি?

চাপা হাসি সারা মুখে ছড়িয়ে দিয়ে সে উত্তর দিল, মোটেই না। আমি তো সংসারে ফিরে এসেছি, জীবনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছি নিজেরই ঘাড় পেতে। আর উনি? শুনলেন না—নিজে একটি আশ্রম করবেন। কেন? নিজের ঘর তা হলে কি দোষ করেছিল? বোগাস।

হয়তো তাই। তবুও মনটা সমবেদনায় টনটন করছিল আমার। কি করুণ অনধিকারীর এই ব্যর্থ সাধনা। কিন্তু কার এ ব্যর্থতা—শিষ্যের, না গুরুর? তবে যে শুনি, পরশপাথরের ছোঁয়া লাগলে লোহাও সোনা হয়!

পরদিন সকালে পাঞ্জাবীর হোটেলে বসে চা খাচ্ছিলাম। জিতেন ছুটতে ছুটতে এসে বললে, শীগগির টাকা দিন মণিদা, এখনই বাস ছাড়বে।

বাসস্ট্যাণ্ড কাছেই। মিনিট পাঁচেক পর সেখানে গিয়ে দেখি, গঙ্গোত্রী আর তাঁর মা একটি বাসের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন; জিতেন বিরক্ত মুখে তাঁদের কাছে দাঁড়িয়ে।

আমাকে দেখেই জিতেন বললে, একটুর জন্য একসঙ্গে যাওয়া হ'ল না। টাকা আনতে গিয়ে দেরি হল বলে ওদের বাসে আর সীট পাওয়া গেল না।

গঙ্গোত্রী আমাকে বললেন, বেশ হত একসঙ্গে যেতে পারলে। তবে পথের সাথী তো আমরা—এ রকম ছাড়াছাড়ি অনিবার্য। তবু আশা রইল যে আবার দেখা হবে। দেবপ্রয়াগেই আমরাও থাকব।

আমাদের বাস ছাড়বে প্রায় এক ঘণ্টা পর। সীট নিয়ে মারামারি নেই, মালপত্রের তদারক করছে জিতেন। সুতরাং নিশ্চিন্ত চিত্তে ময়দানে পায়চারি করছিলাম। হঠাৎ দেখি সেই বাঘমুখো নেপালী কুলির সর্দার। ঝুঁকে সেলাম করে সে বললে, ও আপনার লড়কা, বাবুজী।

বলে কি লোকটা! আমাদের হুলিটাকে দেখিয়ে বলছে যে সে আমার ছেলে!

"লড়কা"র দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম এই প্রথম। তারও বেঁটে গঠন, পেটানো লোহা দিয়ে তৈরি যেন তার হাত পা ও বুকের মাংসপেশীগুলি। কিন্তু এ লোকটির দেহের বর্ণ বাদামী। ডান হাতের দুটি অঙ্গুলি দিয়ে থেবড়া নাকের নীচে পাতলা গোঁফজোড়ার একটি প্রান্তে ক্রমাগত নবাবের মত চাড়া দিচ্ছে সে।

আমি তার দিকে তাকাতেই সে গোঁফ ছেড়ে দিয়ে হাত তুলে সেলাম করল আমাকে। সঙ্গে সঙ্গেই তার সারা মুখ হাসিতে ভরে গেল।

নাম কি তোমার?—আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

সে উত্তর দিল, বীর বাহাদুর।

॥ ৪ ॥

নাম আছে, বস্তু নেই। ঝুলা আর ঝোলে না। সার্থকনামা ভয়ঙ্কর লছমনঝুলা অতীতের গর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। আধুনিক স্থপতিবিদ্যার কল্যাণে বর্তমান বস্তুটি কঠিন ইস্পাতের সুদৃঢ় নিরাপদ পুল। হেলে না, দোলে না ; পা ফসকে পড়ে যাবার ভয় একেবারে নেই।

কিন্তু সেকালের ঝুলন্ত পুলের প্রেতাত্মা একালের বাসের মধ্যে বাসা করেছে নাকি! ওপারের প্রায়-পরিত্যক্ত সরু ও দুর্গম পায়ে-চলা পথে হেঁটে যেতে হবে না বুঝে মনে মনে উল্লসিত হয়ে কি ভুলই যে করেছি তা টের পেলাম বাস চলতে শুরু করবার পরেই। বসেছি লোহা ও কাঠের সুদৃঢ় নিশ্ছিদ্র আশ্রয়ে। তবুও অনবরত দোলা লাগছে দেহে। হেলছি যে তা কেবল ডাইনে ও বাঁয়ে নয়, থেকে থেকেই দেহের উর্ধ্বাঙ্গ আসন থেকে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে, ঠক্ করে মাথা গিয়ে ঠেকছে বাসের ছাদে। মিনিট দশেক চলতে না চলতেই মনের মধ্যে নিরাপত্তার অনুভূতি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে গেল। জ্যা দেওয়া ধনুকের ছিলার মত টান টান অবস্থা দেহের প্রত্যেকটি স্নায়ুতন্ত্রীর। ডাইনে বাঁয়ে সামনে—যে দিকেই তাকাই না কেন, স্বস্তি নেই। ভয়ে চোখ বুজে যায়। মাটির সাক্ষাৎ স্পর্শ তো আগেই হারিয়েছিলাম, পরোক্ষ সংস্পর্শের নিশ্চয়তা সম্বন্ধেও এখন গভীর সন্দেহ মনে।

দোষ অবশ্য বাসের নয়, যে পথে বাস চলছে, তার। কি মারাত্মক পথে বাস চালিয়েছে এরা!

ডিনামাইট দিয়ে ভেঙে, পাথর সরিয়ে, গাছপালা কেটে পাহাড়ের কোলে কোলে সড়ক তৈরি হয়েছে। মোটর চলবার মত প্রশস্ত নিশ্চয়ই সে পথ। কিন্তু গাড়িতে বসে পথের বিস্তার চোখে পড়ে না, দেখা যায় দু দিকেই তার সীমানা। সে দৃশ্য ভয়াবহ। এক দিকে খাড়া পাহাড় সোজা আকাশে উঠে গিয়েছে। সর্বত্রই দেয়ালের মত মসৃণ নয় ওর দেহ, বাঁশের মত সরলও নয় ওর উর্ধ্বগতি। মাঝে মাঝে হাতকয়েক উঁচুতেই কার্নিসের মত প্রসারিত হয়ে আছে হয়তো একখানি মাত্র পাতলা শিলাখণ্ড, হয়তো বা বিশাল পাহাড়টির মেখলা থেকে চূড়া পর্যন্ত ওর বিপুল দেহের অবশিষ্ট সবটুকুই। দূর থেকে দেখলে ভয় হয় বুঝি বা বাসের ছাদ ঠেকে

যাবে ওতে, হয়তো বা সবটা কার্নিসই ভেঙে পড়বে বাসের উপর। একটির পর একটি পাহাড়ের কোলের উপর দিয়ে সাপের মত এঁকে-বেঁকে চলে গিয়েছে পথ। বাঁকে বাঁকে বাধা—উপরের কার্নিস আর মোড়ে মোড়ে পথের উপর এগিয়ে-আসা পাহাড়ের কোণগুলির অচল বাধাই কেবল নয়, পাদচারী পথিক এবং তার চেয়েও মারাত্মক চলন্ত পশুপালের বাধাও অপেক্ষাকৃত সরল পথেও হঠাৎ থামিয়ে দেয় চলতি বাসকে। খ্যাঁচ করে ব্রেক কষে গাড়ি থামায় ড্রাইভার। সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরে যাত্রীমহলে ভূমিকম্পের বিপর্যয়।

ওই খাড়া পাহাড়ের প্রায় গা ঘেঁষে চলে বাস। নীচে সড়কের অস্তিত্বের মত চলতি বাস আর নিথর শিলাময় পাহাড়ের মাঝখানের ব্যবধানটুকুও সম্পূর্ণ অনুমানসাপেক্ষ।

তুলনায় ভয়ঙ্কর রকমে প্রত্যক্ষ বিপরীত দিকের খদ। খাড়া নীচে নেমে গিয়েছে পাহাড়। দৈত্যের মত বিরাট রাশিরাশি পাথর বিশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে আছে ওর খাঁজে খাঁজে। বল্লমের মত তীক্ষ্ণ ফলা এক একখানা পাথরের। মাঝে মাঝে আবার ওদের ফাঁকে ফাঁকে বড় বড় গাছ সঙ্গীনধারী শত্রুবাহিনীর মত সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। ডালপালা লতাগুল্মের ফাঁকে ফাঁকে অনেক—অনেক নীচে থেকে থেকে চোখে পড়ে কল্লোলিনী পাগলা-ঝোরা। বাসের ইঞ্জিন একটু থামলেই কানে আসে তার প্রমত্ত গর্জনধ্বনি। মনে হয় যে শত শত বিপুলায়তন শিলাখণ্ডের দুর্ভেদ্য কারাগারে বন্দিনী নির্ঝরিণীর বিপুল জলধারার আবর্তবিক্ষুব্ধ বক্ষ থেকে মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততাই যেন বাসের যাত্রীদের উদ্দেশে খলখল অট্টহাস্যের ভয়ঙ্কর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

লুব্ধ অধীর উচ্ছলিত মরণের ভয়ঙ্কর রূপ প্রত্যক্ষ করলাম দেবপ্রয়াগে। ঋষিকেশ থেকে চুয়াল্লিশ মাইল দূরে পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র ওটি। ভাগীরথী ওখানেই গঙ্গা হয়েছেন।

প্রয়াগ মানে সঙ্গম। ভাগীরথীর মিলন দেখলাম তেমনি বিপুল আর এক জলধারার সঙ্গে—অলকনন্দা আর মন্দাকিনীর যুক্তধারা।

পতিতোদ্ধারিণী কলুষনাশিনী গঙ্গা। মা বলে ডাকি আমরা। কিন্তু এ কি রূপ তার! গঙ্গা এখানে ভয়ঙ্করী।

নানা জায়গায় দাঁড়িয়ে, নানা কোণ থেকে জাহ্নবীর রূপ দেখলাম। স্বতন্ত্রভাবে একবার ভাগীরথীকে, একবার অলকনন্দাকে। উভয় ধারাকেই

একবার এপার থেকে, একবার ওপার থেকে ; লোহার পুলের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে নীচে তাকিয়ে তাকিয়ে। উভয়ের সম্মিলিত রূপ দেখলাম আসল সঙ্গমতীর্থে পাথরের ঘাটের সর্বশেষ শুকনো সিড়িতে দাঁড়িয়ে। তা সে যেখান থেকেই তাকাই না কেন, একই রূপ চোখে পড়ে। প্রলয়ঙ্কর সে রূপ। একই রকম গর্জনধ্বনি কানে আসে—বুঝি একেই বলে প্রলয়বিষাণের বজ্রনির্ঘোষ।

মহাসমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ দেখেছি, শুনেছি তার অবিরাম অশান্ত গর্জন। সত্যই "সুগম্ভীর স্নেহখেলা" তা। সে তরঙ্গভঙ্গের ছন্দ আছে। সে গর্জনের বিষণ্ণ-গম্ভীর সুরে মন অভিভূত হয়, দোলা লাগে যেন দেহের প্রতি অণুপরমাণুতে। কিন্তু এখানে যা শুনছি তা যেন রক্তপিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ কোন ভয়ঙ্করী দানবীর খলখল অট্টহাস্য।

কি দুর্বার গতি, কি বিপুল উচ্ছ্বাস, কি ভয়ঙ্কর গর্জন! হয়তো গভীর তেমন নয়। বেশ অনুমান করা যায় যে, তীরে তীরে যেমন, জলের নীচেও তেমনি কঠিন শিলাময় পাহাড় বা পাহাড়েরই অগণিত ভগ্নাংশ ছড়িয়ে পড়ে আছে, ঢলের সঙ্গে তেমনই দুর্বার বেগে উপর থেকে ক্রমাগতই গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে আসছে। চলার পথে পায়ে পায়ে বাধা পাচ্ছেন বলেই বুঝি ভাগীরথী ও অলকনন্দার ওই বিদ্রোহিনীর রূপ। তরঙ্গ নেই, আছে অগণিত কুটিল আবর্ত। শূলবিদ্ধ শেষ নাগ যেন তার উদ্যত সহস্র ফণা প্রসারিত করে সহস্র কুটিল নিষ্ঠুর লেলিহান জিহ্বা থেকে প্রতি-হিংসার নীল বিষ ছড়িয়ে ছড়িয়ে অক্ষম আক্রোশে নিরন্তর ফুঁসছে। জননী জাহ্নবী বলে ওকে পূজা করতে মন চায় না—ও যেন কালো না হয়েও লোলরসনা, করালিনী কালী।

নৃমুণ্ডমালিনীর মতই ইনিও বলি চান না তো?—জিজ্ঞাসা করেছিলাম বিকেলে স্থানীয় এক ভদ্রলোককে।

উত্তরে অকুণ্ঠিত স্বীকৃতি তাঁর। শুধু তীর্থস্নানেই তো নয়, ভাগীরথী-অলকনন্দার জল লাগে স্থানীয় লোকের শত প্রয়োজনে। ঘাটও আছে অনেকগুলি। আঘাটারও ব্যবহার হয় প্রয়োজনের তাগিদে। স্ত্রী-পুরুষ ঘাটে যান, স্নান করেন, বাসন মাজেন, কাপড় কাচেন ওই জলে সাবান দিয়ে। কোন কারণে পা পিছলে যদি যায়, কেউ কেউ ভেসে যায় বইকি। যুবক, নারী, শিশু—নিয়তি যখন যাকে টানে।

খুবই স্বাভাবিক। তবু গা শিউরে উঠেছিল। দ্বিতলের সমান উঁচুতে বসে আছি। কাছেই একটি ঘাট। নীচে তাকিয়ে দেখি স্থানীয় মহিলারা গিয়েছেন বড় বড় ঘড়া নিয়ে। দু-চারটি শিশুও আছে ওখানে। তাদের পায়ের নীচেই অলকনন্দা ফুঁসছে।

বাসে বসেই সহযাত্রী একজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। দেবপ্রয়াগ থেকে মাইল চারেক দূরে একটি পাহাড়ের উপর তার পৈতৃক বাড়ি। সেখানেই যাচ্ছিলেন তিনি।

কথায় কথায় বলেছিলেন, দোটানায় পড়ে হাবুডুবু খাই, মিস্টার। জমিজমা যা আছে তা থেকে তিন মাসেরও খোরাক আসে না। অথচ ছাড়তেও পারি নে এ জঞ্জাল। তাই মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে দেশে আসতে হয়।

শহরে আপনি চাকরি করেন বুঝি?—জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমি।

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, না করে উপায় কি! জাতে আমি ক্ষত্রিয়। এই দেবপ্রয়াগের পাণ্ডাদের মত হাত পাতলেই তো পয়সা হবে না আমার।

বাস থেকে নামতে না নামতেই সেই পাণ্ডারা এসে ঘিরে ধরল আমাদের দুজনকে।

কেদার যাবেন তো? না সোজা বদরীনাথ? পাণ্ডা কে আপনাদের? বাড়ি কোথায়?—এক সঙ্গে চার-পাঁচজনে প্রশ্ন করছে।

মলিন বসন সকলেরই, তাও অপর্যাপ্ত। খালি পা। শীর্ণ মুখে দারিদ্র্যের ছাপ। যত জোর সব বুঝি তাদের কণ্ঠস্বরে।

আমার কোন পাণ্ডা নেই। কিন্তু বললে সে কথা শোনে কে! প্রশ্ন হয়: গ্রামের নাম বলুন, যার অর্থ এই যে, কোন কালে আমার গ্রাম থেকেও কেউ যদি এখানে এসে থাকেন তবে তারই পাণ্ডা বা তস্য উত্তরাধিকারীর যজমান হয়ে আছি আমি।

ভাল হত যদি পরিচিত কারও কাছ থেকে তার পাণ্ডার নাম জিজ্ঞাসা করে টুকে নিয়ে আসতাম। সমবেত আক্রমণ থেকে রেহাই পেতাম তা হলে। তা আমি নি বলেই চারিদিক থেকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে দিশাহারা হয়ে পড়লাম।

জিতেনের অবস্থাও তাই। তবে তার উপস্থিতবুদ্ধি বেশী; বিশেষতঃ

রূঢ় হতে জানে সে। কিছুতেই ওদের নিরস্ত করতে না পেরে অবশেষে সে তার ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করল। বললে, তীর্থ করতেই আসি নি আমরা, এসেছি বনের সাপ-বাঘ আর পাহাড়ের মাথায় বরফ দেখতে।

বাহাদুরকে সে হুকুম করল ধর্মশালায় যেতে।

কিন্তু সেখানে গিয়েও রেহাই নেই। দু-তিন জন সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। অনবরত বলে যাচ্ছে তারা দেবপ্রয়াগের মাহাত্ম্য, ফিরিস্তি দিচ্ছে স্থানীয় দর্শনীয় মন্দিরের। রঘুনাথজীর মন্দির তো আছেই—তা ছাড়াও দুর্গামায়ী, বিশ্বেশ্বর, ক্ষেত্রপাল, আরও কত কি! এ তীর্থে প্রধান কৃত্য পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ, পিণ্ডদান ইত্যাদি। সে সব করতে হয় সঙ্গমস্থলে। অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি এবং সে সব পালন করলে কত পুণ্য যে লাভ হবে তাই তারা আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করছিল।

জিতেনের সাফ জবাব: আমরা কিছুই করব না।

পাণ্ডার ধৈর্যেরও সীমা আছে; মুখ বেজার করে দুজন চলে গেল দেখলাম।

আমি জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখছিলাম, কিছুক্ষণ পর কানে এল মিহি সুরের মৃদু সম্ভাষণ: বাবুজী!

তাকিয়ে দেখি বছর কুড়ি বয়সের একজন বড়ই যেন করুণ চোখে চেয়ে আছে আমার মুখের দিকে। চোখে চোখ মিলতেই কাতর স্বরে সে বললে, আপ তো, বাবুজী, দরিয়া হ্যায়; হম সির্ফ এক পন্‌ছি।

তার মানে?—আমি রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছি।

মুখ কাঁচুমাচু করে সে বললে, আমি একটু জল খেলে আপনার কিছুই ফুরবে না, বাবুজী।

তবুও বুঝতে পারলাম না। কিন্তু জিতেন হো হো করে হেসে উঠল। সে-ই বুঝিয়ে বললে আমাকে যে, ওই লোকটির মতে আমার এত টাকা আছে যে ওকে কিছু দিলে আমার কোনই ক্ষতি হবে না।

তারপর লোকটির মুখের দিকে সে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, তা পন্‌ছি মহারাজ, তোমার আসল নামটি কি?

সে উত্তর দিল, বলবীর উপাধ্যায়। কিন্তু বিরস কণ্ঠস্বর তার।

নির্মম জিতেন তথাপি তীক্ষ্ণ পরিহাসের স্বরেই আবার জিজ্ঞাসা করল: গোড়াতেই আসল কথাটা না বলে অত আগড়-বাগড় বকছিলে কেন?

ভাল লাগল না আমার ; চোখের দৃষ্টিতে জিতেনকে একটু শাসন করলাম আমি। তার পর বলবীরকে বললাম, তুমি, ঠাকুর, অনর্থক তোমার সময় নষ্ট করছ। এখানে আমরা কিছুই করব না।

সঙ্গমে স্নানও করবেন না ?

এ প্রশ্নের উত্তরে "না" বলা যায় না—স্নানের তাগিদ রয়েছে আমার নিজের মনের মধ্যেই। তবে ঘুরিয়ে উত্তর দিলাম ; বললাম, দেরি হবে, তুমি এখন যাও।

ভালই করেছিলাম ওরকম উত্তর দিয়ে। যাকে স্নান করা বলে, দেবপ্রয়াগে তা অসম্ভব। বাঁধা ঘাট, সিঁড়িও আছে। তবুও হাঁটুজল পর্যন্ত নামতে ভরসা হয় না—পা ফসকাবার দরকার নেই, স্রোতের টানেই মুহূর্তমধ্যে কোথায় যে গিয়ে পড়ব কে জানে। সুতরাং শুকনো সিঁড়ির উপর বসে তোয়ালে ভিজিয়ে তাই সর্বাঙ্গে বুলিয়ে নিলাম ; ঘটি ভরে জল তুলে তাই ঢাললাম মাথায়। তাতেই অশেষ তৃপ্তি।

যাত্রীরা তর্পণ করছে—এক একটি দল একসঙ্গে। স্নান করে সিক্ত বস্ত্রেই দাঁড়িয়েছে তারা। দাঁড়িয়েছে সঙ্গমের দিকে মুখ করে। হাতে কিছু ফুলপাতা, তিলও কয়েকটি আছে হয়তো। স্থানীয় পুরোহিতেরা মন্ত্র পড়াচ্ছে। প্রতিটি শব্দ কানে আসে না, কিন্তু স্বরটি চেনা। আজন্মের সংস্কার যাবে কোথায় ? শ্রাদ্ধের মন্ত্রের পরিচিত সুর কানের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে, মনের বীণার তারেও ঝঙ্কার দেয়।

দুজনেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওই দৃশ্য দেখছিলাম। ধীরে ধীরে একজন লোক এগিয়ে এল আমাদের দিকে। প্রৌঢ়। দীর্ঘ ঋজু দেহ অনাবৃত। বুকের উপর শুভ্র উপবীতগুচ্ছ হাওয়ায় উড়ছে—উড়ছে তার মাথার দীর্ঘ শিখাটিও। ব্রাহ্মণোচিত চেহারাই বটে। উঁচু নাক, রোদে পোড়া হলেও গৌরবর্ণ, ললাটে শ্বেতচন্দনের কয়েকটি রেখা।

কাছে এসে সে জিজ্ঞাসা করল, ক্রিয়াকর্ম কিছু করবে, বাবুজী ?

প্রথমে চমকে উঠেছিলাম, খুশী হলাম তার পরেই। তাকালাম জিতেনের দিকে। সে শ্যাম ও কুল দুই-ই রক্ষা করে বললে, তা দোষ কি—সবাই যখন করছে।

মনে হল যে প্রীত হয়েছে ব্রাহ্মণ। উপকরণ তার সঙ্গেই ছিল। কিছু আমার, কিছু জিতেনের হাতে দিয়ে সে নির্দেশ দিল সঙ্গম থেকে এক এক গণ্ডূষ জল তুলে নিতে।

আরম্ভ ভালই হয়েছিল, কিন্তু একটু পরেই গোলমাল হয়ে গেল।

এতক্ষণ মোটেই দেখা যায় নি। ভীমগর্জনা ভাগীরথীর অমন ভয়ঙ্কর আবর্তসঙ্কুল জলে ওরা যে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারে তা আমরা ভাবি নি। অথচ সত্যিই ভেসে উঠল মহাশোল মাছ—একটি নয়, অন্ততঃ তিনটি। জিতেন যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে এক ধাপ নীচেই। জিতেনের চোখেই আগে পড়েছে। সে মন্ত্র বলা বন্ধ করে উল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠল, দেখেছেন মণিদা, এখানেও মাছ!

দেখলাম আমিও। সঙ্গে সঙ্গেই আমারও আবৃত্তি বন্ধ। অধিকন্তু এক ধাপ নীচে নেমে জিতেনের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর দুজনেই উপুড় হয়ে মাছ দেখছি। সমস্ত মনোযোগ আমাদের ওই মাছেদের দিকে।

অমন করে কতক্ষণ কেটেছিল বলতে পারি নে। হঠাৎ যেন গঙ্গার গর্জনধ্বনিকেও ডুবিয়ে বজ্রনির্ঘোষ কানে এল আমার: তুমলোগ মছলি দেখনে আয়ে হো! তব দেখো উনহিকো।

চমকে মুখ তুলে দেখি আমাদের পুরোহিত বলছেন ও কথা। ললাট তাঁর কুঞ্চিত, চোখ দুটিতে যেন আগুন জ্বলছে।

আমি অপ্রতিভ হয়ে বললাম, ঘাট হয়েছে ঠাকুরমশায়। আবার গোড়া থেকে শুরু করছি।

কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করলেন না তিনি। গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে "শ্রীবিষ্ণু" "শ্রীবিষ্ণু" বলতে বলতে খানিকটা জল তাঁর নিজের মাথার উপর ছিটিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন—একেবারে আমার মুখোমুখি। তারপর তাঁর ডান হাতখানি বিচিত্র ভঙ্গিতে আমার মুখের সামনে এক পাক ঘুরিয়ে নিয়ে অপেক্ষাকৃত মৃদু কিন্তু তীক্ষ্ণকণ্ঠে তিনি বললেন, শ্রদ্ধা ছাড়া শ্রাদ্ধ হয় না।

রাগ হল না আমার, হল লজ্জা। প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠবার পর আবার যখন মুখ তুলে তাকাতে পারলাম তখন দেখি যে, পুরোহিত বেশ কয়েক ধাপ উপরে উঠে গিয়েছেন। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে পথ আটকালাম তাঁর। কুণ্ঠিত স্বরে বললাম, তা হলে আপনার দক্ষিণাটা আপনি নিন।

কিন্তু শুনেই আবার জ্বলে উঠল তাঁর চোখ দুটি—যেন কোন অশুচিস্পর্শ এড়াবার জন্যই খানিকটা দূরে সরে গিয়ে প্রায় ফিস ফিস করে তিনি বললেন, আমি পাণ্ডা, পুরোহিত—ভিখারী নই বাবুজী।—বলেই মুখ ফিরিয়ে তরতর করে উপরে উঠে গেলেন তিনি।

অপ্রতিভের একশেষ আমি। জিতেনের অবস্থাও আমারই মত। পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা। তৃতীয় এক ব্যক্তি কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন বুঝে চেষ্টা করে সহজ হতে হল।

ধর্মশালা পর্যন্ত যে পাণ্ডারা আমাদের পিছনে ধাওয়া করেছিল তাদেরই একজন বলে চিনতে পারলাম লোকটিকে। মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে সে বললে, পাগলা শম্ভুজীর হাতে গিয়ে পড়েছিলেন, বাঙালীবাবু। তাই এমন নাজেহাল হতে হল।

একটু খোঁচা ছিল তার কথায়। প্রতিক্রিয়ায় আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে অতিসচেতন জিতেন বলে উঠল, লোকটা ভারি দাম্ভিক।

কিন্তু সায় দিল না নতুন পাণ্ডাটি। সে বললে, না বাবুজী, তা নয়। শম্ভু পাণ্ডার মাথায় একটু ছিট আছে, কিন্তু সাচ্চা লোক। অশ্রদ্ধা অনাচার একেবারে সহ্য করেন না বলেই অমন মনে হয়।

একটু চুপ করে থেকে তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, এখানেই ওঁর বাড়ি বুঝি ?

উত্তর হল : না। শম্ভুজীর আসল বাড়ি গোপেশ্বরের কাছে। পরিবার সেখানেই থাকে। উনি থাকেন যোশীমঠে, মাঝে মাঝে এই দেবপ্রয়াগে আসেন একা।

একা কেন ?

ওই তো দেখলেন—কে ওর সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবে !

একটু থেমে পাণ্ডা আবার বললে, তবে সাচ্চা ব্রাহ্মণ এই শম্ভুজী—ব্রহ্মতেজ অটুট আছে ওর মধ্যে। শাপ দিয়ে উনি ভস্ম করতে পারেন অনাচারী পাপীকে।

এ রকম একটি ঘোষণা আমার পক্ষেও হজম করা কঠিন, জিতেনের তো কথাই নেই। সে হো হো করে হেসে উঠল। আমার গায়ে একটি ঠেলা দিয়ে সে বললে, বড্ড বেঁচে গিয়েছি আমরা, এখন পালাই চলুন।

তা পারলাম না। শম্ভু পাণ্ডার অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করতে না পারলেও এরই মধ্যে মনে মনে তাঁকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছিলাম। ভাবছিলাম যে, তীর্থে আমাদের একজন পাণ্ডা যখন না হলেই নয় তখন এই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকেই তীর্থগুরু করতে পারলে মন্দ হয় না। তাই নতুন পাণ্ডাটির হাতে একটি টাকা দিয়ে তাকে অনুরোধ করলাম শম্ভুজীর বাড়িটা আমাদের দেখিয়ে দিতে।

খুশী হয়েই বাড়ি দেখিয়ে দিল সে, কিন্তু নিজে ভিতর পর্যন্ত সঙ্গে গেল না। শুনিয়ে দিল আমাদের যে তার নাম চক্রধর; নীচে রঘুনাথজীর মন্দিরে সে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে।

বেশ খানিকটা উঁচুতে শ্লেট পাথরের মত হালকা টালির ছাদওয়ালা ছোট একখানা বাড়ি শম্ভু পাণ্ডার। ঘর-ভরা পুঁথি, মেঝেতে বিবর্ণ একখানি গালিচা পাতা। তার উপর বসে শম্ভুজী নিবিষ্ট মনে একখানি বুঝি চিঠিই পড়ছিলেন।

ভয়ে ভয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু না, বিস্ময়ের ঘোরটা তাঁর কেটে যেতেই তিনি হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে বসালেন আমাদের।

আমি মন ঠিক করেই এসেছিলাম, বললাম; আমার অন্যায় হয়ে গিয়েছে ঠাকুরমশায়। তাই মাফ চাইতে এলাম।

শুনেই একটা যেন ছায়া নেমে এল শম্ভুজীর মুখের উপর। ঈষৎ গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন, আমি মার্জনা করবার কে? তবে যিনি করতে পারেন তিনি সত্যই দয়াময়।

কিন্তু পরক্ষণেই হেসে ফেললেন শম্ভুজী। আমার মুখের দিকে চেয়ে এবার যেন সকৌতুক কণ্ঠেই তিনি বললেন, তোমাদের মত যাত্রীই তো আসে বেশী আজকাল। কিন্তু আমি ভাবি যে মাছ, জল, পাথর, পর্বত ও বরফ ছাড়া আর কিছু দেখবার চোখ যদি না থাকে তবে এই উত্তরাখণ্ডে আস কেন তোমরা? মুসৌরী-সিমলা গেলেই পার। তোমাদের ঘরের কাছেই দার্জিলিং তো শুনেছি আরও মনোরম।

তর্ক করব না তাও মনে মনে ঠিক করে এসেছিলাম; সুতরাং বললাম: যে চোখ নেই তার জন্য দুঃখ করে আর কি লাভ হবে! তবে বুঝতে পারছি যে কেদারে একজন পাণ্ডার দরকার হবে আমাদের, অথচ কোন পুরুষানুক্রমিক

পাণ্ডা আমাদের নেই। তাই আপনাকে অনুরোধ করতে এলাম। আমাদের তীর্থ-গুরু হবেন আপনি?

শুনে ওষ্ঠপ্রান্তের হাসি সারা মুখে যেন ছড়িয়ে পড়ল শম্ভুজীর। মনে হল যেন বেশ কোমলও হয়েছে তাঁর চোখের দৃষ্টি। সেই দৃষ্টি আমার মুখের উপর বিন্যস্ত করে তিনি বললেন, ঈশ্বর তা হলে এরই মধ্যে সুমতি দিয়েছেন তোমাদের। ভাল ভাল। কিন্তু বাবুজী, আমি তো কেদারের পাণ্ডা নই!

তবে?

আমি বদরীনারায়ণের পাণ্ডা। শ্রীকেদারনাথে তীর্থকৃত্য করাবার অধিকার আমার নেই। তবে বদরীবিশাল পর্যন্ত যদি তোমরা যাও সেখানে ক্রিয়াকর্ম করাতে পারি আমি।

এ সব আগে জানতাম না। একই উত্তরাখণ্ডে এই দুই প্রসিদ্ধ তীর্থ যেন দুই জমিদারী। স্বতন্ত্রই কেবল নয়, প্রতিদ্বন্দ্বীও। দুই দেবতাও নাকি তাই। স্থানীয় কিংবদন্তী বলে যে, শ্রীকেদারনাথ আগে বদরীপুরীতেই বাস করতেন। বদরীনারায়ণ ছলক্রমে তাঁর মন্দির দখল করে কেদারেশ্বরকে দশ মাইল দূরবর্তী কেদারনাথ পর্বতে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেন। হয়তো এ কাহিনী সেই বহু-পুরাতন শৈব ও বৈষ্ণবের প্রতিদ্বন্দ্বিতারই আখ্যায়িকারূপ। বর্তমান সেবায়েতদের মধ্যে অতীতের সেই তীব্র রেষারেষি না থাকলেও ক্ষেত্রবিভাগের ফলে পার্থক্য কঠিন ও দুরপনেয় হয়েছে। একের অধিকারে অপরে হস্তক্ষেপ করে না; কেদারের পাণ্ডা বদরীতে এবং বদরীর পাণ্ডা কেদারে কোন যাজনিক ক্রিয়া সম্পাদন করে না।

কিছু কিছু শুনলাম শম্ভুজীর মুখে। দেবপ্রয়াগ প্রধানতঃ বদরীনারায়ণের পাণ্ডাদের বাসস্থান। কেদারের পাণ্ডার সন্ধান আমরা পাব গুপ্তকাশীতে।

কেদার থেকে তুঙ্গনাথের পথে আমরা বদরীবিশাল যাব শুনে শম্ভুজী মনে মনে খানিকটা গণনা করে বললেন, তবে পথেও তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যেতে পারে।

মণ্ডলচটি ও গোপেশ্বরের মাঝামাঝি একটা জায়গার নাম করলেন তিনি।

ওখানেই আপনার বাড়ি বুঝি?—জিতেন ফস করে জিজ্ঞাসা করল।

যেন চমকে উঠলেন শম্ভুজী: কার কাছে শুনলে?

জিতেনের গায়ে একটি চিমটি কেটে তাকে সতর্ক করে দিয়ে তার হয়ে আমিই উত্তর দিলাম, ঘাটেই কে একজন ওই রকম কি যেন বলছিল।

আর কি বলছিল সে?

শম্ভুজীর তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির সামনে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেলাম আমি। তবে আমার উত্তরের জন্য পীড়াপীড়ি করলেন না তিনি। কিছুক্ষণ পর অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে তিনি নিজেই আবার বললেন, সব কথা বিশ্বাস করো না বাবুজী। একেবারে না মানা যেমন দোষ, অতি বেশী মানাও তেমনি।

একটু থেমে আবার: কেবল ব্রহ্মশাপে কি কিছু হয়? মানুষ ভোগ করে যার যার নিজের কর্মফল। ব্রাহ্মণ যদি বাক্‌সিদ্ধও হয় তা হলেও নিমিত্ত ছাড়া বেশী কিছু হতে পারে না সে।

॥ ৫ ॥

ধর্মশালা দেবপ্রয়াগের বাস-স্টেশন থেকে কতদূর? নিরর্থক প্রশ্ন ওটি। গজের হিসাবে পার্বত্য পথের দূরত্ব মাপবার কোন অর্থই হয় না। সমতল ভূমিতে যে ব্যক্তি হয়তো দশ মাইল পথ হেসে-খেলে হেঁটে যায়, মাত্র একটি মাইল চড়াই ভাঙতে জিভ বেরিয়ে যাবে তার। উতরাই বেয়ে নামাও তথৈবচ। অথচ পার্বত্য পথ মানে চড়াই ও উতরাই দুই-ই—দিনের পেছনে যেমন রাত্রি।

এ রকম পথের স্বাদ প্রথম পেলাম দেবপ্রয়াগে। সমতল বলতে ওখানে কেবল ভাগীরথীর উপরকার পুলটুকু। তার পরেই চড়াই শুরু হয়েছে। হরিদ্বারেই গোড়ায় লোহার বল্লম-আঁটা দীর্ঘ শক্ত লাঠি কিনেছিলাম। তা এখন কাজে লাগল।

হাঁফ ধরল খানিকটা চলবার পরেই। পাও যেন আর চলে না। মিনিট দশেক পর সমতলের মত একটু জায়গা পেয়েই থেমে গেলাম আমি, ডেকে থামালাম জিতেনকেও। আমাদের কুলি বীর বাহাদুর পিছনে আসছে জানতাম। ফিরে তার দিকে তাকাতেই চোখ দুটি যেন নিশ্চল হয়ে গেল।

মানুষের স্বাভাবিক আকার আর নেই বাহাদুরের। তার সম্পূর্ণ উর্ধ্বাঙ্গ কোমড়ের কাছে বেঁকে গিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়েছে। মাটি থেকে তার কোমর যতটা উঁচু প্রায় ততটাই উঁচু হবে তার পিঠের উপরকার বোঝা—আমাদেরই লটবহর। ছোট-বড় সব কটি গাঁটরি মোটা একটি দড়ি দিয়ে এক সঙ্গে বেঁধে সেটি তার নিজস্ব শিকার মত একটি আধারের মধ্যে পুরে হোল্ড-অলের হাতলের মত বাঁকা ফাঁসটা সে পরেছে তার নিজের মাথায়। অর্থাৎ ওই প্রায় দেড় মণ ওজনের মোটটির অবস্থিতি তার পিঠের উপর হলেও প্রায় সবটা ভারই ধারণ করে আছে তার ব্রহ্মরন্ধ্র। উপর দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাধ্যই নেই তার; আমাদের মত লাঠিও নেই তার হাতে। দুটি মাত্র পায়ের জোরে মন্থর গতিতে চড়াই ভেঙে ধুঁকতে ধুঁকতে এগিয়ে আসছে সে। দূর থেকেও দেখতে পেলাম আমি তার গাল-গলা ও ললাট থেকে টপ টপ করে বড় বড় ফোঁটায় ঘাম ঝরে পড়ছে।

ইস!—রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আমি বললাম, দেখেছ জিতেন?

সেও দেখছিল, বললে, হুঁ।

কিন্তু একটু পরে বেশ সহজ স্বরেই সে আবার বললে, তবে আপনি যা ভাবছেন তা নয়। ওর তেমন কষ্ট হয় না।

হয় না?

কেন হবে?—জিতেন উত্তর দিল একটু যেন উদ্ধত স্বরেই: যার যা অভ্যাস। কলকাতার পথে ঘোষ দেখেন না?

শুনে রাগ হল আমার। তার মুখের দিকে চেয়ে বললাম, ছিঃ!

কিন্তু জিতেন বেপরোয়া; হাসতে হাসতেই সে বললে, বড্ড সেন্টিমেন্টাল আপনি। এর পর কোন্ দিন হয়তো জলে মাছ দেখে বলবেন—আহা, বড্ড শীত লাগছে ওদের।

বাহাদুর ততক্ষণে কাছে এসে গিয়েছে। আমাদের উদ্দেশে সে বললে, চলিয়ে বাবুজী, সীধা রাস্তা।

কিন্তু আমি তাকে বললাম বোঝাটা নামিয়ে একটু বিশ্রাম করে নিতে। নামাতে সাহায্য করবার জন্যে হাত বাড়িয়ে তার দিকে এগিয়েও গিয়েছিলাম আমি, কিন্তু 'নহী' 'নহী' বলে একটু দূরে সরে গেল সে। তারপর পথের ধারেই একটি দোকানের উঁচু বারান্দার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অপূর্ব কৌশলে ও আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পিঠের বোঝা ওই বারান্দার উপর নামিয়ে রেখে সে সহজ ভঙ্গিতে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

আমি একটি বিড়ি দিলাম তাকে; তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, এত ভারী বোঝা নিয়ে এ রকম পথে চলতে কষ্ট হচ্ছে না তোমার?

তার চোখে দেখি বিস্মিত দৃষ্টি। তাচ্ছিল্যের স্বরে উত্তর দিল সে: কষ্ট কেন হবে, বাবুজী? এ আর কি বোঝা! পুরো দু মণ মোট নিয়েও তো কতবার আমি কেদারের বিকট চড়াই ভেঙেছি—কোন কষ্টই হয় নি।

শেষের দিকে গর্বিত কণ্ঠস্বর তার; হাসি ছড়িয়ে আছে তার মুখের সর্বত্র।

জিতেনের দিকে তাকিয়ে দেখি যেন বিজয়ী বীরের গর্বিত দৃপ্ত ভঙ্গি তার মুখে, চোখে দুষ্টুমির হাসি চিকচিক করছে। আমি তার দিকে তাকাতেই সে বলে উঠল, শুনলেন তো?

দ্বিতীয়বার আমার রাগ হয়েছিল তখন। কিন্তু যথাসময়ে হোটেলে খেতে গিয়ে সব ক্ষোভ মিটে গেল। জিতেনই সব ব্যবস্থা করেছে। খেতে বসে দেখি বাহাদুরও আমাদের সঙ্গেই বসল।

শুখা কুলি সে; তাকে খেতে দেওয়ার কথা নয় আমাদের। সেই কথা

ম—৪
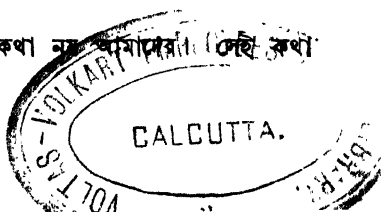
মনে করেই বিস্মিত চোখে জিতেনের মুখের দিকে চেয়েছিলাম। বুঝতে পেরে সে বললে, এক যাত্রায় আবার পৃথক ফল কেন হবে? কদিনেরই বা ব্যাপার! আমরা যা খাই, এ কদিন আমাদের সঙ্গে বাহাদুরও তাই খাবে।

পথের খবর জিজ্ঞাসা করেছিলাম বাহাদুরকে। সে বললে যে শ্রীনগরে অন্ততঃ একটি দিন থাকা উচিত। আমি শুনেছিলাম রুদ্রপ্রয়াগের খ্যাতি কিন্তু বাহাদুর মোটে আমলই দেয় না—দেবপ্রয়াগ যা, রুদ্রপ্রয়াগও তাই—সেখানে আবার সময় নষ্ট করা কেন!

শ্রীনগরে কি আছে?

অনেক বাড়িঘর, দোকানপাট, থানা, আদালত, হাসপাতাল, স্কুল সব আছে সেখানে। চড়াই উতরাই একেবারে নেই। অনেক দূর পর্যন্ত কেবলই ময়দান।

সমতলের অধিবাসীর কাছে লোভনীয় নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু বাহাদুরের আগ্রহ প্রবল। সে বার বার বলছে আগামী কাল ওখানে থাকতে।

এ কথা হয়েছিল রাত্রে, জিতেন তখন ঘরে ছিল না। তার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাকাপাকি কিছুই ঠিক করা যায় না—তাই বলেছিলাম বাহাদুরকে।

খাওয়ার পর বাকি দিনটা কেটেছে পথে পথে—দেখবার আগ্রহে ততটা নয় যতটা বাধ্য হয়ে। মাছির যন্ত্রণায় পাঁচটি মিনিটও দু চোখের পাতা এক করতে পারি নি। সেই জন্যই পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা।

ততক্ষণে প্রথম দর্শনের মোহ কেটে গিয়েছে। দেবপ্রয়াগকে আর অসাধারণ মনে হল না। পাহাড়ের কোলে বলেই গঠনের যা বৈচিত্র্য। আর যা আকর্ষণ তা ওই দুটি তরঙ্গিণীর। নতুবা বড় একটি গ্রাম। পথ বল, রাজপথ বল, তা ওই একটি—ভাগীরথীর উপরকার পুল যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে শুরু হয়ে অলকনন্দার পুলের উপর দিয়ে ওপারে সেকালের পায়দল মার্গ, মানে হাঁটা-পথের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। দু পারেই দোকানপসার আছে। হরিদ্বার-ঋষিকেশে যা যা পাওয়া যায় এখানেও তাই। সভ্যতার বহির্ভূত এলাকা মোটেই নয়। ডাকঘর, তারঘর, হাসপাতাল, বিদ্যালয়, সবই আছে। আর আছে জলের কল। কোন কোনটির কাছে লেখা আছে—যহ্ পানী পটাসসে সুরক্ষিত কিয়া গয়া হ্যায়।

তাক লাগাবার মত দৃশ্য বা ব্যবস্থা মাত্র দুটি। দুধের সাধ ঘোলে মিটিয়েছে দেবপ্রয়াগের স্থানীয় পঞ্চায়েত। বাজারের প্রান্তে অলকনন্দার পারে

রাজপথের ধারে দেখলাম টেনিসকোর্টের মত সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো লম্বায়-চওড়ায় হাত-দশেক মোটে জায়গা রেলিঙ দিয়ে ঘিরে স্বতন্ত্র করা হয়েছে। ভিতরে পাথরের বেঞ্চি খানকয়েক। একটিও গাছ নেই, এক চাপড়া ঘাস নেই—তথাপি ওরই নাম পার্ক। খেলছে দেখলাম কয়েকটি ছেলেমেয়ে; বড়রাও এসে বসেছে দু-একজন।

আর আছে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য সাধারণ শৌচাগার। দেয়ালে দেয়ালে লিখিত নির্দেশ রয়েছে যে, নির্দিষ্ট শৌচাগার ছাড়া অন্যত্র কেউ যেন প্রকৃতির ডাকে সাড়া না দেয়।

কিন্তু কি যে কঠিন সে নির্দেশ মেনে চলা তা এক বেলাতেই হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। আমাদের বাসা থেকে সবচেয়ে কাছের শৌচাগারটির দূরত্বও অন্ততঃ এক ফার্লং। তার আবার প্রায় অর্ধেকটা উতরাই। ঘর থেকে এক ঘটি জল যদি বয়েও নিয়ে যাই তা হলেও হাতমুখ ভাল করে ধোবার জন্য শৌচাগার থেকে কমপক্ষে ত্রিশটি সিঁড়ি ভেঙে নীচে অলকনন্দার ঘাটে যেতে হবে। বলা বাহুল্য যে ততটাই উপরে উঠতে হবে আবার এবং নীচে নামার চেয়ে উপরে ওঠা ঢের বেশী শ্রমসাধ্য।

আসল জল-কষ্ট কাকে বলে, তা ঠিক ঠিক বুঝলাম ওই দুর্গম পথে দু-চারবার ওঠানামা করবার পর। বুঝলাম কেন এখানকার প্রতিটি হোটেল, প্রতিটি খাবারের দোকান ও তার পরিবেশ অত বেশী নোংরা। জলের কল করে দিয়ে সরকার কেবল যাত্রীদের নয়, স্থানীয় জনসাধারণেরও অসীম উপকার করেছেন। কিন্তু এক ধর্মশালা ছাড়া আর কোন বাড়ির প্রাঙ্গণেই কল নেই। রাস্তার কলও এত দূরে দূরে যে তার সুযোগ খুব বেশী সংখ্যক গৃহস্থ পায় না। তা ছাড়া কলের জলের ব্যবহার প্রধানতঃ পানীয় হিসাবে। অন্যান্য প্রয়োজনে সকলকেই নামতে হয়—হয় ভাগীরথী, নয় অলকনন্দার গভীর গর্ভে।

সেই টেনিসকোর্টের মত খেলনাপার্কে বসে অনেক নীচে অলকনন্দার ফেনোচ্ছল আবর্তসঙ্কুল জলের কাছে দেখেছি স্থানীয় মহিলাদের ভিড়। দেখেছি জলভরা ঘড়া মাথায় নিয়ে একটির পর একটি সিঁড়ি ভেঙে তাদের উপরে ওঠা। কারও কারও মাথার উপর উপর্যুপরি দুটি তিনটিও ঘড়া, আবার কাঁখে হয়তো শিশুও। প্রধান সড়ক পর্যন্ত উঠেই নিস্তার নেই; তারপরেও চড়াই ভেঙে উঠে যাচ্ছেন তাঁরা যাঁর যাঁর বাড়িতে—পাঁচতলা ছতলা সমান উঁচুতে।

অন্যমনস্ক হয়েছিলাম। কোন্ ফাঁকে জিতেন যে সরে পড়েছে তা বুঝতেই পারি নি। সন্ধ্যার পর ধর্মশালায় ফিরে গিয়ে দেখি যে সেখানেও সে নেই। বাহাদুরের মুখে রুদ্রপ্রয়াগ ও শ্রীনগরের তুলনামূলক বর্ণনা শুনে কিছুটা সময় কাটল। কিন্তু তারপর? জিতেনের জন্য উদ্বিগ্ন না হয়ে পারলাম না।

রাত আটটা খুব বেশী অবশ্য নয়। কিন্তু বারান্দায় এসে মনটা আরও দমে গেল। নীচের দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেটি কৃষ্ণপক্ষ। তার উপর চারিদিকেই আকাশচুম্বী পাহাড়। সুতরাং অন্ধকার আরও নিবিড়, আরও ভয়াবহ। মনুষ্য-কণ্ঠ কানে আসে না। শুনতে পাচ্ছি কেবল অলকনন্দার ভৈরব-গর্জন। হঠাৎ বুকটা কেঁপে উঠল আমার—ছেলেটা ডুবে মরল না তো! মনে পড়ে গেল একবার সে বলেছিল যে, অলকনন্দার জলের গভীরতা কত তা জানা দরকার।

বাহাদুরের মুখের দিকে চেয়ে বললাম, চল, টর্চটা নিয়ে একটু খুঁজে দেখি।

ভাগ্য ভাল, তার প্রয়োজন হল না। আমরা বেরুবার পূর্বেই জিতেন ঘরে এসে প্রবেশ করল।

কোথায় গিয়েছিলেন, বাবুজী?—বাহাদুরই প্রথমে জিজ্ঞাসা করল তাকে।

প্রশ্নের উত্তর দিল না জিতেন। পা ছড়িয়ে বসে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে আমার মুখের দিকে চেয়ে ক্ষুব্ধকণ্ঠে সে বললে, অনেক ঘুরলাম মণিদা, কিন্তু দেখা পেলাম না। যা শুনলাম তাতে মনে হল যে বিকেলেই তারা চলে গিয়েছে।

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কার কথা বলছ?

সেই গঙ্গোত্রী আর তার মায়ের কথা।

এরূপ একটা সম্ভাবনা কল্পনাও করি নি আমি; সুতরাং রুদ্ধ নিশ্বাসে বললাম, তাদের খোঁজ করতে গিয়েছিলে তুমি? কেন?

বিরক্ত হয়েই উত্তর দিল জিতেন, বা রে! খোঁজ করতে হয় না একবার।

আবার জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, কেন? কিন্তু মোমবাতির মৃদু আলোকে জিতেনের মুখের অবস্থা লক্ষ্য করে প্রশ্ন আর করা হল না হেসেই বললাম, ধন্য তুমি! কিন্তু আমায় বললে না কেন? বললে দুজনে এক সঙ্গেই খুঁজতে যেতাম।

হ্যাঁ, সেই লোকই আপনি!

অপ্রসন্ন কণ্ঠস্বর জিতেনের; একটু যেন ঝাঁজও আছে তাতে। একটু থেমে সে আবার বললে, ঋষিকেশ ছাড়বার পর একটি বারও তাদের কথা মুখে এনেছেন আপনি?

অভিযোগ সত্য; সত্যিই তাদের কথা আর মনে ওঠে নি আমার। এতক্ষণ পর সেজন্য নিজেকে একটু যেন অপরাধীই মনে হল।

চুপ করেই ছিলাম, কিন্তু বাহাদুর আমাদের দুজনকেই আশ্বাস দিয়ে বললে যে, পথে আবার দেখা হবেই—অন্ততঃ কেদার থেকে তাঁরা যখন ফিরবেন তখন নিশ্চয়ই।

একটি মাত্র তো পথ। এ পথের সাথী হারিয়ে যাবে কোথায়?

শ্রীনগরে থাকবার ইচ্ছা ছিল না জিতেনের। কিন্তু ওখানে বাস বদল করতে হয়। নেমে শুনি যে পরবর্তী বাস পাওয়া যাবে দু ঘণ্টার পর। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, আকাশের অবস্থা দেখে মনে হয় শীঘ্রই চেপে জল আসবে। ওই আবহাওয়াতে চারিদিক খোলা একটি চালাঘরের মধ্যে তীর্থের কাকের মত বসে থাকার চেয়ে সে দিনটা পাকাপাকি ভাবে ওখানে থেকে যাওয়াই যে ভাল সে কথা বাহাদুর আর একবার বলতেই রাজী হয়ে গেল জিতেন।

ধর্মশালার খোঁজ করছিলাম বাহাদুরের কাছে। শুনেই কিন্তু বুড়ো মতন একটি লোক এগিয়ে এসে সেলাম করে বললে, ডাকবাংলোও আছে হুজুর।

শুনেই আমার শহুরে মন উন্মুখ হয়ে উঠল। হৃষ্টচিত্তে অনুসরণ করলাম লোকটির।

আশা মিটল তা বলতে পারি নে। আরাম যা তা কেবল আসবাবপত্রের। আর সবই অস্বস্তিকর। সাহেবী রুচির বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। শোবার ঘর অন্ধকার—মানে দরজা আর ছাদ ফুটো করা ঘুলঘুলি ছাড়া আলো-হাওয়া প্রবেশের অন্য পথ নেই। স্নানের ঘর আরও বেশী অন্ধকার এবং ওর মধ্যে সেই পরিচিত ভাপসা দুর্গন্ধ। এই শৈলবাসের নির্মল বায়ু ও মুক্ত পরিবেশের সঙ্গে একেবারে বেমানান। স্নান করেও তৃপ্তি হল না। দুজনের জন্য গুণে দু বালতি জল—তাও আবার সবটা ভরা নয়। খাওয়ার জন্য বৃষ্টিতে ভিজে এক ফার্লং দূরে হোটেলে যেতে হল। খাদ্য নিরামিষ।

একমাত্র লাভ দিবানিদ্রা সম্পূর্ণ নির্বিঘ্ন। জানলা নেই এবং দরজা

ঘন চিক ফেলে সব সময়েই সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে বলেই বুঝি বাইরে মাছির প্রাচুর্য থাকলেও ঘরের মধ্যে তারা প্রবেশ করতে পারে না।

বৃষ্টি যখন থামল তখন ঘড়িতে দেখি পাঁচটা। বাহাদুর খাওয়ার পর হোটেল থেকেই সেই যে অদৃশ্য হয়েছিল তারপর আর ফিরে আসে নি। সুতরাং ঘরে তালা দিয়ে আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। প্রকৃতি দরাজ হাতে ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন। বৃষ্টিই কেবল থামে নি, রোদও উঠেছে। বর্ষণ-স্নিগ্ধ পরিচ্ছন্ন সবুজ চারিদিকেই ঝলমল করছে দেখা গেল।

তবে ওই পর্যন্তই। দ্রষ্টব্য আর কিছুই নেই। পাহাড় অনেক দূরে, অলকনন্দাও চোখে পড়ে না। ঘরবাড়ি বা গাছ যা আছে তার কোনটাই চমক লাগাবার মত নয়।

তবে চমক লাগল শেষ পর্যন্ত। ওই আমাদের বাহাদুর না!

বাস-সড়ক থেকে খানিকটা উঁচুতে শ্লেট পাথরের চালের নীচে পাশাপাশি কয়েকখানি নীচু কুটির। তারই একখানার সামনে জন-পাঁচেক লোক গোল হয়ে বসেছে। স্ত্রীলোক দুজন। একজন মনে হল প্রৌঢ়া। পুরুষদের মধ্যে একজন নিঃসংশয়ে আমাদের বীর বাহাদুর।

জিতেন তাকে চিনতে পেরেই হুঙ্কার দিয়ে উঠল: এই বাহাদুর, কি করছ তুমি এখানে?

মুহূর্তের জন্য একটু যেন অপ্রস্তুত ভাব দেখলাম বাহাদুরের মুখে। কিন্তু পরক্ষণেই প্রায় লাফ দিয়েই সে পথে নেমে এল। উঠে দাঁড়াল মজলিসের বাকি কজন লোকও—কেবল অল্পবয়সী মেয়েটি ছাড়া। কৌতূহলী চোখ মেলে চেয়ে রইল সে।

ততক্ষণে হাসি ছড়িয়ে পড়েছে বাহাদুরের সারা মুখে। সে বিশেষ করে আমার উদ্দেশেই একটি সেলাম ঠুকে পরে বললে, এরা আমার দেশের লোক, বাবুজী। এখানে কোম্পানির কুলি খাটে।

তাদের দিকে চেয়ে সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আবার বললে, ইন বাবুজীয়োকে সাথ হম আয়া হ্যায়। লেকিন আপতো মেরা যাত্রী নহী হ্যায়, হ্যায় মেরে মাতাপিতা।

তারাও এগিয়ে এসে সেলাম করল আমাদের। বয়স যার সবচেয়ে বেশী সে আমাকে উদ্দেশ করে বিনীত ভাবে বললে, গরীবের ঘরে দয়া করে যখন পায়ের ধুলো দিয়েছেন তখন দু মিনিট বসুন।

অপ্রস্তুত বোধ করছিলাম। কিন্তু অগ্রাহ্য করতে পারলাম না ওই আমন্ত্রণ। ঘর থেকে একখানি কম্বল এনে পরিপাটি করে পেতে দিল সেই প্রৌঢ় লোকটি। এক একটি করে বিড়ি এগিয়ে দিল আমাদের দিকে। সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করল আমরা চা ইচ্ছা করি কি না।

চা চাই না বললাম। কিন্তু অত সমাদর করে যারা আমাদের বসিয়েছে তাদের কাছ থেকে তখনই উঠে আসি কেমন করে! ওদের কাজকর্ম সম্বন্ধেই কথা তুললাম। উত্তর পেলাম। কিছু জ্ঞানও লাভ করলাম বইকি! বাস থেকে দোকান পর্যন্ত মোট বয়ে দেয় ওরা। কাজ থাকলে দৈনিক দু টাকাও আয় হতে পারে, না থাকলে কিছুই না।

ডাকবাংলোতে ফেরবার জন্য যখন উঠে দাঁড়িয়েছি তখন কর্তার গৃহিণী, মানে সেই প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি আমাকে উদ্দেশ করে বললে, তুমি তো ভাল মানুষ আছ শেঠজী। বীর বাহাদুরকে এবার কিছু বেশী টাকা দিয়ো তো। বড় মেয়ে আর কতদিন আমি ঘরে পুষব।

কথাটার অর্থবোধ হয় নি আমার, মূঢ়ের মত জিজ্ঞাসা করলাম, কি বলছ তুমি? কোন্ মেয়ে?

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল প্রৌঢ়া সেই দ্বিতীয় মেয়েটিকে। মুখে বললে, ওই তো আমার মেয়ে রুক্মিণী।

তথাপি বিহ্বল ভাব আমার, কিন্তু জিতেন সহসা হাসিতে ফেটে পড়বার মত হয়ে বলে উঠল, বাহাদুরের বউ নাকি তোমার মেয়ে?

সজীব কল্পনা জিতেনের, কিন্তু বড় বেশী এগিয়ে গিয়েছিল তা। পরক্ষণেই দেখি দাঁতে জিভ কেটেছে প্রৌঢ়া, বাহাদুরও। প্রৌঢ়া সসঙ্কোচে উত্তর দিল, না বাবুজী, বিয়ে হবে ঠিক হয়ে আছে। কিন্তু হচ্ছে কই? বীর বাহাদুরের যে টাকা নেই।

এতক্ষণে কিছুটা অর্থবোধ হল আমার। সচকিতে বাহাদুরের দিকে তাকিয়ে দেখি যে, তার লজ্জিত হাসিমুখ সে আমার সপ্রশ্ন দৃষ্টি থেকে লুকোবার জন্য একেবারে ফিরে দাঁড়িয়েছে।

ফিরে তাকালাম ওদের ওই রুক্মিণীর দিকে। নেপালী মেয়ের সাধারণ গোলগাল মুখ। কিন্তু যৌবনের জোয়ার ও অটুট স্বাস্থ্যশ্রীর মণিকাঞ্চন সংযোগ হয়েছে সে মুখে। তার উপর আবার প্রকৃতির ষড়যন্ত্র। রুক্মিণীর মুখের উপর এসে পড়েছে খানিকটা গোধূলির আলো।

একেই কনে দেখা আলো বলে নাকি !

মেয়েটিও দেখি মিটিমিটি হাসছে।

ফিরে প্রৌঢ়ার দিকে তাকাতেই সে আবার বললে, তোমার মেয়ে হলে কি করতে বাবুজী ? বিয়ে না দিলে মুখে ভাত রুচত তোমার ?

কি উত্তর দেব ! মুখ ফিরিয়ে পথে নেমে পড়লাম।

চলতে চলতে জিতেন বললে, হারামজাদার মতলবটা এবার বুঝেছেন তো মণিদা ? এই জন্যই শ্রীনগর এত ভাল জায়গা।

বুঝেছি আমিও। কিন্তু বাহাদুরের উপর রাগ হল না। ততক্ষণে বেশ মিষ্টি একটি রসের স্বাদ পেয়েছে আমার মন। তা চেখে চেখে খাবার লোভ তার। ডাকবাংলোতে ফেরবার পর বাহাদুরকে কাছে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, মেয়েটিকে তোমার খুব পছন্দ নাকি বাহাদুর ?

বাহাদুর নীরব। কিন্তু ওকেই তো শাস্ত্রকারেরা বলেছেন সম্মতির লক্ষণ। সুতরাং আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, তা ওকে তুমি বিয়ে করছ না কেন ?

শেষ পর্যন্ত বাহাদুর যে উত্তর দিল তার সুর ও সার দুই-ই আমার অপ্রত্যাশিত।

পণের টাকার জন্যই যে বিয়ে আটকাচ্ছে তা নয়। আটকাচ্ছে ঋণের দায়ে, আর তা বাহাদুরের পৈতৃক ঋণ। অনেক বছর আগে বাহাদুরের পিতা দেশের কোন এক মহাজনের কাছ থেকে কি যেন কারণে পাঁচশো টাকা ধার নিয়েছিল। বালক বীর বাহাদুর জানতও না সে ঋণের কথা। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর সেই ঋণের বোঝা একমাত্র পুত্র বাহাদুরের ঘাড়ে এসে চেপেছে। তীর্থযাত্রীর মোট বয়ে এবং অন্যান্য উপায়ে যা বাহাদুর উপার্জন করে তার প্রায় অধিকাংশই গত পাঁচ-ছয় বৎসর যাবৎ সে সেই মহাজনকে দিয়ে আসছে। বৎসরে একবার—যখন এদিকে কাজ একেবারেই পাওয়া যায় না তখন—সঞ্চিত সব টাকা সঙ্গে নিয়ে দেশে যায় বাহাদুর। গিয়ে মহাজনের গদিতে গেঁজে.উজাড় করে সব ঢেলে দেয়। বারকয়েক গোনবার পর মহাজন সব টাকাই তার লোহার সিন্দুকে তুলে রাখে। তারপর একটি খেরো-বাঁধানো খাতায় কি যেন লিখে বাহাদুরের বাঁ হাতটি টেনে নিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ নেয় সেই পাতার একটি জায়গায়। এ সব হয়ে গেলে হাসিমুখে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে মহাজন তাকে বলে আরও টাকা নিয়ে আসতে। দু-একটি বিড়িও দেয় তার হাতে, কখনও বা দুটি লাড্ডু ও এক গ্লাস জলও। কৃতার্থ হয়ে তার

পৈতৃক ভাঙা বাড়িতে ফিরে যায় বাহাদুর। পরদিন আবার হরিদ্বারের পথে যাত্রা করে সে।

এমনি চলছে বৎসরের পর বৎসর। বাহাদুরের উপার্জিত অর্থ কিছুই থাকছে না তার হাতে, কিন্তু তার পৈতৃক ঋণ তখন পর্যন্তও পরিশোধ হয় নি।

উপসংহারে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে বাহাদুর বললে, দুসরেকা মাতাপিতা অপনা লড়কাকো কিতনা কুছ দেতা হৈ। লেকিন মেরা মাতাপিতা তো হমকো গড্ডামে গিড়া দিয়া।

ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝলাম—এও সেই চক্রবৃদ্ধি হারে ঋণের আয়তন-স্ফীতির বহু পুরাতন কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। রাগ হল মহাজনের প্রতি। কিন্তু তখন তাকে পাব কোথায়? যাকে কাছে পেয়েছি গায়ের ঝাল ঝাড়বার জন্য সেই বাহাদুরকেই প্রচণ্ড একটি ধমক দিয়ে কড়া স্বরে বললাম, ওরে মুখ্যু, তুই বছর বছর তাকে টাকা দিতে যাস কেন? এখান থেকে চিঠি লিখে দে তোর মহাজনকে যে আর একটি পয়সাও তাকে তুই দিবি নে।

কিন্তু বাহাদুরের মধ্যে প্রতিক্রিয়া যা দেখলাম তা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। দুই হাতেরই তর্জনী দুই কর্ণরন্ধ্রে ঢুকিয়ে ইঞ্চিখানেক জিভ বের করে তা দাঁতে কাটল বাহাদুর।

কি হল রে!—সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

উত্তর হল: সো ক্যায়সে হো সকতা বাবুজী? তব তো মেরে পিতাজীকা আত্মা নরকমে জলতে রহেগা।

আর কোন কথা বলতে পারলাম না বাহাদুরকে। নীরবে ঘর ছেড়ে বারান্দায় চলে গেলাম। জিতেনও দেখি আমার পিছনে পিছনে এসেছে। একটি বিড়ি ধরিয়ে বারকয়েক টানবার পর তার মুখের দিকে চেয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, শুনলে তো জিতেন?

জিতেন উত্তর দিল, হুঁ।

জলন্ত বিড়িটি উঠনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমি বললাম, এখনও ভারবাহী পশু মনে হয় নাকি বাহাদুরকে?

উত্তর না দিয়েই উঠনে নেমে গেল জিতেন।

॥ ৬ ॥

রুদ্রপ্রয়াগের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা রুদ্রনাথ। আমায় টেনেছিলেন তিনি। কিন্তু জিতেন অধৈর্য হয়ে উঠেছে। বাস কোম্পানির সময়-তালিকাও দেখি তারই অনুকূলে। রুদ্রপ্রয়াগে আবার বাস বদল করতে হয়। নেমেই শুনি যে আধঘণ্টা পরেই অগস্ত্যমুনির বাস ছাড়বে। শুনেই গোঁ ধরল জিতেন যে ওই গাড়িতেই যেতে হবে।

সুতরাং দূর থেকেই রুদ্রনাথ ও প্রয়াগ তীর্থকে প্রণাম করে বাহাদুরের পিছনে পিছনে মন্দাকিনীর উপরকার পুল পার হয়ে চললাম ওপারের বাস-স্টেশনের দিকে। মন্দাকিনীর উপত্যকা বা শ্রীকেদারেশ্বরের রাজ্য শুরু হল এবার।

শেষ গাড়ির টিকিটের জন্য কাড়াকাড়ি লেগে গিয়েছে তখন। দূর থেকেই দেখি যে জিতেন টিকিট-ঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বেশ উত্তেজিতভাবে কার সঙ্গে যেন তর্ক করছে। উত্তেজিত দেখলাম কজন বাঙালী যাত্রীকেও। ছোট একটি দল হাত-মুখ নেড়ে পরস্পর পরস্পরকে কি যেন বলছে। দলের একটি মাত্র মহিলা একটু দূরে মুখচুন করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

আপনারাও এই গাড়িতেই যাচ্ছেন নাকি?—জিজ্ঞাসা করলাম দলটির কাছে এগিয়ে গিয়ে।

বিরস বদনে একজন উত্তর দিল, কই আর যেতে পারছি, মশায়! শেষ মুহূর্তে ছাতার ফরমাশ। তাই কিনতে দলের দুজন আবার ছুটে গেল ওপারে। এখান থেকে না কিনলে পথে আর কোথাও তো পাওয়া যাবে না!

বাসের পথ শেষ হয়ে আসছে, তারই ইঙ্গিত ওই কথায়। ভবিষ্যৎ বর্তমানের উপর ছায়া ফেলেছে। সামনের অপরিচিত পায়ে-চলা পথ সম্বন্ধে যত কৌতূহল মনে, আশঙ্কা তার চেয়ে অনেক বেশী। তাই বুঝি প্রস্তুতির মধ্যে যাতে কোন খুঁত না থাকে তার জন্য অত সতর্কতা দলের নেতাদের।

সুবুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির পরিচয় নিশ্চয়ই! ছাতা সঙ্গে আনতে আমারও অনিচ্ছা ছিল কলকাতায়। ভেবেছিলাম যে বর্ষাতি যখন নিয়েছি তখন আবার ছাতার বোঝা বওয়া কেন—বিশেষতঃ হাতে যখন লাঠি রাখতেই হবে।

কিন্তু আমার অভিজ্ঞ বন্ধু এক রকম জোর করেই ছাতা গছিয়ে দিয়েছিল আমাকে। উপকারই হয়েছে তাতে। অন্ততঃ রোদ থাকলে এ পথে ও জিনিসটি যে অপরিহার্য তা ইতিমধ্যেই মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছি। আমিও উপকার করবার উদ্দেশ্যেই নিজের অভিজ্ঞতাটুকু জানিয়ে দিলাম ওই দলটিকে। কিন্তু সেই ফাঁকে আমার নিজের মনের গোপন বাসনাটুকুও প্রকাশ হয়ে পড়ল বুঝি

বললাম, তা আজ যদি যাওয়া না-ই হয় তার জন্য অত ভাবনা কিসের? পথেই তো থাকা, না হয় দশ মাইল পিছনেই থাকলাম। আসুন, আপাততঃ চা খেয়ে মনটাকে ঠাণ্ডা এবং শরীরটাকে চাঙ্গা করে নেওয়া যাক।

কিন্তু চায়ের জন্য তেমন আগ্রহ নেই তাদের। কেবল একজনের সতৃষ্ণ দৃষ্টি দেখলাম পড়ে রয়েছে আমার কাঁধে ঝোলানো জলের বোতলটির উপর। তিনি সেই মহিলা। আমি সম্মতির প্রত্যাশায় পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়ে একাই যখন নীচে চায়ের দোকানের দিকে পা বাড়িয়েছি, তখন তিনি মুখ ফুটে বললেন, আপনার বোতলে ভাল জল যদি থাকে তবে তাই একটু দিন।

জলপান শেষ করে যে কৃতজ্ঞতা তিনি ভাষায় প্রকাশ করলেন তা জলের জন্য ততটা নয় যতটা ছাতার সমর্থনে আমার আচরণ ও সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাটুকুর জন্য।

বললেন তিনি: ভাগ্যিস সময়মত আপনি এসে পড়েছিলেন, তাই মুখরক্ষা হল আমার—ছাতার ফরমাশ আমিই করেছি কিনা। সেই থেকে রাগ করে উনি তো কথাই বলছেন না আমার সঙ্গে।

'উনি' মানে মহিলার স্বামী। তাকে যখন চিনতে পারলাম তাঁরও চোখে দেখি যেন কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি।

বেশ একটু আত্মতুষ্টির ভাব জেগে উঠেছিল মনে—পারিবারিক কলহের মত ব্যাপারটাতে অনাহূত সালিসী তা হলে মন্দ হয় নি আমার। কিন্তু পরমুহূর্তেই জিতেনের তাড়া খেয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল তা—গাড়ি নাকি তখনই ছাড়বে। চা-টুকুও আর খাওয়া হল না।

গাড়িতে বসবার পর এ যাত্রায় শেষবারের মত পরীক্ষা দিতে হল কলেরার টিকা নেওয়ার সার্টিফিকেট সরকারী জনস্বাস্থ্য বিভাগের স্থানীয় পরিদর্শককে দেখিয়ে। স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা চমৎকার করেছে উত্তর-প্রদেশের সরকার।

হরিদ্বারে থাকতেই শুনেছিলাম টিকার কড়াকড়ির কথা। ঋষিকেশে টিকিট-ঘরের কাছেই দেখি ছুঁচ পিচকিরি ও ওষুধ নিয়ে বসে আছেন সরকারী কর্মচারীরা। টিকা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই সার্টিফিকেট লিখে দিচ্ছেন তাঁরা। উত্তরাখণ্ডের যাত্রাপথে অপরিহার্য দলিল ওটি। বারেবারে বাস থামিয়ে পরীক্ষা হয় প্রত্যেকটি যাত্রীর। সার্টিফিকেট দেখাতে না পারলে তৎক্ষণাৎ ছুঁচ ফুটিয়ে দেবে আবার—তা আগে তুমি যত বারই টিকা নিয়ে থাক না কেন। কেউ যদি টিকা না নিতে চায় তা হলে যাওয়াও হবে না তার।

কেবল টিকা দেওয়ার ব্যাপারেই নয়, জনস্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে প্রত্যেকটি ব্যবস্থাই নিখুঁত মনে হল। যেখানেই যাই না কেন, দেখি যে দেয়ালে দেয়ালে বড় বড় অক্ষরে লিখিত নির্দেশ রয়েছে—কলের জল ছাড়া আর কোন জল পান করবে না, পচা বা বাসী খাবার খাবে না, রুগ্ন লোককে হাসপাতালে পাঠিয়ে পুণ্য অর্জন কর, ইত্যাদি ইত্যাদি। শূন্যগর্ভ উপদেশ মাত্র নয়। সারা পথেই জলের কল আছে দেখেছি, কৃতবিদ্য চিকিৎসকের পরিচালনাধীনে হাসপাতাল আছে বড় বড় চটিতে, প্রত্যেক "চট্টি চৌধুরী"র কাছে রাখা আছে "মামুলী বিমারীয়োকী দাওয়ায়ে" যার জন্য দাম দিতে হয় না। শৌচাগারের ব্যবস্থা সর্বাঙ্গসুন্দর। এত সতর্কতা ও এত রকমের ব্যবস্থা আছে বলেই প্রত্যহ হাজার হাজার যাত্রীরও চলাফেরা যখন থাকে তখনও কোন রোগই মহামারীর আকার ধারণ করতে পারে না। বোধ করি একেবারে বিনা চিকিৎসায় কোন রোগীকে মরতেও হয় না।

যাত্রীর কল্যাণে স্থানীয় জনসাধারণেরও চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে, অশিক্ষিত নরনারীরাও সচেতন হয়েছে তাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে।

ঘণ্টাখানেকের পথ। বৈকাল পাঁচটা নাগাদ অগস্ত্যমুনি পৌঁছে গেলাম। ড্রাইভারের পাশেই বসেছিলাম আমি। গাড়ি থামবার আগেই সে মাথাটা ঘুরিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললে, এবার হাঁটাপথ শুরু হল আপনাদের।

আসল বক্তব্য তার ওষ্ঠপ্রান্তের হাসিটুকুর মধ্যে, যার অর্থ: বোঝ এবার, আমি ও আমার বাস কি উপকার করেছ তোমাদের।

বাস থেকে নেমেই তাকালাম গাড়িখানার দিকে; তারপর দেখলাম গ্রামখানি ও তার পরিবেশ যতটা চোখে পড়ে। উপলব্ধি হল চক্ষের পলকেই—

দাঁড়িয়ে আছি সীমান্তরেখার উপর। যাকে আমরা সভ্যতা বলি তার একমাত্র নিদর্শন ওখানে ওই বাসখানি। তা ছাড়া চারিদিকে আদিম প্রকৃতি। মাঝে মানুষের বসতি যতটুকু চোখে পড়ে তা সেই প্রথম দৃষ্টিতে মনে হল যেন প্রস্তরযুগের ভগ্নাবশেষ।

শ্রীনগরের মতই এটিও একটি উপত্যকা, মোটামুটি সমতল। কিন্তু শ্রীনগরের সঙ্গে অগস্ত্যমুনির যা পার্থক্য তা একেবারে মৌলিক। শ্রীনগরে চোদ্দ আনাই মানুষের কীর্তি, কিন্তু অগস্ত্যমুনির পনরো আনাই প্রকৃতি। ডানদিকের পাহাড়ের উপর ঝাউবনটুকু বাদ দিলে সে প্রকৃতিও আবার উদাসিনী, বৃদ্ধা। সবই শ্রীহীন, রুক্ষ। ঘরবাড়ি কেবল আকারেই ছোট নয়, কোনটাতেই গঠনের পারিপাট্য নেই। বিবর্ণ পাথরের কদাকার এক একখানা কুটীর। চাল থেকে পাথরের টালি মনে হয় এই বুঝি খসে পড়ল। যেটুকু স্থায়ী মন্দিরগ্রাম এখানে তা কলকাতা বা হাওড়ার যে কোন বস্তিকেই বুঝি লজ্জা দিতে পারে।

দূরে কেবল পাহাড় আর পাহাড়—ডাইনে বাঁয়ে সামনে যত দূর চোখ যায়। না, চোখ মোটে চলেই না, এতই ঘন মনে হয় এখান থেকে ওই বিশাল পর্বতশ্রেণীর বিন্যাস। চোখের সামনে সমতলের এই রুক্ষতা অবশ্য তাতে নেই। নিবিড় অরণ্য বুঝি প্রত্যেকটি পাহাড়ের গায়ে ও মাথায়। তাকালে চোখ জুড়য় নিশ্চয়ই। কিন্তু ভয়ও করে। পিছন দিকে ফিরে তাকিয়েও দেখি ওই একই দৃশ্য। ফাঁকা যা তা এই নিজের কাছাকাছি জায়গাটুকুতেই। তারপরেই নিবিড় নীরন্ধ্র দুর্ভেদ্য প্রাচীর উঠেছে যেন আকাশ পর্যন্ত। মনে হয় যে ওকে অতিক্রম করে অগ্রসর হবার সাধ্যই নেই মানুষের। ফিরে তাকাই গাড়িখানার দিকে। ফিরে যাবার জন্য তৈরি করা হচ্ছে সেখানাকে। হঠাৎ ভয়ে বুক কেঁপে উঠল—এটি চলে গেলেই সভ্য জগতের সঙ্গে শেষ সম্পর্কও ছিন্ন হবে আমাদের। তার পর বুঝি হিমালয়ের কারাগারে আজীবন বন্দীদশা!

হঠাৎ মন্দাকিনী-ভাগীরথীর বিদ্রোহী-রূপ মনে পড়ে গেল। এই পাষাণকারার বিরুদ্ধেই তো তাদের বিদ্রোহ। সুগম্ভীর হিমালয়ের গভীর গর্ভে আদিঅন্তহীন নিথর প্রশান্তি ভাল লাগে নি বলেই তো লহরীর পর লহরী তুলে, আঘাতের পর আঘাত করে, পাষাণপ্রাচীর ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সমতলে যাবার পথ করে নিয়েছিল ওরা। সেই মুহূর্তে নিজের মনের মধ্যে অসহায় বন্দীত্বের ক্ষণিক অনুভূতি দিয়ে তিন দিন আগে দেবপ্রয়াগে দেখা

গঙ্গার বিপুল ফেনিল জলরাশির অবিরাম সরোষ গর্জনের কিছুটা অর্থ যেন বুঝতে পারলাম।

কিন্তু তাই যদি সত্য হয়, তা হলে সমতলের প্রাণী আমাদের এই বিপরীত গতি কেন? প্রাণধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করছি নাকি আমরা—এই সহস্র সহস্র কেদারবদরীর যাত্রীরা?

মহাতপা মহাতেজা ঋষি অগস্ত্যমুনি। তাঁরই নাকি সাধনক্ষেত্র এই স্থান। পুরাণে আছে যে, সমুদ্র শোষণ করেছিলেন তিনি। সে কি এই জায়গায়? হতেও পারে। পণ্ডিতেরাই তো বলেন যে, সম্পূর্ণ হিমালয় পর্বতমালাই এককালে সমুদ্রের গর্ভে ছিল। সে না হয় প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা। ঐতিহাসিক কালেই এ জায়গায় প্রকাণ্ড একটি হ্রদ ছিল বলে অন্য একদল পণ্ডিত রায় দিয়েছেন। যে জল এককালে ছিল কিন্তু এখন নেই, সে জল অগস্ত্যমুনি পান করে নিঃশেষ করেছেন মনে করলে দোষ কি?

দোষ না থাক্, ও কথা মেনে নিলে আর একটি সমস্যা ওঠে। যে অগস্ত্যমুনি সমুদ্র শোষণ করেছিলেন, শাস্ত্রমতে তিনিই আবার দাম্ভিক বিন্ধ্য-পর্বতের উঁচু মাথাটাকে চিরদিনের জন্য নীচু করে দিয়ে গিয়েছেন। তা নাকি তিনি করেছিলেন বিন্ধ্যপর্বত পার হয়ে অনার্য ও অ-সভ্য দাক্ষিণাত্যে সভ্যতা প্রচার করতে যাবার পথে।

দুটি কাহিনীর মধ্যে কোন যে অসঙ্গতি আছে তা আমার মনে হয় নি। আমি শুধু ভাবছিলাম যে সভ্যতার ধারক ও বাহক ওই মহামুনি, তাঁর নিজের দেশে সভ্যতার দীপ জ্বালবার আগেই অগস্ত্যযাত্রা করলেন কেন?

কিন্তু কি ভুলই যে করে আমাদের মন! সার ছেড়ে কেবল খোসার কথাই ভেবেছি এতক্ষণ। ভুল ভেঙে গেল ধর্মশালার প্রাঙ্গণে গিয়ে পৌছতে না পৌছতেই

—আ গয়ে, বাবুজী?

আপ্যায়নের স্বর শুনে চমকে মুখ তুলে দেখি সেই বলবীর উপাধ্যায়। দেবপ্রয়াগের সেই তরুণ পাণ্ডাটিকে এখানেও যে আবার দেখা যাবে তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি।

জিতেন তাকে চিনতে পেরেই উল্লাসের স্বরে বলে উঠল, আরে, পনছি মহারাজ যে! তুমি কেমন করে এলে এখানে?

একেবারেই গায়ে মাখল না বলবীর, বরং সেও যেন উৎফুল্ল হয়েই উত্তর দিল: অচেনা পথে যাচ্ছেন আপনারা, এলাম আপনাদের সেবা করতে। আরও কজন যাত্রীও পেয়ে গেলাম কিনা!

কেদার পর্যন্ত যাবে নাকি তুমি?

হ্যাঁ বাবুজী।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! বাঁ দিকের ছোট ঘরখানা থেকে বেরিয়ে এল চক্রধর পাণ্ডা। সাদর সম্বর্ধনা, গভীর আশ্বাস শুনি তারও কণ্ঠে।

বসুন, হাতমুখ ধুয়ে বিশ্রাম করুন। এই তো জলের কল। চা খাবেন এখন? বললেই দোকানদার এখানে দিয়ে যাবে। রাত্রে কি খাবেন বলুন, সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমরা এখানে আছি কি জন্য? যাত্রীর সুখ-সুবিধা দেখবার জন্যই তো?

কেবল বিদেশ-বিভূঁই নয়, একটু আগেই মনে হয়েছিল যেন নির্বাসিতের বনবাস শুরু হয়েছে আমাদের। এখন দেখছি একেবারে বিপরীত—এ যেন নিমন্ত্রিতের সম্বর্ধনা পাচ্ছি আমরা। আর তাও পরম আত্মীয়ের কাছে। আন্তরিকতায় ওতপ্রোত প্রতিটি সম্ভাষণ।

এমনি এ পথের সর্বত্রই। আয়োজনের তারতম্য দেখেছি—কোথাও বেশ ভাল পাকা বাড়ি, কোথাও বা চতুর্দিক খোলা জীর্ণ চালা ঘর; কোথাও প্রচুর খাদ্য, কোথাও বা শুধুই চাল-ডাল। কিন্তু আতিথ্য পেয়েছি সর্বত্র এবং তার চেয়েও বেশী পেয়েছি মানুষের দরদী প্রাণের স্পর্শ। চলতে চলতে মনে হয়েছে যে, সারা উত্তরাখণ্ডই যেন পাদ্য-অর্ঘ্য নিয়ে পথে বেরিয়ে এসেছে নিমন্ত্রিত অতিথি আমাদের অভ্যর্থনা করতে, ঘরে ঘরে যেন শয্যা পাতা আছে আমাদের জন্য, পর্ণপত্রে সাজানো রয়েছে অমৃতের চেয়েও সুস্বাদু ভোজ্য বিদুরের ক্ষুদকুঁড়ো।

নিজেকে তো ভাল করেই জানি—ভিতরে আমার এমন কিছুই নেই যা জাদুমন্ত্রের মত কাজ করবে বিদেশের এই অ-সভ্য মানুষগুলির উপর। বরং যা আছে তা দ্বিতীয় ও তৃতীয় রিপুকে উত্তেজিত করবার মত দোষই বলা চলে। আমার আচার-আচরণ শাস্ত্রসম্মত নয়, দেবদর্শনেও রুচি কম। সাজ-পোশাক দেখলে যে কোন লোকই বুঝতে পারবে যে কিছু টাকা পয়সা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে আছে—যা রক্ষা করবার মত দৈহিক শক্তি বা শস্ত্রবল আমাদের নেই।

তবু, কই ঘৃণা বা লোভের কোন আভাসই তো দেখি নি এ দেশের নিতান্ত দরিদ্র অথচ গোঁড়া হিন্দু জনসাধারণের কোন একজনের চোখেও !

জনাকীর্ণ পথও নয়—ভাঙা হাটে গিয়েছি আমরা। সহযাত্রী পেয়েছি কদাচিৎ। নিজের দল তো তিন জনের, তার একজন আবার অচেনা কুলি—যে শুধু তার দুটি আঙুলেই আমার মত লোকের গলা টিপে ইহলীলা শেষ করে দিতে পারে। অথচ কত দুর্গম অরণ্যের ভিতর দিয়ে দু-তিন মাইল পথ হয়তো আমি একেবারেই একা একা হেঁটে গিয়েছি, কোন কোন রাত্রে নির্জন পল্লীতে আমরা তিনটি মাত্র প্রাণী একটি ঘরের মধ্যে রাত কাটিয়েছি। কিন্তু আঁচড়টিও লাগে নি কোনদিন গায়ে, একটি নয়া পয়সাও কোনদিন খোয়া যায় নি।

সে সব কথা মনে পড়লে আজও যেন রোমাঞ্চ হয়।

চটির এলাকায় ঢুকতে না ঢুকতেই একসঙ্গে বহু কণ্ঠের সাদর আমন্ত্রণ কানে আসত—যেন ঘরের লোক আমি, বহু দিন পর প্রবাস থেকে বাড়িতে ফিরে এসেছি। কেবল পুরুষের ব্যবহারেই নয়, মেয়েদের আচরণেও ওই একই ছন্দ। শিশুদের তো কথাই নেই। বালিকা ও বৃদ্ধাদের মতই নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার যুবতীদেরও। কি নির্মলই যে হাসি তাদের মুখে! নিঃসঙ্কোচে হাত বাড়িয়ে পয়সা চায় যুবতীরাও। অথচ প্রার্থনার মধ্যে ভিক্ষুকের দীনতা নেই একেবারেই। বাপ-ভাইয়ের কাছে ও যেন তাদের অতি-সঙ্গত দাবি। আবদারের রেশ থাকে তাদের সুরে। শুনে দুলে উঠত বুকের ভিতরটা, ঘরে ছেড়ে-আসা আত্মীয়-পরিজনের বিরহ-বেদনা অন্ততঃ তখনকার মত একেবারেই ভুলে যেতাম। ছোটবড় প্রসারিত কোমল হাতে দুটি-একটি পয়সা দিতে পেরে নিজেই যেন ধন্য হয়েছি।

পণ্ডিতের মুখে ব্যাখ্যা শুনেছি ওই চটি ও তার আনুষঙ্গিক ব্যবস্থার, উত্তরাখণ্ডের স্ত্রী-পুরুষের ওই রকম আচরণের। যাত্রীসেবা নাকি এ অঞ্চলের প্রধান উদ্যোগ, জীবিকা বলেই নাকি অত নিষ্ঠা ওর অনুশীলনে। সত্য হলেও অর্ধসত্য এটি। উদ্যোগ ও ব্যবসা যে কি তা আমাদের সমতলের সভ্যসমাজে প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে হাড়ে হাড়ে বুঝেছি বলেই কেদার-বদরীর দেশেই পার্থক্যটা অত সহজে ধরা পড়ে আমাদের চোখে; পণ্ডিতের ব্যাখ্যা মন মানতে চায় না।

দাতাকর্ণের মত নিষ্ঠা এদের না থাকুক, ধর্মানুশীলনের মত অতিথি-সৎকারের প্রবৃত্তি আজও অটুট আছে দেখেছি ওই উত্তরাখণ্ডে। দাক্ষিণাত্যে

যাত্রা করবার পূর্বে ঋষি [illegible] যা ওখানে দান [illegible] ছিলেন সেই মৌলিক হিন্দু-সংস্কৃতি আজও টিকে আছে গাড়োয়ালী নরনারীর চিন্তা ও আচরণের মধ্যে।

তবে ভবিষ্যৎ মনে হয় অনিশ্চিত। ঘুণ ধরছে। কৌশলী শত্রুসৈন্যের অনুপ্রবেশের মত আধুনিক সভ্যতার বিষ ধীরে ধীরে ওই উত্তরাখণ্ডেও প্রবেশ করছে। সে বিষের বাহন বুঝি দ্রুতগামী মোটরগাড়ি।

সেই দিনই গাড়িতে বসেই সেই অনুপ্রবেশের ঈষৎ যেন একটু আভাস দেখে শিউরে উঠেছিলাম।

বাস-স্টেশন তখনও একটু দূরে। ধীরে ধীরে চলেছে আমাদের গাড়ি। প্রথম সারিতে বসে বাঁ দিকের খোলা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমি মুগ্ধচোখে দেখছিলাম একেবারে অপরিচিত সব দৃশ্য। হঠাৎ চোখে পড়ল একটি মেয়ের মুখ। সুন্দরী তরুণী। একটি চায়ের দোকানের বারান্দায় একটি খুঁটি জড়িয়ে ধরে সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে বুঝি আমাদের গাড়িখানাই দেখছিল সে। চকচকে দুটি চোখে কৌতূহলী দৃষ্টি। চলতি গাড়িতে বসে এক মুহূর্তের দেখা আমার। পরমুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে গেল—শুধু সেই মুখখানাই নয়, বিদ্যুল্লতার মত কালো ঘাগরা-পরা সোনালী রঙের তার দেহটিও। নিজের চোখেরই ভ্রম মনে করতাম হয়তো যদি না ঠিক সেই সময়েই আমাদেরই গাড়ির ড্রাইভার ও তার সহকারী হো হো করে হেসে উঠত। চমকে মুখ ফিরিয়ে দেখি যে তাদের চোখের দৃষ্টি ও মুখের ভাব কামনায় কুৎসিত।

সভ্যতার বিষক্রিয়ার অন্য লক্ষণও দেখেছি পিপুলকুঠিতে ও গড়ুর গঙ্গায়। সেও ওই বাস-স্টেশন ও বাস-সড়কের ধারে। কিন্তু সে কাহিনী এখানে নয়।

খুব তোড়জোড় করে জিতেনই রাঁধতে গিয়েছিল। সুতরাং আমি গিয়েছিলাম ওই ফাঁকে এ জায়গাটা একবার দেখে নিতে। কিন্তু আধ-ঘণ্টাখানেক পরেই ফিরে এসে দেখি যে জিতেন তার পরিপাটি করে পাতা বিছানায় বুকের নীচে বালিশ দিয়ে শুয়ে মোমবাতির আলোতে নিবিষ্টমনে কি যেন লিখছে।

এরই মধ্যে রান্না তো হয়ে যাবার কথা নয়। আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কি জিতেন?

তাড়াতাড়ি উঠে বসল সে। মুখচোখে দেখি অপ্রতিভ ভাব।

এবার হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, বউমাকে চিঠি লিখছ বুঝি?

উত্তর না দিয়ে সেও হাসল। কিন্তু তার পরেই সেই যে বলে—ঠাকুরঘরে কে?—না, আমি কলা খাই নি। জিতেন বললে, বড্ড ধোঁয়া রান্নাঘরে। তাই বাহাদুরকেই রাঁধতে বলে এলাম।

খুব যে অপ্রত্যাশিত ঘটনা তা নয়। তবু—

একটু চুপ করে থেকে আমি বললাম, ও পারবে তো?

কেন পারবে না? উদ্ধত উত্তর জিতেনের: আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন—এই যাত্রায় এই হল গিয়ে নিয়ম। খেতে দিলে সব কুলিই রেঁধেও দেয়। ওর একার জন্য হলেও ওকে তো নিজের হাতেই রাঁধতে হত।

আমি হেসে বললাম, সে কথা ভেবে ও-কথা বলি নি আমি।

তবে?

খেতে খেতে বুঝিয়ে বলব।—বলে ঘটি নিয়ে কলতলায় চলে গেলাম আমি।

ব্যাখ্যা করে আর বলতে হল না। খেতে বসে আড়চোখে চেয়ে দেখি, দু-এক গ্রাস খাওয়ার পর হাত আর মুখে ওঠে না জিতেনের। হঠাৎ আমার মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলে সে বললে, বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছে, মণিদা। স্বাদ হবে কি, চালডাল মোটে সেদ্ধই হয় নি।

আমার ঝোলা থেকে খানিকটা লঙ্কার আচার বের করে দিয়েছিলাম। তবু অর্ধেক ভাত পাতে পড়ে রইল তার। রাত্রে পেট ভরল না বলেই বুঝি পরদিন দেখি খুব ভোরেই উঠে বসেছে সে। তাড়াতাড়ি তৈরী হবার জন্য তাড়া দিল আমাকে।

একটু ভুল হয়েছিল আমার। যত ভোরে উঠেছি মনে করেছিলাম ঠিক ততটা নয়। বারান্দায় বেরিয়েই দেখি সেই চক্রধর পাণ্ডা। জয় কেদারনাথজীকী—বলে সে হাসিমুখে সম্ভাষণ করল আমাকে।

তার পিছনে দেখি দু হাতে দু গ্লাস চা নিয়ে এসেছে বুঝি কোন দোকানের এক ছোকরা চাকর।

চক্রধরের কণ্ঠেও জিতেনের নির্দেশেরই প্রতিধ্বনি: চটপট তৈরি হয়ে নিন বাবুজী, এবার হাঁটা-পথ।

স্নান করা আর হল না—নিজেরই একটু শীত শীত করছিল। সাজসজ্জা করতে লেগে গেলাম। সে কি সোজা হাঙ্গাম! জিতেন কনস্টেবলদের মত পট্টি বেঁধেছে পায়ে—ওতে নাকি পায়ে বেশী জোর পাওয়া যায়। আমি

মতদূর যাই নি। তবে আ[illegible] বোঝা পরতে হল, কেডস জুতো [illegible]দিয়ে
শক্ত করে ফিতে বাঁধলাম, ক্লীপ আঁটলাম ঢোলা পাজামার দুটি প্রান্তেই—
যাতে চলতে গিয়ে নিজের কাপড়েই পা বেঁধে না যায়। হাফসার্ট গায়ে দিয়ে
বেল্ট আঁটলাম কোমরে। কানঢাকা মর্কট টুপিটিও চাপিয়েছিলাম মাথায়।
পরে শুনলাম যে এত নীচে অন্ততঃ দিনের বেলায় চলতে গিয়ে ও জিনিসটার
দরকার হবে না।

সবচেয়ে সতর্কতা কাঁধের ঝুলি সম্বন্ধে। অবশ্য-প্রয়োজনীয় সব জিনিস
তাতে গুছিয়ে রাখতে হবে। একপ্রস্থ জামাকাপড়, পথে যদি বৃষ্টি নামে
তজ্জন্য বর্ষাতি, জলপানের জন্য গ্লাস, চায়ের পেয়ালা, চলতে চলতে মুখ শুকিয়ে
গেলে গলা ভেজাবার জন্য লজেন্স-মিছরি, কিছু হালকা পথ্য, এমন কি একটি
ঝারি আকারের সসপ্যান ও একখানি থালাও। ভারী বোঝা পিঠে নিয়ে
চলবে আমাদের কুলি। চটিতে পৌছতে তেমন যদি দেরি হয় তার, অথবা
কোনও কারণে একেবারেই যদি অদৃশ্য হয়ে যায় সে, তারই জন্য এই
অতিরিক্ত সতর্কতা।

অত সব জিনিস উদরস্থ করে তেমন ভারী না হোক বেশ মোটা হয়ে
উঠল আমার ঝোলাটি। কাঁধে সেই ঝোলা এবং এক হাতে লাঠি ও অপর
হাতে ছাতা নিয়ে যখন উঠে দাঁড়ালাম তখন পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে
সে কি হাসাহাসি আমাদের দুজনের। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সবিস্ময়ে অনুভব
করলাম যে বুঝি এরই মধ্যে আমার ধোপদুরস্ত শহুরে মনেও কিছুটা গেরুয়ার
ছোপ লেগেছে।

বাহাদুর কিন্তু আমার কাঁধে বোঝা দেখে ব্যাকুলস্বরে বলে উঠল, ও কি
করছেন বাবুজী? ও ঝোলা আমায় দিন।

কেন রে?

আমি আছি কি জন্য? অত বড় মোট ঘাড়ে নিয়ে চলতে কষ্ট হবে
আপনার।

নির্ভেজাল উৎকণ্ঠা। কিন্তু আমি হেসে উত্তর দিলাম, তেমন কষ্ট হলে
তখন দেব তোমাকে। এখন থাক্।

উঠানে নেমেই আবার দেখি একখানা হাসিমুখ। এবার সেই পনূছি
মহারাজ। উজ্জ্বল মুখ, ললাটের উপর হলুদ রঙের মোটা মোটা কয়েকটি
রেখা। এরই মধ্যে স্নান সেরে নিয়েছে সে। যেন আমারই জন্য অপেক্ষা

করাই[illegible]মনি ভাবে সে বললে, তোমার [illegible] বাবুজী? তব আইয়ে, দর্শন কিজিয়ে।

ঠিক দর্শন বলতে পারি নে, তবে দেখা আমার হয়ে গিয়েছিল। ভোরেই মন্দিরে একবার উঁকি দিয়েছিলাম। নিজেরই চোখ না মনের দোষ নিশ্চয়ই, ভুবনমোহন কোন রূপ চোখে পড়ে নি। অগস্ত্যমুনির বিগ্রহ বলে যার খ্যাতি তার উপর তেল-সিঁদুরের পুরু আস্তরণ না থাকলেও নাক বা মুখ কোনটিই তেমন স্পষ্ট দেখতে পাই নি। মুনির মূর্তি ছাড়াও আরও কয়েকটি বিগ্রহ আছে কাছাকাছি। নাকের দৈর্ঘ্য দেখে একটি মনে হল বুঝি গরুড় মূর্তি ইনি এ অঞ্চলে প্রায় প্রত্যেক মন্দিরেই বা তার কাছাকাছি আছেন। আর একটি শুনলাম গণেশের মূর্তি। শিবের মূর্তি বলে যার পরিচয় দিয়েছিল স্থানীয় পুরোহিত, সেটি বুদ্ধমূর্তি হওয়াও অসম্ভব নয়। পণ্ডিতেরা বৌদ্ধ প্রভাব বা বৌদ্ধদের ধ্বংসপ্রবণতা এই উত্তরাখণ্ডের অনেক স্থানেই লক্ষ্য করেছেন হয়তো বা এ অঞ্চলের প্রত্যেকটি মন্দিরই পর্যায়ক্রমে উভয় সম্প্রদায়েরই ধ্বংসলীলার চিহ্ন বহন করে টিকে আছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও কম যায় নি তাদের উপর দিয়ে। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বিরহীতালের প্রচণ্ড বন্যায় এই অগস্ত্যমুনি গ্রামও ভেসে গিয়েছিল। সে বিপর্যয়ে ভেঙে পড়েছিল মুনির আদি মন্দির। তারপর বিগ্রহকে ওই পাথরের কুঁড়েঘরে এনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। সুতরাং আগে যা ছিল এখনও ঠিক তাই আছে কি না, অথবা এখন যা দেখা যাচ্ছে তার কোন্‌টি কি, তা সঠিক ভাবে কে বলবে! বলবার তেমন প্রয়োজনও বুঝি নেই। যারা খাঁটি তীর্থযাত্রী তাদের মনে এসব বিগ্রহের দেবসত্তা সম্বন্ধে কোন সংশয়ই জাগে না।

যেমন জাগে নি ওই বলবীরের যজমান একদল রাজস্থানী পুরুষ ও মহিলা যাত্রীর। যুক্তকরে মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তারা। অপেক্ষা করছে পাণ্ডার আগামী নির্দেশের জন্য।

পাণ্ডা ছাড়াই আমার দর্শন হয়ে গিয়েছে সে কথা মুখ ফুটে বলতে পারলাম না বলবীরকে। হঠাৎ একটি যুক্তি এসে গেল মাথায়। বললাম, কেদারনাথকে মনে করে ঘর থেকে বেরিয়েছি। আগে তাঁর দর্শন পাই, পূজা করি, তারপর অন্য দেবদেবী দর্শন করব।

সদরদরজায় আর এক বাধা। জনতিনেক লোক ভিতরে ঢুকছিল

আমার সঙ্গে প্রায় সংঘর্ষ হয় আর কি! তবে মুখ তুলে ভাল করে তাকাতেই চিনতে পারলাম—কাল এদের দেখেছিলাম রুদ্রপ্রয়াগের বাস-স্টেশনে।

হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, কাল আর আসতে পারেন নি বুঝি?

ও-দলের অন্ততঃ একজন আমাকেও চিনতে পেরেছিল। সে ঈষৎ বিরক্ত হয়ে উত্তর দিল, কি করে আর আসি! ছাতা কিনতে একঘণ্টা গেল। সাধে কি আর পণ্ডিতেরা বলেছেন—'পথি নারী বিবর্জিতা'।

বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখি, পথে ওই দলের অবশিষ্ট কজনকে। কালকের দেখা সেই মহিলাও আছেন তাদের মধ্যে। একা তাঁরই হাতে একটি ছাতা।

॥ ৭ ॥

মন্দির ও বাজার এলাকা থেকে খানিকটা নীচে যাত্রীসড়ক। লাঠিতে ভর দিয়ে পথে নেমেছিলাম। তারপর হাতের লাঠি মনে হল অনাবশ্যক বোঝা। ঠিক যে সমতল ভূমির উপর দিয়ে পথ তা নয়—হাজারিবাগ জিলার মোটর-সড়কের মত ঢেউ-খেলানো পথ। লাঠি ছাড়াই বেশ চলা যায়।

কালকের সেই পাষাণকারার অনুভূতিটাও আর নেই। পাহাড় অবশ্য চারিদিকেই আছে, তবে সড়ক থেকে অনেক দূরে দূরে। মন্দাকিনীও অনেক দূরে। পথের ধারে গাছপালাও একেবারেই নেই। সামনের দু সারি পাহাড়ের ভিতর দিয়ে অনেক দূরে আকাশের কোলে নিবিড় মেঘই যেন দেখা যাচ্ছে। চলার কষ্ট মোটে কষ্টই মনে হয় না।

সেইজন্যই রীতিমত বিস্মিত হলাম যখন দেখি যে, চারজন বাহকের কাঁধের উপর ডাণ্ডিতে জড়সড় হয়ে বসে বিপরীত দিক থেকে একজন মহিলা আসছেন।

ডাণ্ডির নাম শুনেছিলাম কলকাতায় থাকতেই, তবে চোখে দেখলাম এই প্রথম। গঠন মোটামুটি আরামকেদারার মত, কিন্তু আকারে অনেক ছোট—যেমন দৈর্ঘ্যে তেমনি প্রস্থেও। খুব বেঁটে মানুষের পক্ষেও ওতে পা ছড়িয়ে বসা সম্ভব নয়, আর দেহে যদি মেদ একটু বেশী থাকে তবে হাত দুটিকে বুকের উপর দিয়ে কোলের উপর এনে রাখলেও হয়তো মনে হবে যে গোটা দেহটাই বুঝি হাড়িকাঠে পুরে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এমন খোলামেলা জায়গায় এমন চমৎকার পথে পায়ে না হেঁটে ওই মাঝবয়সী ও আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ সুস্থ ভদ্রমহিলা কেন যে ওই অস্বস্তিকর যানে আরোহণ করে আসছেন তা আমি বুঝতেই পারলাম না। জিতেনের মুখেও দেখি চাপা ব্যঙ্গের হাসি।

আরও খানিকটা এগিয়ে যাবার পর মহিলার স্বামীকে দেখতে পেয়ে জিতেন জিজ্ঞাসাই করে বসল: আপনার স্ত্রী কি অসুস্থ?

প্রশ্নের গূঢ় অর্থটি বুঝতে পেরে ভদ্রলোক মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, আর একটু এগিয়ে গেলেই বুঝতে পারবেন যে অন্ততঃ চলতে গেলে এ পথে সুস্থ ও অসুস্থের পার্থক্য খুব বেশী থাকে না।

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, মহাভারতের বনপর্বে কি লেখা আছে জানেন?

জানি না আমরা। তিনিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আবৃত্তি করে শোনালেন :

"ক্রোশমাত্রং প্রযাতেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু
পদ্ভ্যামনুচিতা গন্তুং দ্রৌপদী সমুপাবিশৎ ॥
শ্রান্তা দুঃখপরীতা চ বাতবর্ষেণ তেন চ।
সৌকুমার্য্যাচ্চ পাঞ্চালী সম্মুমোহ তপস্বিনী ॥"

নিজেই তিনি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েও দিলেন : ক্রোশমাত্র পথ গিয়েই দ্রৌপদী সৌকুমার্য ও ক্লান্তিবশতঃ মূর্ছিত হয়ে পড়েন। তখন যুধিষ্ঠির বললেন :

"বহবঃ পর্বতা ভীম বিষমা হিমদুর্গমাঃ
তেষু কৃষ্ণা মহাবাহো কথং নু বিচরিষ্যতি।"

অর্থাৎ, হে ভীম, পথিমধ্যে হিমদুর্গম ও তেমনি বিষম বহুসংখ্যক পর্বত আছে, দ্রৌপদী কেমন করে সে সব অতিক্রম করবেন ?

তখন ভীম তাঁর নিজের পুত্র ঘটোৎকচকে ডেকে দ্রৌপদীকে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য আদেশ করলেন তাকে, এবং :

"এবমুক্তা ততঃ কৃষ্ণামুবাহ স ঘটোৎকচঃ।
পাণ্ডুনাং মধ্যগো বীরঃ পাণ্ডবানপি চাপরে ॥"

অর্থাৎ ঘটোৎকচ দ্রৌপদীকে এবং অন্যান্য রাক্ষসেরা অন্যান্য পাণ্ডবকে বয়ে নিয়ে চলল।

শুধু পাণ্ডিত্যই নয়, রসবোধ আছে ভদ্রলোকের। জিতেন শুনে হো হো করে হেসে উঠল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, তবে আপনি মহাবীর পাণ্ডবদের চেয়েও বলবান নাকি ? কই, আপনি তো ডাণ্ডিতে চাপেন নি ?

আগের চেয়েও সরস প্রত্যুত্তর ভদ্রলোকের। তিনি বললেন, আমার স্ত্রী এখানে উপস্থিত নেই বলেই খাঁটি সত্য কথাটি বলতে পারছি আপনাদের। মশায়, এক স্ত্রী মারা গেলে অন্য স্ত্রী পেতেও পারি, কিন্তু নিজের প্রাণটা গেলে কিছুতেই আর তা ফিরে পাব না। এ পথে পায়ে হেঁটে চলতে গিয়ে পড়ে যদি যাই, তখন আত্মরক্ষার জন্য নিজে অন্ততঃ একটু চেষ্টা করতে পারব। ডাণ্ডিতে চাপলে সে স্বাধীনতাটুকুও তো গেল। তখন যা করেন শ্রীকেদারনাথ আর ঘটোৎকচের বংশধর ওই ডাণ্ডিবাহকেরা।

মনটা বেশ হালকা হয়েছিল ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে। সুতরাং আর একটু এগিয়েই সৌরী চটিতে একসঙ্গে কয়েকজন দোকানদারের সাদর আমন্ত্রণ

পেয়ে বসে গেলাম একটি দোকানে। সকালে কিছু খাওয়া হয় নি। সুতরাং পেটের তাগিদও ছিল।

এক পো গরম দুধের দাম মোটে দু আনা। আসলে পাওয়া যায় অন্ততঃ দেড় পো। থকথকে সর ভাসতে থাকে দুধের উপর। চিনি যত লাগে তাও ওই দামের মধ্যেই। নিজের সঙ্গে যে বিস্কুট ছিল তাই দিয়ে ভালই হল প্রাতরাশ।

কিন্তু চা দেখেই বমি বমি ভাব। কদিন থেকেই হচ্ছে। পাওয়া যায় সর্বত্রই। কিন্তু কি বিশ্রী চা! সকালে উনান ধরিয়েই এক কেটলি জলে ছটাকখানেক চায়ের পাতা ছেড়ে দিয়ে এরা সেই যে কেটলি চাপাবে উনানের উপর তার পর সারা দিনে আর নামাবে না সেটিকে। জল ফুরিয়ে গেলে আবার জল ঢেলে দেবে কেটলির মধ্যে, আবার পাতা ছাড়বে। সুতরাং চা বলে যে ক্বাথ পরিবেশিত হয় তার যেমন রঙ তেমনি স্বাদ।

আমি নিতান্ত চা-তাল বলেই ওই বস্তুও না খেয়ে পারি নি এ কদিন। আজ কিন্তু হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। দোকানদারকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি বাপু খানিকটা ফুটন্ত গরম জল আমার এই মগে ঢেলে দিতে পার? আর এক চামচ চায়ের পাতা?

বুঝিয়ে বললাম যে, আমার নিজের চা নিজেই তৈরি করতে চাই আমি। শুনে তৎক্ষণাৎ রাজী হল দোকানদার। চারদিন পর মনের মত চা খেয়ে দেহে ও মনে নতুন শক্তিসঞ্চার অনুভব করলাম যেন।

তারপর প্রায় সারাটা পথই ওই ব্যবস্থা চলেছে। স্বতন্ত্র গরম জলের জন্য সর্বত্রই ডবল দাম দিতে চেয়েছি। কেউ তা নিয়েছে, কেউ নেয় নি। কিন্তু যত্ন করে জল গরম করে দিয়েছে সকলেই। কেউ কেউ ঝকঝকে কাঁসার ঘটিও এগিয়ে দিয়েছে টি-পট হিসাবে ব্যবহারের জন্য।

ব্যতিক্রম দেখেছিলাম কেবল পিপুলকুঠিতে—বদরীনাথের পথে বাস-সড়কের শেষ স্টেশনে। কিন্তু সে কথা এখন থাক্।

বেলা নটা নাগাদ আবার চলতে শুরু করলাম।

এবার দেখি যে চলার পথের প্রকৃতি ক্রমেই বদলাচ্ছে। ঢেউ যেমন উঁচুতে উঠছে, নামছেও সেই অনুপাতে নীচুতে। মন্দাকিনী অনেক কাছে এসে গিয়েছে। বাঁ দিকে পথের যেখানে শেষ, খদের শুরু সেখানেই। ডান

দিকেও পাহাড় ক্রমশঃই উঁচু হয়ে উঠছে যেন। সড়কের প্রস্থও কমে আসছে। মাঝে মাঝে এমন যে দুজনে পাশাপাশি চলতে অসুবিধা হয়, বিপরীত দিক থেকে কেউ এলে একজন থেমে আর একজনকে পথ ছেড়ে দিতে হয়।

তাই করতে গিয়েই খানিকক্ষণ পর হঠাৎ চমকে উঠলাম। চোখ তুলে তাকিয়েছিলাম, সে চোখ আর নামতে চায় না।

এই প্রথম দর্শন।

সামনে অনেক দূরে এতক্ষণ যাকে মেঘ বলে উপেক্ষা করেছি, এখন তাই দেখি আকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝক্‌ঝক্ করছে। থাকে থাকে স্তূপাকৃতি পালিশ করা রূপা যেন। না, রূপার চেয়েও বুঝি সাদা। তার চেয়ে স্নিগ্ধ তো নিশ্চয়ই। ঝলসে যায় না চোখ, তা নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে ওই দৃশ্যের উপর। কিন্তু বুকের মধ্যে মনে হয় উত্তাল তরঙ্গভঙ্গ শুরু হয়েছে। পড়ে যাব নাকি! উত্তেজনায় বদ্ধমুষ্টি আমার আরও দৃঢ় হল হাতের লাঠির উপর।

এই দেশীয় যে ভদ্রলোককে পথ দিতে গিয়ে এই ব্যাপার ঘটল তাকে উদ্দেশ করে রুদ্ধনিশ্বাসে বললাম, ও কি ?

উত্তর হল ঃ ওই তো কেদারনাথ।

অত ঝকঝক করছে যে ?

ও তো বরফ।

সত্যি !

যা করকে দেখিয়ে।—বলে মুচকি হেসে চলে গেল ভদ্রলোক।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় আমাকে ঠেলে এগিয়ে এল জিতেন। আমি তার মুখের দিকে চেয়ে বললাম, দেখেছ জিতেন, ওই নাকি কেদারনাথ !

জিতেন বললে, হুঁ।

তারপর হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছে সে। আমি সবিস্ময়ে বললাম, ওকি, অত ছুটছ কেন ?

উত্তর হল ঃ কেদারনাথ যে টানছেন।

আমি বিব্রত হয়ে বললাম, টানছেন তো আমাকেও। কিন্তু তোমার চেয়ে আমার বয়স যে অন্ততঃ দশ বছর বেশী। তুমি পুরো দমে চললে আমি তাল রাখতে পারব কেন ?

শুনে থামল জিতেন। কিন্তু দূর থেকেই আমার মুখের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললে, এই এক পথ, ভুল হবার সম্ভাবনা একেবারে নেই, মণিদা। আর

বাহাদুরই তো আপনার পিছনে আসছে। আমি এগিয়ে যাই—ভাল চটি যদি পাই সেখানে অপেক্ষা করব।

পিছনে তাকিয়ে দেখি অনেক দূরে ধুঁকতে ধুঁকতে আসছে বাহাদুর অগত্যা একাই এগিয়ে চললাম আমি।

সামনের টান যত বাড়ছে, চলার পথের বাধাও বুঝি ততই। পথ ক্রমশঃই সরু হতে হতে চলেছে যেন। তাতেও আটকাত না যদি স্থানে স্থানে ভাঙাচোরা না হত। মনে হল যেন দু-এক দিনের মধ্যেই এ পথ মেরামত করা হয়েছে। নতুন মাটি পড়েছে পথের উপর, অথচ দুরমুশ করা হয় নি। চলতে গেলে পায়ের আঘাতে আলগা মাটি নড়ে যায়, ঝুরঝুর করে গড়িয়ে পড়ে যেদিকে ঢালু সেই দিকে।

তথাপি সন্তর্পণে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এক জায়গায় গিয়ে থামতে হল। একটি ঢেউ অতিক্রম করতে হবে।

দৈর্ঘ্য খুব বেশী নয়, কিন্তু কাছিমের পিঠের মত উঁচু যে জায়গাটুকু প্রস্থেও তা খুব সরু। আর মাটি মনে হল একেবারে আলগা। আমার পায়ের চাপে মাটি যদি সরে যায় তবে সেই মাটির সঙ্গে আমিও নির্ঘাত বাঁ দিকের খদে পড়ে যাব। ডান দিকে পাহাড়ের দেয়াল ঠিক ওই জায়গাটাতেই এত মসৃণ যে সেখানে আঁকড়ে ধরবার একেবারেই কিছু নেই।

সুতরাং থমকে দাঁড়ালাম। বাহাদুর এলে যা হয় করা যাবে।

কিন্তু বিপরীত দিক থেকে দেখি এদেশীয় দুজন লোক চটপট পার হয়ে এল জায়গাটা। তাদের একজন চলে গেল আমাকে অতিক্রম করে। দ্বিতীয় জনও চলেই যাচ্ছিল, কিন্তু পা বাড়িয়েও আবার তা পিছনে টেনে এনে আমার মুখের দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, কাঁচা সড়ক দেখে ভয় করছে নাকি বাবুজী?

স্বীকার করতে লজ্জা হয় আমার। প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়ে উত্তর দিলাম, আমার কুলির জন্য অপেক্ষা করছি। সে এলে দুজনে একসঙ্গে পার হব জায়গাটা।

বাহাদুর তখনও অনেক দূরে। লোকটি একবার সেদিকে তাকিয়ে দেখে পরে আমায় বললে, আসুন, আমিই পার করে দিই আপনাকে।

আমার হাত ধরল সে সঙ্গে সঙ্গেই! আমাকে পাহাড়ের দিকে রেখে সন্তর্পণে পা টিপে টিপে আমাকে সত্যিই পার করে দিল জায়গাটা। তারপর সহাস্য অভিবাদন তার : জয় কেদারনাথজীকী—

সঙ্কটের জায়গাটা এমনি ভাবেই নিরাপদে পার হয়ে এসেও তৎক্ষণাৎ আর এগিয়ে গেলাম না আমি। বাহাদুরের কথা ভেবে ভয় ভয় ভাব আমার মনে। অতবড় ভারী বোঝা পিঠে নিয়ে লোকটা নিরাপদে পার হতে পারবে তো!

কিন্তু এপারে দাঁড়িয়ে দেখি যে, একটি বারও না থেমে বাহাদুর অবলীলাক্রমে পার হয়ে এল জায়গাটা।

বাহাদুর বটে!

অগস্ত্যমুনি থেকে মাইল দশেক উত্তরে কুণ্ডচটি। চটি মানে চটিই। স্থানীয় লোকের ঘরবাড়ি আরও উঁচুতে। এখানে বুঝি কেবল যাত্রীসেবার জন্যই দোকানপাট ও ছোটবড় চটিঘর। দুটি সারি যাত্রী-সড়কের দু ধারে। দোতলা হলেও কুটিরই বলতে হয়। সংখ্যায় এক এক সারিতে খানদশেক হয়তো ঘরবাড়ি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেই ডান দিকে পাহাড় বল জমি বল, তা ঢালু হয়ে নীচে মন্দাকিনীর জল পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। পারে ঋষি-কেশের মত অগণিত শিলাখণ্ড।

অগস্ত্যমুনিতে যেমন এখানেও তেমনি। গাছপালার প্রাচুর্য থাকলে কি হবে, ঘরবাড়ির সর্বাঙ্গে দারিদ্র্যের ছাপ। দোতলা বাড়িরও না আছে রঙ, না গঠনের পারিপাট্য। টালির ছাদের উপর পুরু হয়ে ধুলো জমে রয়েছে। মাটির মেঝেতে ছেঁড়া ছেঁড়া মাদুর পাতা। অগস্ত্যমুনির মতই রুক্ষ রুক্ষ মনে হয় জায়গাটা।

মন্দাকিনীর উপরকার পুল পার হয়ে কুণ্ডচটির এলাকায় যখন প্রবেশ করলাম তখন ঘড়িতে দেখি ঠিক বারোটা। সাড়ে পাঁচ ঘণ্টায় প্রায় এগারো মাইল হেঁটে এসেছি বুঝে নিজের মনই বাহবা দিল নিজেকে—সমতলেও তো একটানা হাঁটায় ঘণ্টায় তিন মাইল চলাই সাধারণ নিয়ম।

প্রথম দোকানদারই ডেকে বাধা দিল আমাকে। তারপরই দেখি দোতলা থেকে নেমে এল জিতেন। হাসিমুখে সে বললে, আজকের মত 'এই ঘাটে বাঁধ মোর তরণী'।

বিস্মিত হলাম আমি। আর দু মাইল গেলেই তো গুপ্তকাশী। শুনেছি যে সেখানে থাকলে কেবল কাশীবাসের পুণ্যই নয়, কাশীর মত শহরের আরামও পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও—

কিন্তু খুব স্বাভাবিক ও সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিল জিতেন।

কাল রাত্রে পেট ভরে খাওয়া হয় নি, তা মনে নেই আপনার? রাঁধতেও সময় লাগবে তো!

কেদারের টান নয় তা হলে, পেটের আগুনের ঠেলাতেই অত দ্রুতবেগে হেঁটে এসেছে জিতেন! আয়োজনও দেখি এরই মধ্যে সম্পূর্ণ করেছে সে। শুধু চাল-ডাল নয়, টাটকা সবজিও কিছু সে কিনেছে অন্য এক চটিওয়ালার দোকান থেকে। মসলা সে কিনে রেখেছিল পথে চন্দ্রপুরী চটিতেই। সবচেয়ে বিস্ময়কর কৃতিত্ব তার কাঁচা লঙ্কা আহরণে। কোন দোকানেই ও বস্তু পাওয়া যায় না, কিন্তু একজনের কাছে সন্ধান ও তার অনুমতি পেয়ে সে খানিকটা চড়াই ভেঙে উপরের এক ক্ষেতে গিয়ে একেবারে গাছ থেকে ছিঁড়ে এনেছে আধপাকা চারটি বড় বড় লঙ্কা। তাই আমাকে দেখিয়ে জিতেন উৎফুল্লকণ্ঠে বললে, আজ এমন ডাল আপনাকে খাওয়াব যার আস্বাদ আপনি জীবনে ভুলতে পারবেন না।

অত উৎসাহ দেখেও মনের সন্দেহ যায় না আমার। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু রাঁধবে কে?

উত্তর হল: কেন, আমি।

কাল যেমন রেঁধেছিলে?

লজ্জা পেল জিতেন, কিন্তু দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, না, বাহাদুরকে আজ কাছেও ঘেঁষতে দেব না। ঠেকে শিখেছি—ছাগল দিয়ে কি ধান মাড়ানো হয়?

তবুও সংশয়ের স্বরেই আমি বললাম, কিন্তু রান্নাটা যে তোমারই কর্ম তা আমি মানব কেমন করে?

এখন না মানলেন, উত্তর দিল জিতেন: তবে মানতে হবে খাওয়ার পর।

তা মানতে হয়েছিল। জিতেন একে ব্রাহ্মণসন্তান, তায় আবার আশ্রমে কিছুদিন শাগরেদি করে হাত পাকিয়েছে। মন্দ রাঁধে না সে। তার উপর এখানে প্রকৃতি আবার তার মত রাঁধুনীর অনুকূলে। জল-হাওয়ার গুণ আছে। ক্লান্তদেহে পেটের আগুন জ্বলেও বেশী। যে কোন আহুতিই গ্রাহ্য তার।

বাসন মেজে উনান ধরিয়ে দিল বাহাদুর। তারপর সে লেগে গেল মসলা পিষতে। আমি তরকারিকটি টেনে নিয়ে ছুরি দিয়ে কাটতে শুরু করে ছিলাম। জিতেন কিন্তু জোর করে টেনে নিয়ে গেল তা। আজ সে পণ করে লক্ষ্মণ ভাই হয়েছে আমার, আমাকে কোন কাজই করতে দেবে না।

বিব্রতভাবে বললাম, তা হলে আমি কি করব?

উত্তর হল: মন্দাকিনীতে গিয়ে স্নান করুন। ততক্ষণেও আমার রান্না যদি শেষ না হয় তা হলে ঘুমিয়ে নেবেন খানিকটা। এখানে তেমন মাছি নেই দেখছি।

সত্যিই মাছি নেই, কিন্তু অন্য উপদ্রব আছে। তা পাণ্ডার। সেই বলবীর আর চক্রধরকে দেখি এখানেও।

ধর্ম ও কর্ম একসঙ্গেই পালন করে এরা। পর পর দুজনেই এসে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল। আমাদের শুনিয়েই চটিওয়ালাকে ধমক দিয়ে বললে, আমাদের সব রকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতে।

অতিথিসৎকারের ফাঁকে ফাঁকে আবার ধর্মকথাও শোনায় তারা। শ্রীকেদারনাথের মাহাত্ম্য বর্ণনা তো আছেই। তা ছাড়াও নানা দেব-দেবীর কত রোমাঞ্চকর কাহিনী।

আশ্চর্য। দুজনে একত্র কাছে আসে না কখনও। একজন চলে গেলে তখন আর একজনের আবির্ভাব হয়। তবে দুজনেরই ব্যবহার একই রকম। কাছে ঘনিয়ে বসে, বেশ মোলায়েম স্বরে হেসে হেসে কথা বলে, ধৈর্য হারিয়ে আমি যদি রূঢ় কথাও বলে ফেলি তা হলেও তাদের কারও মুখের হাসি ম্লান হয় না।

কি করছে ওরা এখানে? একসময়ে হঠাৎ আমার মনের মধ্যে কেমন যেন একটু সন্দেহ জেগে উঠল। সেই দেবপ্রয়াগ থেকে কেবল আমাদেরই অনুসরণ করে ওরা দুজনে যদি এত দূর পর্যন্ত এসে থাকে তা হলে একটু ভাবনার কথা বইকি!

সন্দিগ্ধ মন নিয়েই এক ফাঁকে নীচে নেমে গিয়েছিলাম। কিন্তু ফিরলাম আশ্বস্ত হয়ে। পাশের চটিতেই একতলায় দেখি সেই রাজস্থানী যাত্রীদলের যেন আক্ষরিক অর্থেই বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ির ব্যাপার। সংখ্যায় বেশ কয়েকটি উনান জ্বলছে আর সেই দলের মেয়ে-পুরুষ বড় বড় আটার তাল এবং হাঁড়ি কড়া চাল ডাল নিয়ে উঠে-পড়ে লেগে গিয়েছে। বলবীর দেখি প্রসন্ন মুখে বসে আছে রকের উপর।

হঠাৎ খেয়াল হল আমার যে অনেক পাণ্ডার দৌরাত্ম্য থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় একটি মাত্র পাণ্ডাকে নিজের বলে মেনে নেওয়া। আর তা যদি হয় তা হলে এই পনুছি মহারাজকেই বরণ করতে দোষ কি? বয়স যাই

হোক, তার, এক্ষেত্রে মনে হয় [illegible] প্রয়াগের ধর্মশালা থেকে সেদিন বেচারা মুখ চুন করে যখন বেরিয়ে যায় তখনই কেমন যেন মায়া পড়েছিল ওর উপর

সুতরাং বলবীরকে মোটামুটি কথা দিয়েই উপরে এসেছিলাম। সেই জন্যই সন্ধ্যার পর চক্রধর আমার কাছে এসে জেঁকে বসতেই আমার ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলাম আমি। বললাম, ওই বলবীরকেই পাণ্ডা ঠিক করেছি আমি।

কিন্তু বৃথা চেষ্টা। শুনে চক্রধর প্রথমে একটু চমকে উঠে থাকলেও পরক্ষণেই সে তার স্বভাবসিদ্ধ মোলায়েম হাসি হেসে বললে, তা কি হয় বাবুজী? ও-আবার পাণ্ডা নাকি?

কি তবে?

ও হল গিয়ে ছড়িদার।

মানেই বুঝি না কথাটার। হাঁ করে চক্রধরের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম আমি। বোধ করি তাই লক্ষ্য করেই জিতেন আমাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এল। প্রায় গর্জন করে চক্রধরকে সে বললে, তুমি, ঠাকুর এই শেষ কথা শোন আমার। কোন পাণ্ডারই দরকার নেই আমাদের। তুমি এখন কেটে পড়।

জিতেনকে সমর্থন করল বাহাদুরও। তারও দেখি যেন ভৈরব ভাব। তাড়না তার ভাষা ও কণ্ঠস্বরেই কেবল নয়, হস্তসঙ্কেতেও। এই প্রথম অপ্রসন্নমুখে নেমে গেল চক্রধর।

মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল আমার। আবার সেই সন্দেহ বা আশঙ্কার ভাব। এবার পরিবেশও প্রতিকূল। কিছুক্ষণ পর নীচে নেমে আকাশে বাঁকা চাঁদ চোখে পড়লেও নীচে তার ক্ষীণ আলোকও দেখতে পেলাম না। একে তো বাঁ দিকে বেশ উঁচু পাহাড়, তার উপর আমাদের চটির সামনেই প্রকাণ্ড একটি বট না অশ্বত্থের ডালপালা চটির চাল ছাড়িয়েও অনেক উপরে উঠে গিয়েছে। দু-একটি দোকানে মিটমিট করে যে আলো জ্বলছে তাতে অন্ধকার মনে হয় আরও বেশী কালো। পাশের চটিতে উঁকি দিয়ে দেখি সেই রাজস্থানী যাত্রীদল সেখানে আর নেই। কুণ্ডচটির এলাকায় আর কোন যাত্রী যে আছে তাও মনে হয় না। মানুষ বলতে দেখছি কেবল আমাদের চটিওয়ালাকে—একটি ঝুলন্ত হ্যারিকেন লণ্ঠনের সামনে ঘাড় হেঁট করে নীরবে বোধ করি হিসাব লিখছে সে। এইবার মন্দাকিনীর গর্জন কানে এল। গা ছমছম করছে

উপরে গিয়ে জিতেনকে বললাম, [illegible] ...র উপায় নেই। তবে ভালয় ভালয় রাত যদি কাটে তা হলে ভবিষ্যতে অন্ততঃ রাত্রে এ রকম ছোট নির্জন চটিতে আশ্রয় নিও না।

প্রতিবাদ করাই জিতেনের স্বভাব। কিন্তু আমার ও কথার উত্তরে কথাই বললে না সে।

কিছুক্ষণ পর আমাদের চটিওয়ালা উপরে উঠে এল। এক হাতে কৃপাণ তার।

সে বললে, অব তো মৈ ঘর জাতা হুঁ।

আমি শুষ্ককণ্ঠে বললাম, আপ ভী য়হা পর নহী রহেঙ্গে?

উত্তর হল: নহী বাবুজী, মেরা ঘর তো উপর বস্তিমে।

তব্?

অপর হাতে অভয় আছে তার। সে আমার মুখখানা একবার দেখে নিয়ে অল্প একটু হেসে উত্তর দিল: কোই ফিকর মত্ কিজিয়ে। কেদারনাথজীকা রাজ হ্যায়।

তবে দরজা-জানলা বন্ধ করবার কৌশল শিখিয়ে দিয়ে গেল সে।

পালা করে রাত জাগবার কথা বলেছিলাম জিতেনকে। কিন্তু ক্লান্ত দেহে তা সম্ভব হয় নি। এক ঘুমেই রাত শেষ। সকালে চোখ রগড়াতে রগড়াতে নীচে এসে প্রথমেই চোখে পড়ল অনেক দূরে কেদারনাথের অমলধবল শৃঙ্গ একটি। আকাশে মেঘ নেই। সকালের রোদে বরফ-ঢালা শিখরটি ঝলমল করছে।

আগের দিনই শুনেছিলাম যে, ওই কুণ্ডচটি ছাড়াবার পরেই চড়াই শুরু হবে। গা করি নি কথাটি। একবেলায় প্রায় এগারো মাইল পথ হেঁটে এসে মনে যা জমেছে তা আত্মপ্রসাদের সীমা ছাড়িয়ে অহঙ্কারের ধাপে গিয়ে ওঠে আর কি! চড়াই তা হয়েছে কি? তরতর করে উঠে যাব।

কিন্তু মিনিট পনর চলবার পরেই ভুল ভেঙে গেল। কেবল গা থেকে ঘামই যে বেরুচ্ছে তা নয়, চোখেও যেন জল আসতে চায়। হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেই মহিলাকে—প্রথমে রুদ্রপ্রয়াগ ও দ্বিতীয়বার অগস্ত্যমুনিতে দেখা—সেই বাঙালী যাত্রীদলের একমাত্র মহিলাকে। কাল সন্ধ্যায় কুণ্ডচটিতে আবার দেখা তাঁর সঙ্গে।

নীচে [illegible] এক করে গুপ্তকাশীর দিকে যাচ্ছে সেই দলের লোকেরা। অনেক পরে এলেন সেই মহিলা। তাঁর পিছনে মাত্র একজন এবং তিনি তাঁর স্বামী। ভদ্রমহিলার মুখ দেখি শুকিয়ে গিয়েছে পা যেন আর চলতে চায় না। তবুও চলেছেন তিনি।

চিনতে পারলেন তিনি আমাকে। তাঁর ক্লিষ্ট মুখে দেখি একটু হাসি ফুটল। তিনিই প্রথমে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা বুঝি আজ এখানেই থেকে যাচ্ছেন ?

ঘাড় নেড়ে স্বীকার করলাম। তারপর বললাম, আপনারাও থেকে গেলেন না কেন ? সামনে তো শুনেছি চড়াই।

শুনেছি আমিও, উত্তর দিলেন মহিলা : কিন্তু দলের লোককে বলতে আর সাহস হল না। আমি ছাতা চেয়েছিলাম বলেই নাকি রুদ্রপ্রয়াগে তাদের একটি বেলা নষ্ট হয়েছে। আবার আরও একবেলা যদি নষ্ট করতে বলি তা হলে হয়তো দলই ভেঙে যাবে আমাদের।

শ্রান্ত দেহ ও মন নিয়ে এই চড়াই ভেঙে উপরে উঠতে গত রাত্রে কি কষ্টই যে পেয়েছেন ভদ্রমহিলা তা এখন বেশ অনুমান করতে পারলাম আমি।

খুব যে খাড়া তা নয়, তবে প্রথম অভিজ্ঞতা তো! বেশ কষ্টই হচ্ছে হাতের লাঠি এখন আর অলঙ্কার নয়, প্রধান নির্ভর ওটি। দেহের ভার বুঝি অর্ধেকই বহন করছে ওই লাঠি। তথাপি পা দুটি মনে হয় বুঝি ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে। নিশ্বাস পড়ছে দ্রুততালে। ছাতা খুলে মাথায় দিয়েছি, তবুও রোদ মনে হয় অসহ্য। আসল কথা, আকাশের সূর্যের মত বাঁ দিকের পাহাড়ও ক্রমাগত তাপ ছড়াচ্ছে। গলা শুকিয়ে আসছে দেখে নিতান্ত ছেলেমানুষের মত একটির পর একটি লজেঞ্চ মুখে পুরছি। তবুও খানিকটা গিয়েই থামতে হয়। লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করি কিছুক্ষণ, হয়তো বা বসেই পড়ি পথের ধারে কোন একখানি পাথরের উপর। চলবার সময় চোখে যা তেমন ধরা পড়ে না তা স্পষ্ট দেখতে পাই তখন—পায়ের নীচে পথ তো নয় খাড়া করে পাতা একখানা যেন মই।

আরও দুর্ভোগ, বড়ই যেন একা মনে হয় নিজেকে। শক্ত শরীর জিতেনের, তার ফুসফুসের জোরও বেশী। তরতর করে উঠে যায় সে ডাকলেও থামে না। বাহাদুর পড়ে আছে পিছনে। নিজের কষ্টের কথা মুখ ফুটে বলতেও পারি নে কাউকে।

তবে ক্ষতিপূরণও আছে বইকি! এ যে এক নূতন জগৎ। প্রথম কদিন বাসে বসে যা দেখেছি তা মনে হয়েছে বিদ্যুদ্দীপ্তির মত—দেখা দিয়েই আবার গা ঢাকা দিয়েছে এক একটি দৃশ্য। কিন্তু আজ হিমালয়ের সঙ্গে একেবারে কোলাকুলি সম্বন্ধ। কাছে থেকে দেখছি তার ভীষণ মধুর রূপ। স্পর্শ করছি তাকে, লুণ্ঠনও করছি কিছু কিছু তার সম্পদ।

তুলনায় সরু এ দিকের যাত্রীসড়ক। পাহাড়ের গা ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে হাত দিয়ে তাকে ছুঁই। মাঝেমাঝেই দেখি পাহাড়ের গা বেয়ে সরু বা মোটা জলের ধারা নেমে আসছে, পথ ভিজিয়ে ডান দিকে খদের পথে ঢল নেমে যাচ্ছে নীচে মন্দাকিনীতে। সে জলের ছিটে এসে মুখে লাগে আমার, দুই পায়ে মাড়িয়ে যাই পথের উপর পাতলা জলস্রোতকে। ডান দিকের খদ ভয়ঙ্কর। তথাপি ঢালু জমি দেখলে খানিকটা নেমে যাই ওর মধ্যে। বুক যত কাঁপে আনন্দও যেন তত বেশী।

গাছপালা দুদিকেই। চোখে যা দেখি সবই তো পাথর। তাই ফুঁড়ে কি করে যে এই লক্ষ লক্ষ গাছ উঠল তা ভেবে পাই নে। বড় গাছ যেখানে নেই সেখানেও দেখি তৃণগুল্মের ঘন আস্তরণ। মাঝে মাঝে থোকায় থোকায় ফুল ফুটে আছে। নন্দনকাননের প্রত্যাশা অবশ্য মেটাতে পারে না তারা। গুপ্তকাশীর পথে যা চোখে পড়ছে তা নিতান্তই ছোট ছোট বুনো ফুল। তবু ফুল তো! দেখতে ভাল লাগে বইকি! নীল কি বেগুনী রঙ। ছাই রঙও আছে। কাপাসিয়া, কোকড়ি—কত কি নাম এদেশের ভাষায়। থোকা থোকা ফুল জোনাকির মত মিটমিট করে।

আর থেকে থেকে দেখি, সামনে অনেক দূরে সেই কেদারশৃঙ্গের শুভ্র মহিমা—স্বয়ং কেদারনাথেরই হাতের ইশারা যেন। কি যে জাদু আছে ওই স্নিগ্ধ শুভ্রতায়—চোখে পড়লেই এই কঠিন চড়াই ভাঙবার সব শ্রান্তি যেন নিমেষে দূর হয়ে যায়।

আড়াই মাইল হাঁটতে তিন ঘণ্টা। বেলা নটা নাগাদ গুপ্তকাশীতে পৌছলাম।

"গুপ্ত"কাশী কেন? স্বয়ং কেদারনাথকে জড়িয়ে কাহিনী। পঞ্চপাণ্ডবকে ধরা দেবেন না বলেই নাকি কাশীর বিশ্বনাথ পালিয়ে এসেছিলেন হিমালয়ের এই দুর্গম গিরিশিরে। এই গুপ্তকাশীতে কিছুদিন আত্মগোপন করে ছিলেন তিনি। নাছোড়বান্দা পাণ্ডবেরা এ পর্যন্তও ধাওয়া করে এল দেখে তখন তিনি

পালিয়ে যান আরও উত্তরে কেদারের দিকে। ঐতিহাসিকের মন দলিল-দস্তাবেজের সমর্থন না পেলেও কিংবদন্তীকে অগ্রাহ্য করে একটি ঘটনা কল্পনা করতে পারে। ভগিনী নিবেদিতার মনে উঠেছিল বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের বারাণসী লুণ্ঠনের কথা। হতেও পারে যে কাশীর বিশ্বনাথকে এখানে এনে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল কিছুদিন।

তা হোক বা না হোক, এখনও বিশ্বনাথ আছেন এই গুপ্তকাশীতে। একই মন্দিরে অন্নপূর্ণাও। লোকজনের বসতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুর্গের মত প্রাচীর-ঘেরা স্বয়ংসম্পূর্ণ মন্দির-এলাকা। বেশ কয়েকখানা ঘর ওই চত্বরের মধ্যে। বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা ছাড়াও আরও দেবদেবী আছেন ওখানে। তবে খুব স্পষ্ট দেখা যায় না কোন বিগ্রহই। সবচেয়ে স্পষ্ট এবং একেবারে অবিসংবাদিত যা ওই মহলের মধ্যে আছে তা মাঝারি আকারের একটি কুণ্ড। কোন পাহাড়ের ঝরনার জল যেন এসে জমে ওই কুণ্ডের মধ্যে। ওকেই এখানে বলা হয় মণিকর্ণিকা। মোটামুটি গুপ্তকাশী বারাণসীরই এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

বিশ্বনাথের কৃপাতেই হবে হয়তো, এখানে আসতে না আসতেই আমাদের একটি জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

এখানেও দেখা সেই চক্রধর পাণ্ডার সঙ্গে—যেন ওত পেতে বসেছিল সে। খেরো-বাঁধানো মোটা মোটা খানকয়েক খাতা বগলে নিয়ে সে সম্মুখীন হল আমাদের। ওই গন্ধমাদন পর্বত থেকে বিশল্যকরণী—মানে আমাদের পাণ্ডা-পরিচয় খুঁজে বের করবে সে।

হঠাৎ জিতেনের মনে পড়ে গেল যে কনখলের আশ্রমে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের মুখে শুনে কেদারের একজন পাণ্ডার নাম সে তার নোট-বুকে টুকে নিয়েছিল—মহাদেবপ্রসাদ উপাধ্যায়। নিজেই খুঁজে বের করে জিতেন সেই নামটি উচ্চারণ করতেই প্রায় লাফিয়ে উঠল চক্রধর।

তবে তো আমারই যজমান আপনারা। উনি যে আমারই কাকা।

চেয়ে দেখি তৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে পড়েছে তার সারা মুখে। জোড়া-হাত কপালে ঠেকিয়ে সে বললে, কেদারনাথজীর কি কৃপা দেখুন! সেই দেবপ্রয়াগ থেকে আমাকে আপনাদের সঙ্গে পাঠিয়েছেন তিনি।

কেদার পর্যন্তই তুমি সঙ্গে যাবে নাকি আমাদের?—জিতেন জিজ্ঞাসা করল তাকে।

উত্তর হল : নিশ্চয়ই যাব—আপনারা যে আমাদের যজমান।

খুশী হলেও আশ্বস্ত হতে পারি নি আমি। ভয়ে ভয়ে বললাম, কিন্তু পাণ্ডাঠাকুর, আমাদের তো টাকাপয়সা তেমন নেই। আমাদের সঙ্গে গেলে মজুরি পোষাবে না তোমার।

সেও কেদারনাথজীর ইচ্ছা!—বলে তবুও হাসে চক্রধর।

কত অলৌকিক কাহিনীই না শুনছি এ কদিন ধরে। পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় সুরলোক এই পঞ্চকেদারের দেশে। দেবদেবীরা বিহার করেন সেখানে; কিন্নর-কিন্নরীরা স্বর্গীয় নৃত্যগীতে মনোরঞ্জনসাধন করে সেই দেবতাদের। মনে বিশ্বাস আর ভক্তি যদি থাকে তবে এই নীচের পথ দিয়ে চলতে চলতেও কোন কোন ভাগ্যবান যাত্রী দেখতেও পায় কোন কোন দিব্য আবির্ভাব।

ভক্তি-বিশ্বাস আমার নেই, আস্থা নেই ভাগ্যের উপরেও। অলৌকিক কিছুই দেখি নি এখন পর্যন্ত। তবে এই কদিনেই দুটিমাত্র চর্মচক্ষু দিয়েই ষোল আনা প্রাকৃতিক দৃশ্য যা সব দেখেছি তাতেই সার্থক মনে হয়েছে সব শারীরিক কষ্ট ও সব অর্থব্যয়। যেমন প্রকৃতি তেমনি মানুষও। অলৌকিক যদি থাকেও তবে কি আর এমন বেশী হবে তা!

এই তো আসতে আসতেই দেখলাম তিনটি পাহাড়ী মেয়ে—দল বেঁধে উপর থেকে নীচে যাচ্ছে। বয়সে তরুণী। কনকচাঁপা রঙ স্বাস্থ্যের লাবণ্যে ঢল ঢল করছে। একটু যেন চেপটা মুখের গড়ন; তবু দেখলেই মুগ্ধ হয় মন।

আমি পুরুষ বলে একটুও সঙ্কোচ নেই। মুক্তার মত ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসল তিনটি মেয়েই। একজন হাত বাড়িয়ে বললে, ও শেঠ, তাগা-সুঁই দো।

শুনেছিলাম যে ছুঁচ-সুতো যাত্রীদের কাছে চায় এদেশের মেয়েরা। কিন্তু সঙ্গে ও জিনিস আনতে ভুলে গিয়েছিলাম আমরা দুজনেই। সুতরাং কুণ্ঠিত হয়ে বললাম, নেই।

তব্ পাই দো।

নৈরাশ্যে একটুও ম্লান হয় নি মুখের হাসি তার। এ তো ভিক্ষা-প্রার্থনা নয়, এ যে ওদের খেলা।

একটু যা লাগে আমার চোখে তা ওদের অত সুন্দর মুখে কুৎসিত অলঙ্কারের

অত প্রাচুর্য। কান নাক দুইই ফুঁড়ে [illegible]ড়ে যেন ঝাঁজরা করেছে। প্রত্যেকটি ফুটোর মধ্যেই একটি করে যেন গরুর গাড়ির চাকা। নাকে বেসর ও কানে নথের মত মাকড়ি। নাকের চাকা আবার শিকল দিয়ে কানের সঙ্গে টেনে বাঁধা। রূপার জিনিস। অনেক ব্যবহারে সাদা রঙ কালচে হয়েছে।

একটি করে পয়সা প্রত্যেকের হাতে দেবার পর মনের ক্ষোভ আং মনে চেপে রাখতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, ও-সব পরেছ কেন?

তিনটি মেয়েই একসঙ্গে উত্তর দিল, রেওয়াজ হ্যায়, রেওয়াজ—মানে প্রথা।

কষ্ট হয় না পরতে?

না, ভাল লাগে।

বুঝি দুষ্টুমি করেই একটি মেয়ে বললে, তুমি শেঠ, একটি বেসর গড়িয়ে দেবে আমাকে?

কিন্তু উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই চলে গেল তারা। ঝম্-ঝম্ আওয়াজ কানে আসছে আমার। চেয়ে দেখি পায়েও মল আছে তাদের।

গুপ্তকাশীতে পৌছতে না পৌছতেই আর এক মধুর অভিজ্ঞতা। একপাল ছেলেমেয়ে এসে পথ রোধ করে দাঁড়াল আমাদের। ছোট ছোট হাত বাড়িয়ে সবাই সমস্বরে বলছে, ও শেঠ, পাই দো।

ফুলো ফুলো গাল, টুকটুকে লাল ঠোঁট, মুক্তার মত দাঁত, ছোট ছোট চকচকে চোখ। হাসি যেন মুখে আর ধরে না। যত দেখি ততই মনে হয় যে, ব্যর্থ হয়েছে সব নামকরা শিল্পীর তুলিতে দেবদূতের রূপায়ণ। এরাই যখন নেচে নেচে কি এক দুর্বোধ্য ভাষায় গান শুরু করে দিল তখন আর কি পথশ্রম থাকে!

।তন সন্তানের পিতা জিতেন, সেও দেখি আত্মহারা। আমার মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, যা থাকে কপালে, ফেরবার সময় এদের একটিকে চুরি করে নিয়ে যাব।

তবে তৃপ্তি নেই। যত দেখছি ততই প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে উঠছে মন। মনের উত্তেজক রয়েছে বুঝি ঐ পথের বিন্যাসের মধ্যেই। একসঙ্গে খুব বেশী দূর পর্যন্ত দেখা যায় না তো—এঁকে-বেঁকে চলেছে আমাদের পথ। এক একটা বাঁক যেন এক একখানা পর্দা। একখানা উঠলেই যেন আর একখানাতে দৃষ্টি বাধা পায় আবার। সুতরাং আরও উগ্র হয়ে ওঠে মনের কৌতূহল।

জিতেনের অধৈর্য আমার চেয়েও বেশী। সে চক্রধরের সঙ্গে একটি রফা করবার পরেই তাড়া দিল আমাকে : উঠুন মণিদা, সামনে নাকি আরও সুন্দর।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই ওই মধুর আবির্ভাব।

দেখি সেই গঙ্গোত্রী আর তাঁর মা। বাজারের দিক থেকে আসছেন, গতি কেদারের দিকে।

প্রথমে আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় নি, তাদেরও বুঝি সেই অবস্থা। তারপর আমাদের চারজনের মুখই একসঙ্গে প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এ যেন আমাদের পারিবারিক পুনর্মিলন।

গঙ্গোত্রীই প্রথমে কথা বললেন, কেদারনাথজীকে ধন্যবাদ যে আবার দেখা হল আমাদের।

জিতেন বললে, আমি তো আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। কোথায় যে হারিয়ে গেলেন আপনারা!

হারিয়ে আর যাব কোথায়?—গঙ্গোত্রী উত্তর দিলেন : এই তো এক পথ।

জিতেন বললে, তা হলে বলব যে পালিয়ে গেলেন—নইলে দেবপ্রয়াগেই তো থাকবার কথা ছিল আপনাদের।

খুঁজেছিলেন নাকি সেখানে?

খুব—এবার উত্তর দিলাম আমি : পাঁতি পাঁতি করে আপনাকে খুঁজেছিল জিতেন। বিকেল থেকে প্রায় দুপুর রাত পর্যন্ত—প্রতিটি পাণ্ডার বাড়িতে গিয়ে গিয়ে।

শুনে হাসছেন গঙ্গোত্রী। যত হাসছেন ততই লাল হয়ে উঠছে তাঁর মুখ। না, মুখ লাল হচ্ছে বলেই হাসছেন অত বেশী। শেষে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। বৃদ্ধার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে তাঁকেই সম্বোধন করে বললেন, শুনলে তো মা, হুট করে চলে এসে ভাইয়াকে সেদিন তুমি কি কষ্ট দিয়েছ! দেবপ্রয়াগে উনি ঘরে ঘরে খুঁজেছেন তোমাকে।

হাসলেন বৃদ্ধাও। তিনি বললেন, আমরাও ভেবেছি তোমাদের কথা। এখানে এসেই পাণ্ডাকে বলে রেখেছিলাম তোমাদের জন্য পথের উপর একটি চোখ রাখতে। তা কখন এলে তোমরা? কাল তো দেখি নি।

কাল থেকেই এখানে আছেন বুঝি? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

গঙ্গোত্রী উত্তর দিলেন, কাল কেন? পরশু থেকে আছি।

এতদিন এক জায়গায় কেন ?

চোখ এবং হাতের ইঙ্গিতে বৃদ্ধাকে দেখিয়ে দিলেন গঙ্গোত্রী—সেই প্রথম দিন স্বর্গাশ্রম পরিক্রমা শেষ করে গঙ্গার ধারে খেয়াঘাটে বসে যে ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করেছিলেন তিনি তাঁর গঙ্গোত্রী নাম সত্ত্বেও ভাগীরথীর মত ছুটে ছুটে বেড়ানো।

আমি হেসে বললাম, গুপ্তকাশীতে বিশ্বনাথ লুকিয়ে আছেন মনে করে বেশী বেশী খুঁজতে হল বুঝি ?

আমার তরল পরিহাস বিদ্রূপে কঠিন হয়ে বাজল নাকি আমার কণ্ঠস্বরে ? হঠাৎ দেখি বৃদ্ধার মুখের হাসি নিভে গেল যেন। গঙ্গোত্রীর মুখেও কেমন যেন বিব্রত ভাব।

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে আমি আবার বললাম, আমরা দুজন ঠিক তীর্থযাত্রী তো নই, তাই বিশ্বনাথের মন্দিরে একটিবার উঁকি দিয়েই চলবার উপক্রম করেছিলাম।

গঙ্গোত্রী বললেন, চলুন তবে, একসঙ্গেই যাওয়া যাক।

বলতে বলতেই আবার সহজ হয়ে উঠল তাঁর মুখের ভাব—তার চেয়েও যেন বেশী। সহাস্য চোখ দুটির একটি বৃদ্ধার ও অপরটি যেন জিতেনের মুখের উপর রেখে সকৌতুক কণ্ঠে তিনি আবার বললেন, মাইয়ার আর কোন ভয় নেই এখন। ভাইয়ার উপরেই ভার থাকল তার, কেমন ?

মুহূর্তের জন্য একটু বিহ্বল হল বইকি জিতেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে সেও কৌতুকের স্বরেই বললে, তা না হয় থাকল। কিন্তু বহিন তা হলে কি করবে ?

চাচাকে আগলাবে।

হাসি এবার রূপ ছেড়ে ধ্বনিকে আশ্রয় করেছে। গঙ্গোত্রী অকস্মাৎ বাঁধ ভেঙে আবার ভাগীরথী হয়েছেন।

॥ ৮ ॥

বিচিত্র হিমালয়! বসন্তকালে শুনি যে ফুলে ফুলে সত্যিই নন্দনকানন হয়ে ওঠে। তখন গাছে ফুল, লতায় ফুল। যে ডালে ফোটে তাতে আর ফাঁক থাকে না। যেমন রূপ, তেমনি বর্ণের বৈচিত্র্য। সৌরভে ভারী হয়ে থাকে বাতাস। কিন্তু এটি বসন্তকাল নয়, শরতের শেষ। ফুল তেমন চোখে পড়ছে না। তবু বিচিত্র।

এক পাথরেরই কত রূপ আর কত রঙ। ঠিকই বলা হবে যদি বলি যে, কালো আর গেরুয়া রঙ এদিকের পাহাড়গুলির। তবু কিছুই বলা হল না। এক কালোই দেখি কত জাতের। মেটে কালো আর নিকষ কালো তো আছেই, তার উপর ওই দুই সীমান্তের মাঝখানে ওই কালোরই আরও দশ-বারো স্তর কি না হবে! গেরুয়ারও তেমনি। হাঁ করে দাঁড়িয়ে পড়ি এক এক জায়গায়—পাথরের গায়ে অত যে ঝকঝক করছে, অভ্র নাকি তা!

অনন্ত বৈচিত্র্য গঠনেরও। কোথাও বাঁ হাত দিয়ে টানলেই পুরনো ভাঙা বাড়ির চুন-সুরকির মত ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ে, আবার কোথাও মনে হয় যে ডিনামাইট ফাটিয়েও ওই পাথরের গায়ে সুতোর মত একটি আঁচড়ও কাটা যাবে না।

আর কি বিচিত্র বিন্যাস! বিরাট তো কথার কথা নয় এখানে, জাজ্বল্যমান সত্য! তার কতটুকুই বা ধরা পড়বে আমার মত মাত্র সাড়ে-তিন হাত মাপের মানুষের দুটিমাত্র চশমাপরা চোখে! তবু সেই চোখদুটি দিয়েই কোথাও দেখি রাশি রাশি পাথর—মুদির দোকানের এক পোয়া ওজনের বাটখারার মত আকারের অগুনতি পাথরের গুলির সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে জড়িয়ে আছে দৈত্যের মত বিরাট শত শত নিরেট পর্বত-শিশু। বুঝি নিতান্ত অমনোযোগী ও খামখেয়ালী কোন এক ময়দানব কিছু-একটা গড়বার উদ্দেশ্যে শিলাখণ্ড-গুলিকে ওখানে এনে ফেলবার পরেই কোনও কারণে পালিয়ে গিয়ে আর ফিরে আসে নি বলেই আমাদের মত পথচারীর শুভাকাঙ্ক্ষী কোন দেবতা সেই বিশৃঙ্খল স্তূপকেই বর দিয়ে অনড় ও অক্ষয় করে রেখেছেন। কোথাও আবার না-জানি কোন্ অদ্ভুতকর্মা বিশ্বকর্মার নিপুণ হাতের অতুলনীয় শিল্পকর্ম চোখে পড়ে আকাশচুম্বী কোন কোন পাষাণ-প্রাকারের মধ্যে, স্তরের পর স্তরের নিখুঁত ও নীরন্ধ্র কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্ট বিন্যাসের মধ্যে। হঠাৎ দেখলে মনে

হয় যে খুব পাতলা পাতলা ইট একখানার উপর আর একখানা পাতা রয়েছে। কি দিয়ে যে জুড়েছিলেন বিশ্বকর্মা, ভেবে আর কুল পাই নে।

ভূতত্ত্ববিদের কাছে খোলা বইয়ের পাতা এক একখানা—পাহাড়ের বয়স নাকি নির্ভুলভাবে লেখা আছে তাতে।

বুঝি সেই পণ্ডিতকেও বিহ্বল করতে পারে একেবারে ভিন্ন জাতের এক একটি পাহাড়। জোড়াতালির বালাই তাতে একেবারেই নেই। সবটা পাহাড়ই বুঝি একখানি মাত্র শিলা—জ্যামিতিশাস্ত্রের নিয়মে যত রকমের আকার হতে পারে, একই দেহে তার সব ধারণ করে সোজা একেবারে আকাশেই উঠে গিয়েছে।

কিন্তু এমনই সব পাহাড়ের প্রতি অঙ্গে অঙ্গে প্রাণের লীলা। আমাদের সমতল অঞ্চলে ষোল আনাই যেখানে মাটি তার চেয়েও উর্বর নাকি এই শিলাময় হিমালয়। গাছপালা, লতাগুল্ম, এমন কি শস্যসম্পদের এত প্রাচুর্য এখানে যে, চোখে দেখে তা না মানি কেমন করে! এক ব্যাকরণকে উপেক্ষা করলে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হবে এরও 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' বিশেষণ।

মাঝে মাঝে ধানের ক্ষেতও চোখে পড়ে। আমাদের দেশের মত দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত অবশ্য নয়, তবু ধানের ক্ষেত তো বটে! পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে সিঁড়ি যেন। কোনটি প্রস্থে হয়তো এক হাতও হবে না, আবার কোনটি চার-পাঁচ হাতও হতে পারে। আল বেঁধে জল ধরে রাখবার জন্য যতটুকু সমতল জায়গা যেখানে পাওয়া গিয়েছে সেইটুকু নিয়েই এক একখানা ক্ষেত। আমন ধান পেকে এসেছে এখন! ফিকে সবুজের ফাঁকে ফাঁকে মা-লক্ষ্মীর সোনা ঝলমল করছে।

ফল কত যে আছে কে জানে! পাকা কমলালেবু দেখেছি গাছে ঝুলছে; দেখেছি ডালিম, ঝিঙে-কুমড়ো দেখেছি ঘরের চালায়। এ সব অবশ্য মানুষের হাতে গড়া বাগানে। তার বাইরে ওই যে অনন্ত অরণ্যে অগুনতি গাছ-গাছড়া সেগুলি কি সব নিষ্ফল হতে পারে! কাঁচা আখরোট তো পেয়েছি হাতের তেলোতে যদিও তা মুখে দেবার সাহস হয় নি। কোন কোন গাছের পরিচয় পেয়েছি আমলকী বলে। ঋষি মুনিদের যেখানে বাস সেখানে কি হরীতকী না থেকে পারে! ভেষজ তরুগুল্মের প্রাচুর্য এখানে না থাকলে অত যে আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয় দেখলাম তাদের যোগান আসে কোথা থেকে?

অরণ্যই বেশী।

কত রকমের গাছ। তাকিয়ে তাকিয়ে থ হয়ে যাই। তবে মোটের উপর নেতিবাচক উপলব্ধি। যে সব গাছ চিনি তা চোখে পড়ে না। যা দেখি তাদের অধিকাংশই চিনি নে। তবে স্পষ্ট দেখি দুর্ভেদ্য অন্তহীন অরণ্য। খুব চেনা যে গাছ তাকে দেবদারু বলব, না ঝাউ, ভেবে পাই নে। আকার আয়তন ও বর্ণের পার্থক্য ধাঁধা লাগায় চোখে।

একটানা নিবিড় অরণ্যে বৈচিত্র্য এনেছে সারি সারি ওই দেবদারু বা পাইন গাছ। গুল্মেরা বুঝি ভয় পায় ওই গাছগুলিকে। ফাঁকা ফাঁকা মনে হয় যেখানে এক ঝাঁক দেবদারু মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে। বাতাস সেখানে বাঁশী বাজায় ওদের চামরের মত ডালের ফাঁকে ফাঁকে ফুঁ দিয়ে। কাছে এসে ক্ষণিকের জন্য হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। মনে হয় যেন বন পার হয়ে পার্বতীর উপবনে এসে ঢুকলাম।

ফল তেমন নাও যদি থাকে, বর্ণের সমৃদ্ধি প্রত্যক্ষ সত্য। ফুল ছাড়াও এত যে বৈচিত্র্য থাকতে পারে গাছের বর্ণে তা আগে কখনও বুঝি নি। এক এক জায়গায় মনে হয় বুঝি হাজার হাজার ময়ূর-ময়ূরী গায়ে গা মিলিয়ে পেখম তুলে একসঙ্গে অনবরত নেচে চলেছে। কোথাও আবার অমানিশার অন্ধকার।

সুজলাও বলতে হবে বইকি! প্রচুর জল না পেলে এই কোটি কোটি গাছ হয় এবং হয়ে বেঁচে থাকে কেমন করে! বিরাট বিরাট হ্রদ নাকি আছে অনেক উপরে দুই সারি পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে। জল আছে এই সব পাহাড়ের পরতে পরতে। তা থাক আর না থাক, চোখে যা দেখছি তাই বা কম কি! প্রত্যক্ষ সত্য মন্দাকিনী—উত্তর থেকে দক্ষিণে সগর্জনে ছুটে চলেছেন তিনি। অনেক উঁচুতে উঠে এসেছি এখন। মন্দাকিনী এখন অনেক নীচে। তবু তারই ধারে ধারেই তো এই পায়ে-চলা পথ—দেখা পাই থেকে থেকেই। তারই উপত্যকা এটি। তবু একা নন তিনি। নিজের চোখেই দেখলাম আরও কত শত ছোট-বড় মন্দাকিনী এখানে বয়ে চলেছেন উপর থেকে নীচে—যে খাড়া পাহাড়ের বুকের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছি আমরা তাদেরই গা বেয়ে বেয়ে ওই মন্দাকিনীর সঙ্গেই নিজেদের মিশিয়ে দেবার জন্য।

স্থানীয় লোকেরা বলে "ঈশ্বরকী মায়া।" তা হোক বা না হোক, আমি তো নিজের চোখেই দেখেছি—কোথাও কিছু নেই, পাহাড়ের মাটি না পাথর

ফুঁড়ে তীরের মত বেগে এক বা একাধিক সুতোর মত ক্ষীণ জলের ধারা উঠছে। ওই রকম স্বাভাবিক উৎস নাকি লাখে লাখে আছে এই পর্বতশ্রেণীতে। লক্ষ ধারায় জল উঠছে সেই সব উৎস থেকে। আবার লক্ষ লক্ষ ধারায় ঝরেও পড়ছে আকাশ থেকে জল—থেকে থেকেই তো বৃষ্টি হচ্ছে এখানে। সেই সব ধারা অনবরত বয়ে চলে নীচের দিকে। দুই দশ শত ধারা মিলে এক হয়। সেই এক আবার গিয়ে মিলিত হয় অমনি আর একটি সমষ্টির সঙ্গে। ধারা আর ধারা থাকে না তখন, হয় নির্ঝর। নির্ঝর আর নির্ঝরের মিলনে হয় পাগলা-ঝোরা। দু-দশ পা চললেই এখানে এদের কোন একটির সঙ্গে দেখা হয়ে যাচ্ছে আমার।

বিজন অরণ্যে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে পাথরের বিচিত্র রঙ্গমঞ্চের উপর অপ্সরীর নাচই দেখি বুঝি। শুনি কিন্নরীকণ্ঠের সুললিত সঙ্গীত। কাকচক্ষুর মত স্বচ্ছ নির্ঝরিণী তরতর করে নেমে আসে উপর থেকে। নানা সুরে বাজে অপ্সরীর পায়ের নূপুর—রিমঝিম রিমঝিম—কুলুকুলুকুলু—ছলছলছল। সুর সমে এসে পৌছে যেখানে দুই পাহাড়ের মিলন—এক পাহাড় ছেড়ে আর এক পাহাড়ের পাদমূলে যেখানে পা ফেলতে হবে যাত্রীকে। নির্ঝরিণী সেখানে পাগলা-ঝোরা; রিমঝিম তালের সমাপ্তি সেখানে খলখল অট্টহাস্যে। কালভার্ট বা পুল আছে সেখানে।

এই নৃত্যলীলার পরিপূর্ণতা দেখলাম শোণগঙ্গা আর মন্দাকিনীর সঙ্গমক্ষেত্রে।

অভিসারিকা শোণগঙ্গা নামছেন উপর থেকে। কতদূর থেকে আসছেন তিনি, কত দীর্ঘকালের প্রতীক্ষা তাঁর, কে জানে। শুরুতে দুরু দুরু বুক কেঁপেছে তাঁর, অভিসারিকার মতই রাত্রির অন্ধকারে লোকচক্ষু এড়িয়ে ধীর সন্ত্রস্ত পদবিক্ষেপে এগিয়ে এসেছেন তিনি। কিন্তু পথের প্রান্তে উপস্থিত হবার পর সবই উল্টে গেল। মন আর বাঁধ মানে না তখন। উদ্দাম হয়ে উঠল বুকের রক্ত, তাল কেটে গেল গতির। পাহাড়ের গা বেয়ে নামবার মত ধৈর্য তখন আর তাঁর নেই—অদূরে মন্দাকিনীকে তিনি যে দেখতে পেয়েছেন, কানে শুনেছেন তার জলদগম্ভীর আহ্বান। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে উন্মাদিনী শোণগঙ্গা লাফিয়ে পড়লেন পর্বতশৃঙ্গ থেকে।

সেই দৃশ্য ত্রিযোগীনারায়ণ পর্বতের পাদদেশে উত্তর সীমান্তে। খাঁটি জলপ্রপাত।

কত ফুট উঁচু থেকে প্রতি সেকেণ্ডে কি পরিমাণ জল পড়ছে সে হিসাব জানা নেই আমার। আমি শুধু দেখছি এক ভীষণ-মধুর দৃশ্য। ধারা নয়, জলস্তম্ভ। বিপুল জলরাশি বিরাট এক স্ফটিকস্তম্ভের আকারে উপরের শিখর থেকে মাঝামাঝি আর একটি শিখরের উপর পড়েই ডিগবাজী খেয়ে আবার উপরদিকে প্রায় অর্ধেকটা পথ উঠবার পর ভেঙে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। গঙ্গাবতরণের যে ছবি আমাদের দেশের হাটে-বাজারে দেখতে পাই আমরা তারই আসল রূপ। সম্পূর্ণ জীবন্ত। পার্থক্য কেবল এই যে, শোণগঙ্গা এখানে যাঁর মস্তকে অবতরণ করছেন তিনি কৈলাসপতি নন, হিমালয়—হিমালয় পর্বতশ্রেণীরই একটি পাদশৈল। পাহাড় বলেই সে তার জটার জালে আটকাতে পারে নি দুর্দান্ত শোণগঙ্গাকে, আর চূর্ণ হয়ে ভেসেও যায় নি। তবু ওই বিপুল জলস্রোতের অবিরাম আঘাতে তার মাঝখানটা, স্পষ্ট দেখেছি, উদূখলের মতই গভীর।

যেমন আয়তন ও গতিবেগ এই বিপুল জলরাশির তেমনই গর্জনও। দেবপ্রয়াগকে হার মানতে হবে উপরের এই শোণ-প্রয়াগের কাছে।

ভয়ঙ্কর এই জলপ্রপাতের রূপ! কিন্তু কি সুন্দর! চোখ আর ফিরতে চায় না। ওই যে বিপুল জলধারা পাদশৈলের উপরে পড়েই আবার উপর দিকে লাফিয়ে উঠে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছে সেই দিকে চেয়ে চেয়ে জলকে আর জলই মনে হয় না। আগুনের নয়, রূপার ফুলঝুরি দেখছি—একটি নয়, এক লক্ষ; ভঙ্গুর নয়, স্থির।

গুপ্তকাশী থেকে গৌরীকুণ্ড একুশ মাইল পথ, তিন দিন লাগল পার হতে।

পাণ্ডারা বলে কেদারের 'বিকট পন্থ'। 'বিকট' বলতে মন চায় না আমার—এ যে নিঃসংশয়ে বিচিত্র। তবু কি কঠিন পথ! সুন্দর, কিন্তু ভয়ঙ্কর।

কি কঠিন চড়াই! আর অসংখ্য। একটির পর একটি পার হয়ে আসছি, তবু শেষ আর হয় না। সামনেরটি দেখি আরও উঁচু। চড়াই শেষ হলেই উত্তরাই আসে। দশ গজ পথও সমতল আর পাই নে—চটির এলাকাতেও নয়।

দুঃসহ পথশ্রম।

পিঠের বোঝা এখন অনেক হালকা। বাহাদুর ছাড়ে নি। ঝোলা আমার প্রায় খালি করে বাড়তি বোঝা নিজের পিঠে তুলে নিয়েছে সে। তথাপি পা আর চলতে চায় না।

উঠছি তো উঠছিই। হাঁটু ভেঙে আসে, বুক ধড়ফড় করে, ক্রমেই ছোট হতে হতে শেষে নিশ্বাস একেবারে বন্ধ হয়ে আসতে চায়। তবু যেখানে-সেখানে থামবার উপায় নেই। এমন খাড়া পথ যে মনে হয় থামলেই বুঝি নীচে গড়িয়ে পড়ব। স্থির হয়ে দাঁড়াবার মত হাত পাঁচ-ছয় সমভূমি কোথাও যদি পাই সেখানেও সামনের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে ভরসা হয় না। থামবার আগেই ঘুরে তাকাই বিপরীত দিকে। বল্লম-আঁটা লাঠিখানা কোন দুখানা পাথরের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়ে ওর মোটা মুণ্ডটির উপর প্রথমে পর পর দুটি হাতের তেলো পেতে যুক্ত হাতের পিঠের উপর চিবুক বিন্যস্ত করে তবে দাঁড়াতে পারি—দাঁড়িয়েও ওই লাঠিখানাই যেন একমাত্র আশ্রয়। তাতে ওই পা দুটিরই যা একটু বিশ্রাম। এখানকার বাতাসে ওজন গ্যাসের পরিমাণ কম বলেই বুঝি হাঁসফাঁস ভাবটা একেবারে যেতে চায় না। মনের বিশ্রাম হয় আরও কম। দাঁড়ালেই যেন অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে ওঠে মন এক দিকে খদ ও অপর দিকে পাহাড়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে। এত উপরে উঠে এসেছি, তবু কি উঁচু বাঁ দিকের পাহাড়! যতখানি সম্ভব ঘাড় বেঁকিয়েও উপরে চূড়া দেখতে পাই নে। অনেক নীচে মন্দাকিনীও চোখে পড়ে কদাচিৎ। উপরে বা নীচে যেদিকেই তাকাই, মাথা যেন ঘুরে ওঠে, যেন ওই ভয়ঙ্করকে এড়াবার জন্যই আবার চলতে থাকি। আশঙ্কার তাড়নার সঙ্গে সঙ্গে আশারও একটু হাতছানি আছে বইকি! ভাবি বুঝি আর একটু চললেই চড়াই শেষ হবে।

কিন্তু আলেয়ার আলো!

একসময়ে চড়াই শেষ হয় নিশ্চয়ই। কিন্তু তখনই শুরু হয় উতরাই।

নামতেও তেমনি কষ্ট—যেমন দেহের তেমনি মনেরও। নামছি তো নামছিই। উঁহু, ঠিক হল না কথাটা। উতরাইয়ের পথে আমি আর কর্তা নই। পা দুটি চলছে বটে, চলছে আমার তৃতীয় চরণ—মানে হাতের লাঠিটিও। তবে আমি যেন আর চলছি নে। কে এক শক্তিশালী পুরুষ যেন পিছনে লুকিয়ে থেকে তার অদৃশ্য হস্তে ঠেলে নামিয়ে দিচ্ছে আমাকে। ইচ্ছা দূরে থাক, চেষ্টা করলেও উতরাইয়ের পথে আমার থামবার উপায় নেই। মনে হয় যে পায়ের যান্ত্রিক গতি বন্ধ করলেই বুঝি পিছনের ঠেলায় হুমড়ি খেয়ে পথের উপর পড়ে যাব এবং তার পর আমার এই সজীব দেহটি নির্জীব একটি মাংসপিণ্ডের মতই গড়িয়ে গড়িয়ে কোন্ অন্ধকূপের অতলে যে গিয়ে পড়বে, কে জানে।

দুঃসহ পরিশ্রম কেবল মাংসপে[illegible]গুলির উপরেও। প্রতি মুহূর্তেই সন্ত্রস্ত সতর্কতা। লাঠির মত সিধা পথ তো নয়, সাপের মত এঁকেবেঁকে চলেছে পাহাড়ের ধারে ধারে। বাঁক নিয়েছে হয়তো একখানি পাথরের একেবারে শেষ প্রান্তে—সূক্ষ্ম কোণ রচনা করে প্রায় বিপরীত গতিতে নীচের বা উপরের দিকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিবিড় ঘন লতাগুল্মে ঢাকা সেই কোণটি, ওদের সঙ্গে কোলাকুলি হয়েছে নীচের গাছগুলির ডালপালার। চোরাবালির চেয়েও মারাত্মক পাহাড়ী-পথের এই চোরা ফাঁকগুলি। ঠিক পথের উপর চোখ দুটির স্থির দৃষ্টি যদি পাতা না থাকে, অথবা দৃষ্টি স্থির থাকলেও মন যদি চোখ দুটিকে ফেলে কোনও কারণে উধাও হয়ে গিয়ে থাকে তা হলে নীচে শক্ত পাথর আছে ভেবে সেই বাঁকের মুখে সবুজের ঢাকনির উপর আর একটি পা ফেললেই সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো কয়েক হাজার ফুট নীচে মন্দাকিনীর গর্ভে গিয়ে পড়তে হবে। তা যদি নাও হয়, পড়তে পড়তে কোন একখানি পাথর বা কোন একটি গাছের গুঁড়িতে পড়ন্ত দেহটি আটকেও যদি যায়, তা হলেও সেখান থেকে উঠে আসবার শক্তি আর থাকবে না।

বাঁকে বাঁকে সবুজ বনানীর নীচে মৃত্যুর ওই রকম গোপন ফাঁদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একবার সজাগ হবার পর আর কি ঘুম আসে মনের! চলবার সময় আর কি ঢিলে হতে পারে গুণ-দেওয়া ধনুকের ছিলার মত যাত্রীদেহের টান টান স্নায়ুগুলি!

অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত যেখানে পথ সেখানেও স্বস্তি নেই মনের। অরণ্য নিবিড় থেকে নিবিড়তর হচ্ছে। গাছে গাছে ঠাসাঠাসি। গাছের গোড়ায় লতাগুল্মের জড়াজড়ি, উপরে অগণিত শাখাপ্রশাখার। পাথরের পাহাড়ের মতই বুঝি নিশ্ছিদ্র উদ্ভিদের এই দ্বিতীয় প্রাকার। আকাশের বিরুদ্ধে বুঝি সুপরিকল্পিত অভিযান তাদের। দু-দিক থেকেই গাছ উঠে ঢেকে ফেলেছে পায়ে-চলা পথ, মুছে ফেলেছে যেন আকাশ। মধ্যাহ্নেও অন্ধকার যেন দুই হাতে ঠেলে এগিয়ে চলেছি অন্ধকার থেকে গভীরতর অন্ধকারে।

অন্ধকারের মহাসমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছি। চড়াই-উতরাইগুলি যেন মহাতরঙ্গ তার। আমার নিজের ইচ্ছা বা চেষ্টার কোন মূল্য নেই এখানে। আকাশ ছোঁওয়া ঢেউয়ের তাড়নায় একটিবার হয়তো ভুস করে ভেসে উঠছি ওদেরই একটির মাথার উপর। একটি মুহূর্ত আকাশের আলো দেখছি এক নজর, কিন্তু

আর ও[illegible] দেখেছি [illegible] আরও উঁচু ঢেউটিকে। ওই একটি মুহূর্ত মাত্র! পরমুহূর্তেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ভেঙে পড়েছে আমার ক্ষণিকের আশ্রয় মহাতরঙ্গের উত্থিত শৃঙ্গ। তার ভগ্নাবশেষের সঙ্গে সঙ্গে আবার অতলে তলিয়ে যাচ্ছি আমি।

জাহাজ-ডুবির বলি মুমূর্ষু মানুষের উপলব্ধিই আমার মনে। কিন্তু এ তো জল নয়! আমার দু দিকেই শক্ত পাথর; পায়ের নীচেও তাই। তা ছাড়া আর যা দেখছি তা ওই পাথরের মতই কালো আর বিরাট সব গাছ।

একটু দম নেবার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম একটি সুদীর্ঘ উতরাইপথের শেষ প্রান্তে মাঝারি আকারের একটি পাগলা-ঝোরার ধারে। গভীর অরণ্যের অন্ধকারগর্ভে একেবারে একা। শুনতে পাচ্ছি সেই পাগলা-ঝোরার খলখল অট্টহাস্য। চোখে পড়ছে পাহাড়ের মতই আকাশচুম্বী অসংখ্য বৃক্ষের পিঙ্গল-ছবি, উলঙ্গ কাণ্ড ও শাখাগুলি। হঠাৎ একটি দমকা হাওয়ায় তার অনেকগুলি দুলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই আমার মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে একটি যেন শিহরণ খেলে গেল আর মাথার মধ্যে সবই তালগোল পাকিয়ে গেল।

অদ্ভুত একটি উপলব্ধি আমার মনে। এ তো সমুদ্র নয়! তবে এই কি মহাকালের জটাজাল! সেই জটার জালে ভাগীরথীর মত আমিও জড়িয়ে পড়েছি নাকি!

তবে থেকে থেকে আকাশের হাতছানিও দেখতে পাই। চড়াই ভেঙে উপরে উঠলে আলো পাই, বাতাস পাই। দু দণ্ডের স্থিতি তখন। সেই সুযোগে মানুষের সমাজও পাই—সহযাত্রী ও স্থানীয় নরনারীর প্রাণের একটু উষ্ণ স্পর্শও। সব মিলিয়ে যে জিনিসটি হয় তাই বুঝি কেদারনাথের আশীর্বাদ।

চাচাকে আগলাবার ইচ্ছা হয়তো ছিল গঙ্গোত্রীর। কিন্তু বিপরীত টানের জোর বেশী। সে টান রক্তের তত নয় যত বুঝি ঐ বিদঘুটে পথের। পাশাপাশি চলবার উপায় নেই এ পথে। চললে লাভও কিছু নেই। চলতে চলতে কথা বলতে গেলে নিশ্বাস বন্ধ করতে হয়, নিশ্বাস নিতে গেলে কথা। সুতরাং চলতে হয় সারি বেঁধে আগুপিছু। আর তা হলেই কোন্ আবর্তের টানে কে যে কোথায় ছিটকে পড়বে তার কিছুই বলা যায় না। গুপ্তকাশী ছাড়বার মিনিট পনরর মধ্যেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল আমাদের সম্মিলিত দল।

তবে পারিবারিক পুনর্মিলন হয় আ[illegible] চটি বা [illegible] দোকান আছে। অলিখিত চুক্তি হয়ে গিয়েছে এরই মধ্যে—চলার পথের ধারে মাত্র একখানা চায়ের দোকানও যদি পাওয়া যায় তবে সেখানেই থামবে সে যে তার পায়ের জোরে বা পথের টানে এগিয়ে চলে গিয়েছে। অপেক্ষা করবে যতক্ষণ দলের শেষ লোকটি সেখানে এসে না জোটে। সেখানে একসঙ্গে বসে বিশ্রামের নাম করে গল্প হবে কিছুক্ষণ। তারপর আবার চলা।

এমনি এক বিশ্রামের ফাঁকে দেখা তাঁর সঙ্গে। যুবক সন্ন্যাসী। বয়স বড় জোর বছর পঁচিশেক হবে। সুঠাম গঠন, শ্যামবর্ণ। কিন্তু মুণ্ডিতমস্তক, কৌপীনবস্ত্র সন্ন্যাসী। একখানি মাত্র কম্বল গুটিয়ে গামছা দিয়ে পিঠের সঙ্গে বেঁধে খালি পায়ে হেঁটে আসছেন তিনি। ঠিক আমার পিছনে পিছনেই আসছিলেন হয়তো। বিউঙ্গ চটিতে আমি এসে পৌছবার পর তিনিও সেই দোকানেরই আর এক কোণে এসে বসলেন।

তাঁকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে থাকবে জিতেন। একটু পরেই দেখি যে, গঙ্গোত্রীর সঙ্গে বকবক করা ছেড়ে সে উঠে এসে ঘনিয়ে বসল সেই সন্ন্যাসীর কাছে। সঙ্গে সঙ্গেই জমে উঠল তাদের আলাপ।

ইংরেজী ভালই জানেন ওই সন্ন্যাসী, হিন্দীও বলতে পারেন মোটামুটি। পর্যায়ক্রমে উভয় ভাষাতেই কথা হচ্ছিল তাঁদের। অনেক কথাই কানে এল আমার। বুঝলাম যে কেরলের অধিবাসী তিনি। ম্যাট্রিক ক্লাস পর্যন্ত উঠেছিলেন, কিন্তু পরীক্ষা না দিয়েই সংসার ছেড়ে গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন। শঙ্করপন্থী অদ্বৈতবাদী তিনি। সংসার ছেড়েই উঠেছিলেন গিয়ে শৃঙ্গেরী মঠে। এখন গুরুর আদেশে আচার্যের প্রতিষ্ঠিত আরও তিনটি মঠ দর্শন করবার উদ্দেশ্যে পরিব্রাজক হয়েছেন। অর্থাৎ সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণের পরিকল্পনা তাঁর।

হেঁটেই চলেন নাকি আপনি ?—জিজ্ঞাসা করল জিতেন।

তিনি উত্তর দিলেন, যখন যেমন—কখনও হাঁটি, কখনও গাড়িতে যাই।

খরচ চলে কিসে আপনার ?

ভিক্ষা করি।

কেমন যেন একটা টান অনুভব করে এগিয়ে গিয়ে আমিও ঘেঁষে বসলাম সন্ন্যাসীর কাছে। শুনলাম, জিতেন জিজ্ঞাসা করছে : ভিক্ষা করতে লজ্জা করে না আপনার ?

[illegible] সন্ন্যাসী, আর সেই জন্যই তো ভিক্ষা করতে আদেশ দিয়েছেন গুরু মহারাজ।

তার মানে?—এবার প্রশ্ন করলাম আমি।

আগের চেয়েও মধুর কণ্ঠে সহাস্য প্রত্যুত্তর সন্ন্যাসীর : ভিক্ষা না করলে অহঙ্কার নির্মূল হবে কিসে?

দৃঢ় কণ্ঠস্বর। বিশ্বাস আর উপলব্ধির সুস্পষ্ট ঝঙ্কার সেই সুরে। তবু মন সায় দেয় না আমার। আমার চেনা-জানা বাস্তব জগৎকে প্রতিপক্ষ দেখি এই সন্ন্যাসীর। রোজই পথে-ঘাটে কতজনকেই তো দেখি ভিক্ষা করতে। কোন দিনই মনে হয় নি যে তারা অহঙ্কার-মুক্ত হয়ে শনৈঃ শনৈঃ সাধনার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বিদ্রূপ বা প্রতিবাদ করবার প্রবৃত্তি সেদিন মনে জাগল না আমার। একটু চুপ করে থেকে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, সংসারে ফিরে যাবার ইচ্ছা হয় না আপনার?

তেমনি হাসিমুখেই কিন্তু তাচ্ছিল্যের স্বরে উত্তর দিলেন সন্ন্যাসী, ক্যা হ্যায় সন্‌সারমে!

তার পরের ঘটনাটি একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

সন্ন্যাসীর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই গম্ভীর কিন্তু তীক্ষ্ণ নারী-কণ্ঠের প্রশ্ন কানে এল আমার : সন্‌সার কিসনে বনায়া হ্যায়, বেটা?

চমকে চোখ ফিরিয়ে দেখি গঙ্গোত্রীর মা এসে আমার কাছে বসেছেন; তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন ওই প্রশ্ন।

সন্ন্যাসীর কাছেও ওই প্রশ্ন ও প্রশ্নকর্ত্রী দুই-ই নিশ্চয়ই অপ্রত্যাশিত। থতমত খেয়ে থেমে গেলেন তিনি। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য। পরমুহূর্তেই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে তিনি বললেন, সন্‌সার ঈশ্বরকী মায়া হ্যায়, মাতাজী।

তব্?—প্রায় উদ্ধত ভর্ৎসনার কণ্ঠস্বর বৃদ্ধার : মায়া ভী তো ঈশ্বরকী হী হ্যায়। তব্ তুম, বেটা, সন্‌সার ছোড়কে কেঁাও আয়া?

ঘাবড়ে গেলাম আমি। মোটামুটি জানি মহাপণ্ডিত দিগ্বিজয়ী শঙ্করাচার্যের বিস্ময়কর জীবন-কাহিনী। ভাসা ভাসা রকমে মনে পড়ছে মণ্ডনমিশ্রের বিদুষী স্ত্রী উভয়ভারতীর কাছে সেই মহাপণ্ডিতের অন্ততঃ সাময়িক পরাজয়ের গল্প। সুদূর অতীতের ঘটনা তা। কিন্তু কি বিস্ময়কর সাদৃশ্য বর্তমানের এই পরিস্থিতির সঙ্গে। সেই কেরলেরই অধিবাসী এই নবীন সন্ন্যাসী। তাঁর প্রতিপক্ষ একজন মহিলা। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে নাকি এখানে! এক

হিসাবে তাই ঘটল। [illegible] রেই হার মানলেন তিনি। যে কথা একটু আগে আমাকে তিনি বলেছিলেন সেই কথাই একটু ঘুরিয়ে আবার বললেন, সংসারে কোন সুখ নেই মাতাজী।

কিন্তু বৃদ্ধা ছাড়বার পাত্রী নন। তিনি বললেন, তা হলে বাবা, নিজের সুখটাই বড় বুঝি তোমার কাছে? যাঁদের স্নেহযত্নে এত বড় হতে পেরেছ তুমি, তাঁদের সুখশান্তির কথা কি ভাবতে নেই? যিনি তাঁর নিজের বুক থেকে দুধ দিয়েছেন তোমার মুখে, তাঁর মুখে তুমি কি এক ফোঁটা জলও দেবে না?

সন্ন্যাসী নিরুত্তর। তাঁর মুখের হাসিটুকু ক্রমেই যেন নিভে আসছে। বুঝি তাই লক্ষ্য করেই একটু পরে বৃদ্ধা কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, ঘরে কে কে আছেন তোমার?

উত্তর দিলেন সন্ন্যাসী: সব আছে।

বিয়ে করেছ?

না।

তবে যে বললে সব আছে?—যেন বিরক্ত হয়েই বললেন বৃদ্ধা।

কিন্তু উত্তর না পেয়ে আবার কোমলকণ্ঠে তিনি বললেন, তবে বেটা, কেদারনাথ-বদরীনারায়ণকে দর্শন করবার পর ঘরে ফিরে যাও তুমি, গিয়ে বিয়ে-থা করে সংসারী হও। সংসারে থেকেও ঈশ্বরকে লাভ করা যায়।

তবুও সন্ন্যাসী নিরুত্তর।

কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাঁর আনত মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন বৃদ্ধা। তারপর একটু হেসে আবার বললেন, চুপ করে রইলে কেন বাবা? সংসার করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না? উত্তর দাও তো আমার মুখের দিকে চেয়ে। বল তো, আমি সংসারে আছি বলেই নরকে যাব নাকি?

এবার কিন্তু হেসে ফেললেন নবীন সন্ন্যাসী—সেই প্রশান্ত হাসি যা প্রথম দিকে তাঁর মুখে দেখেছিলাম। বৃদ্ধার মুখের দিকে চেয়ে সম্পূর্ণ আন্তরিকতার স্বরে তিনি বললেন, না মা, আপনি স্বর্গে যাবেন।

শুনে ওষ্ঠপ্রান্তের হাসিটুকু সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল বৃদ্ধার। তিনিও উৎফুল্লকণ্ঠে বললেন, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক বাবা। তবে তোমার নিজের মাকেও তুমি এই কথা বল গে। দেখবে যে সংসারই স্বর্গ হয়েছে।

এ[illegible] তিনি আবার বললেন, [illegible] তোমাকে নয়, উদাসী সন্ন্যাসী দেখলেই তাঁকে এই কথা বলি আমি। সংসার কি ঈশ্বর ছাড়া? আর সংসার কি সত্যিই ছাড়তে পারে কেউ? ঘরবাড়ি ছেড়ে এই যে হিমালয়ের বনে এসে ঢুকোছ, এখানেও তো দেখছি পায়ে পায়ে সংসার। না থাকলে কেদারনাথের চরণ পর্যন্ত কি যেতে পারত কেউ? দেখেছি তোমাদের মঠ-মন্দিরও। তাও তো এক-একটি সংসার। তফাত যা তা ছোট আর বড়র।

আরও একটু তফাত আছে মা।—বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন সন্ন্যাসী: একটি আমার সংসার, অপরটি ঈশ্বরের।

বলেই হাসতে হাসতে পথে নেমে হনহন করে এগিয়ে চললেন তিনি।

তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি যে মুখের হাসি তাঁর দেখতে দেখতে যেন মরে গেল। আর তখনই গঙ্গোত্রী এসে হাত ধরলেন তাঁর। বললেন, বিশ্রামও হল, তর্কও হল। এখন ওঠ তো মা, পথ আমাদের এখনও অনেক বাকি।

উঠলেন গঙ্গোত্রীর জননী। উঠতে গিয়েই আমার চোখের সঙ্গে চোখ মিলে গেল তাঁর। থমকে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, শুনলে তো ভাই? আচ্ছা তুমিই বল তো, 'আমি' কি 'তিনি' ছাড়া? 'আমি'র মধ্যে 'তিনি' না থাকলে এত মায়া-মমতা আমরা পাই কোথা থেকে? আমাদের সংসার যদি ফাঁদই হয় তবে শিব পার্বতী গঙ্গা—এঁরা হিমালয় ছেড়ে আমাদের ছোট ছোট ঘরে গিয়ে ওঠেন কেন?

গঙ্গোত্রী দেখি মুচকি মুচকি হাসছেন। তিনি এবার তাঁর মায়ের হাতে বেশ জোরে একটি টান দিয়ে বললেন, আবার চাচার সঙ্গে লাগতে যাও কেন মা? উনি তো আর সন্ন্যাসী হন নি—দিব্যি দেখছি সংসারী মানুষ। না, চাচা?

সেই গঙ্গোত্রী! আর মাইল খানেক মাত্র চলবার পর তাঁরই নির্বন্ধাতিশয্যে সেদিনের মত চলা থামাতে হল।

গঙ্গোত্রী বললেন, আমরা তো খাওয়া-দাওয়া সেরে বেরিয়েছি, চললে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে পারি। কিন্তু আপনারা এখানে না থামলে রেঁধেবেড়ে খাবেন কখন? বেলা তো দুটো বাজতে চলেছে।

এরকম একটা কথা শোনবার জন্য মন প্রস্তুত ছিল না আমার। সুতরাং

বেশ একটু দোলা লাগল তাতে। [illegible] আধ মিনিট পর আমি [illegible] মত বললাম, তা হলে এগিয়ে যান আপনারা। অনর্থক সময় নষ্ট করবেন কেন?

কিন্তু শুনে স্মিতমুখে বললেন গঙ্গোত্রী, এখানে থাকলে সময় আমাদের নষ্ট হবে কেন? তীর্থ করতে বেরিয়েছি তো আমরা। তা সে সম্বন্ধে কিনা একটা কবিতা আছে গুরুদেবের—যার মানে এই যে পথের দু ধারেই তো আসল তীর্থ! জানেন কবিতাটা আপনি?

আমি রীতিমত বিস্মিত হয়ে বললাম, গুরুদেব বলতে আমাদের রবীন্দ্রনাথের কথা বলছেন?

কৃত্রিম কোপে বেঁকে গেল গঙ্গোত্রীর ভ্রূ দুটি। বেশ একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠেই তিনি বললেন, রবীন্দ্রনাথ বুঝি কেবল বাঙালীদেরই? তিনি তো সারা হিন্দুস্থানের সকলেরই গুরুদেব।

ততক্ষণে বিস্ময় আমার সম্ভ্রমে রূপান্তরিত হয়েছে। মনের মধ্যে আনন্দও যেন আর ধরে না। গঙ্গোত্রীকে তখন খুবই আপনজন মনে হল আমার। গাঢ়স্বরে বললাম, ঠিক বলেছেন আপনি। বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছে আমার।

তারপর স্মৃতির অতলে হাতড়ে হাতড়ে উদ্ধার করলাম সেই বিশেষ দুটি লাইন যা আমার অজ্ঞাত কোন কারণে গঙ্গোত্রীর হৃদয়ে একেবারে গাঁথা হয়ে গিয়েছে। সুর করে আবৃত্তিও করলাম লাইন দুটি:

"পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়,
পথের দু'ধারে আছে মোর দেবালয়।"

ঠিক ঠিক।—উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলে উঠলেন গঙ্গোত্রী। তারপর ঈষৎ জড়িতস্বরে তিনি পুনরাবৃত্তি করলেন ওই লাইন দুটি।

চেয়ে দেখি যে আনন্দে উজ্জ্বল, আবেগে বিহ্বল হয়েছে গঙ্গোত্রীর মুখখানি।

॥ ৯ ॥

ছাপা পুঁথিতে নামই নেই 'বরাস্থ'র। খান দুই খড়ের চালার কুঁড়েঘর ও একখানা ছোট পাকা দোতলা বাড়ি মাত্র সম্বল ছিল ওই চটির। বুঝি সেই-জন্যই চটি বলে ওকে মানতেই চায় নি পাণ্ডারা। কিন্তু ইতিমধ্যে কুঁড়েকখানি ও পাকা দালানখানার মাঝখানে কাঠের দোতলা বাড়ি উঠেছে একখানা। সদ্য রঙ-করা ঝকঝকে-তকতকে।

গঙ্গোত্রীর ইচ্ছা এবং জিতেনের লোভ ওই নতুন বাড়িখানাতে থাকবার। আমার মনে কেমন যেন আশঙ্কা—অমন ছবির মত বাড়িখানি কি আর যাত্রীকে থাকতে দেবার জন্যে হয়েছে? তবে কুঁড়েঘরের চাওয়ালার কাছে খোঁজ নিয়ে পুরনো পাকা বাড়িখানার নীচের তলায় পাঁচমিশেলী দোকানের মালিক শেঠজীকে জিজ্ঞাসা করতেই সে আশঙ্কা একেবারে নির্মূল হয়ে গেল। পরম সমাদরে আমাদের অভ্যর্থনা করে ঘর খুলে দিলেন শেঠজী।

কদিন থেকেই মনে হচ্ছিল কথাটা। ধর্মশালাগুলোই না হয় দশ জনের টাকায় তৈরি হয়েছে। কিন্তু এই চটিগুলো? নিতান্ত কুঁড়েঘর হলেও তা তৈরি করবার একটা খরচ আছে তো! কে বহন করে সে খরচ? আজ এই ঝকঝকে নতুন বাড়িখানাতে অতিথির সমাদর ও নিমন্ত্রিতের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রশ্নটি খোলাখুলিই জিজ্ঞাসা করলাম শেঠজীকে: এ সব চটি তৈরি করবার খরচ সরকার থেকে পাওয়া যায় নাকি?

এক পয়সাও না।—ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলেন শেঠজী: বরং লাইসেন্স পাবার জন্যে টাকা দিতে হয় সরকারকে।

তারপর নিজে থেকেই তিনি আবার বললেন, পাঁচ হাজার টাকা, বাবুজী, খরচ হয়েছে আমার ওই দোতলা বাড়ি তৈরি করতে। তা ছাড়া ওই জলের কল আনিয়েছি ও বসিয়েছি আমার নিজের খরচে। সরকার-বাহাদুর আমাকে একটি পয়সা দিয়েও সাহায্য তো করেই নি, বরং উলটে পাঁচশো টাকা ইনকাম-ট্যাক্স চাপিয়েছে আমার উপর।

তা হলে শূন্যগর্ভ নয় তাঁর ওই শেঠজী খেতাব! নিশ্চয়ই শাঁসালো লোক তিনি। তা হলেও তাঁর ধনের চেয়ে মনটাই বেশী চোখে পড়ল আমার। ধন তিনি যে উপায়েই উপার্জন করুন না কেন, তার বেশ একটি মোটা অংশই যে তিনি যাত্রীসেবার জন্য ব্যয় করেছেন তার প্রমাণ তো রয়েছে

আমার চোখের সামনেই। আর অমন জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ নাও যদি থাকত তবু মুক্তকণ্ঠে বলতাম যে, বরাসুর সেই শেঠজী কেবলই দোকানদার নন।

বেশ ভাল লোক তিনি। অত্যন্ত অমায়িক, সহৃদয় ব্যবহার তাঁর। কিছুক্ষণ পর সওদা করবার জন্য যখন তাঁর দোকানে গিয়ে বসলাম তখন হেসে বললেন তিনি, আপনাদের মনের মত চাল আজ আমি দেব বাঙালীবাবু। কেবল সরুই নয়, দেশে যা আপনারা খান সেই সেদ্ধ চাল।

দাম অবশ্য সের প্রতি দু টাকা। তবু খুশী হলাম বইকি!

তবে ওই চাল পর্যন্তই। ডাল পাওয়া গেল অড়হর আর আলু।

কিছু সবজি পাওয়া যায় না শেঠজী?—আশা না থাকলেও জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলেন তিনি, না বাবুজী।

স্বর শুনে বুঝলাম যে তিনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন।

কিন্তু হঠাৎ উল্লাসে চিৎকার করে উঠল জিতেন: ওই তো কি যেন ঝুলছে গাছে! ঝিঙে নাকি?

দোকান-ঘরের গা-লাগা কি যেন একটা গাছ। চোখে পড়েছিল বটে যে ওকেই জড়িয়ে পুষ্ট পুষ্ট অনেকগুলি লতা প্রচুর পাতা মেলে ছাদ পর্যন্ত ধাওয়া করেছে। ওতে যে ঝিঙে ফলে থাকতে পারে তা মনে হয় নি আমার। জিতেনের ডাক শুনে কাছে গিয়ে দেখি যে সত্যিই ঝিঙের মত কটি ফল ঝুলছে পাতার ফাঁকে ফাঁকে। দেখে উল্লসিত হলাম আমিও। জিতেনের মত আমিও চিৎকার করেই বললাম, সত্যিই তো শেঠজী, সবজি তো রয়েছে আপনার গাছেই।

দোকান থেকে উঠে এসে নিজেও তিনি দেখলেন ঝিঙে কটি। পরে হেসে বললেন, তুলে নিন যে কটি বড় বড় হয়েছে। এর জন্যে কোন দাম দিতে হবে না।

শুনে বিশ্বাস হয় না। কিন্তু অবিশ্বাসও করতে পারি নে শেঠজীর মুখের দিকে চেয়ে। কেবল হাসি নয়, পরিতৃপ্তির হাসি তাঁর সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে—বিদেশী তীর্থযাত্রীকে তাঁর নিজের গাছের সবজি উপহার দিতে পেরে নিজেই যেন তিনি কৃতার্থ হয়ে গিয়েছেন।

পাঁচ-ছটি ফল পাওয়া গেল—ঝিঙের মত হলেও ঝিঙে বুঝি নয়। অথবা পাহাড়ের ফসল বলেই অত মোটা ওইগুলির খোসা। ছাড়ালে তিন ভাগের ই ভাগই চলে গেল।

তবু তো সবজি। আলুর সঙ্গে মিশাল দিলে বাঙালীর অভ্যস্ত ব্যঞ্জন পাতে পড়বে আমাদের। সেইজন্যই লোভও বেড়ে গেল আমার। শেঠজীর মুখের দিকে চেয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, দোকানে পিঁয়াজ নেই শেঠজী?

পিঁয়াজ!—বলে মুখ তুলে তিনি তাকালেন আমার মুখের দিকে।

ভাবখানা এই যে পিঁয়াজ খেতে চায় এ আবার কেমন যাত্রী! কিন্তু হেসেই উত্তর দিলেন তিনি, দেখছি খুঁজে।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন সেদিন। তিনটি বড় বড় পিঁয়াজ পাওয়া গেল দোকানের একটি ভাঁড়ের মধ্যে। ওজনে এক পোয়ারও বেশী। তীর্থধর্ম সব ভুলে গিয়ে সশব্দে কেদারনাথকে ধন্যবাদ দিলাম।

আর ঠিক সেই সময়েই গঙ্গোত্রী তাঁর তরফের বাজার করবার জন্য উপস্থিত হলেন সেখানে। ইতিমধ্যে স্নান সেরে নিয়েছেন বুঝি—এলো চুল ছড়িয়ে রয়েছে পিঠের উপর। পরিচ্ছন্ন মুখখানি আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

আমাদের আয়োজন দেখে তাঁর সেই মুখে হাসি যেন আর ধরে না। হাসতে হাসতে বললেন তিনি, এত কম কম সব জিনিস নিয়েছেন কেন? কেবল নিজেরাই খাবেন বুঝি? কেমন চাচা তা হলে?

হেসে উত্তর দিলাম, আমরা যে পাষণ্ড বাঙালী! এখানে মাছ পাওয়া যায় না, তাই ভড়ংটুকু রাখতে পেরেছি। তবু তো দেখুন পিঁয়াজ কিনে ফেলেছি এরই মধ্যে।

তাতে কি হয়েছে?

পিঁয়াজ খান আপনি?

খাই না আবার! এখনই তো জিভে জল আসছে আমার।

পরিহাস যে নয় তা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই আমার ভিতরের সব সঙ্কোচ এক নিমেষেই বাষ্প হয়ে উড়ে গেল যেন। অনুনয়ের সুরেই আমি বললাম, তা হলে গঙ্গোত্রীদেবী, আলাদা আর সওদা করবেন না। চাল-ডাল যা দুটি আমি ফুটোতে পারি তাই সবাই একসঙ্গে বসে ভাগ করে খাব।

শুনে হাসি যেন উথলে উঠল গঙ্গোত্রীর দুটি চোখে। তিনি বললেন, রাঁধবে কে? ভাইয়া?

আমি উত্তর দিলাম, না। কাল দু বেলাই বেঁধেছে জিতেন। আজ আমি রাঁধব।

কি রাঁধবেন?

ভাত ডাল আর তরকারি।

একটু কি যেন ভাবলেন গঙ্গোত্রী। তারপর বললেন, আপনার নিমন্ত্রণ চাচা, কবুল করতে পারি—তবে একটি শর্তে।

কি সেটি?

আপনাদের ডাল আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাদের ডালের সঙ্গে এক হাঁড়িতে রাঁধব।

সত্যিই বিস্মিত হয়ে বললাম, তা হলে আর আমার নিমন্ত্রণ আপনারা গ্রহণ করলেন কোথায়? চাচার ঘরে নিমন্ত্রণ খেলে নিজের ঘরে আবার রাঁধতে হবে কেন?

বাঃ রে?—ভাগীরথী কলকল করে উঠল যেন: মা-বেটি সঙ্গে আছে না? আমি পিঁয়াজ খাই বলে উনিও খাবেন নাকি?

অকাট্য যুক্তি মেনে নিতে হল। সুতরাং মানতে হল গঙ্গোত্রীর প্রস্তাবও।

জিতেন দেখি খুশী হয়েছে আমার চেয়েও বেশী। কিন্তু বুঝলাম ক্ষুব্ধও সে হয়েছে আমি রাঁধতে যাব শুনে। একটু অভিমানের সুরেই সে বললে, আপনি মণিদা, রাঁধতে গেলে আমি বসে বসে করব কি?

আমি হেসে উত্তর দিলাম, তুমি গুপ্তকাশীতে কথা দিয়েও কিছুই তো কর নি। এখন মাইয়ার একটু সেবাযত্ন করো গে।

আমার কাজ সোজা। তা আরও সোজা করে দিল আমাদের বাহাদুর। আমার পায়ে সে লুটিয়ে পড়ে আর কি! আর বলে, আমি থাকতে বাবুজী, আপনারা মেহনত করবেন কেন? কাছে থেকে আপনি কেবল দেখিয়ে দিন যাতে দামী জিনিস আমার হাতে নষ্ট না হয়—কাজ যেটুকু তা আমার হাত দুখানাই করুক।

উনান থেকে অনেকটা দূরে তার নিজের কম্বলখানা সে দু ভাঁজ করে পেতে দিল আমার বসবার জন্যে।

রান্না তো হবে কেবল চাট্টি ভাত আর আলু-ঝিঙে-পিঁয়াজের ঘণ্ট। তার দেখবই বা কি আর দেখাবই বা কি! তরকারিটুকু নিজের পছন্দমত কুটে রেখে হাঁড়ির ভাত টিপে দেখি যে তা সুসিদ্ধ হতে আরও সময় নেবে খানিকটা। অগত্যা উঠে গেলাম বারান্দায়।

মুখোমুখি দেখা হিমালয়ের সঙ্গে। শুধু তিনি আর আমি। এমন সুযোগ

বুঝি অধিকাংশ যাত্রীরই হয় না। কিন্তু উদাসী সন্ন্যাসী যে চোখ বুজে ধ্যানে বসেছেন!

তখনও সন্ধ্যা হয় নি। কিন্তু আকাশে সূর্য বা ধরাতে রোদ চোখে পড়ল না। লোকজনও নেই—না পথে, না সামনে কাছিমের পিঠের মত পাহাড়টার উপর; না যাত্রী, না স্থানীয় কোন লোক। শব্দের মধ্যে অনেক নীচে মন্দাকিনীর সেই পরিচিত গর্জনধ্বনি—এত দূরে চাপা গোঙানির মত কানে আসছে। পাখির ডাক শুনব আশা করেছিলাম—এই তো তাদের কলরব করে কুলায় যাবার সময়। কিন্তু কানে এল না তা, চোখেও পড়ল না কোন পাখি। আশ্চর্য, হিমালয়ে পাখি নেই নাকি! হরিদ্বার ছাড়বার পর পাখি আর দেখেছি বলে মনে তো হয় না! নিরাশ হলাম আরও এক কারণে। কেবল দার্জিলিং অঞ্চলে নয়, কেরলের পার্বত্য অঞ্চলেও একটু উপরে উঠে গেলেই হামেশাই চোখে পড়েছে নীচে পেঁজা তুলোর মত হালকা সাদা সাদা মেঘের ভেসে ভেসে লুকোচুরি খেলা। কিন্তু এই হিমালয়ে কই এখন পর্যন্ত একবারও তো মনে হল না যে, মাথার উপরকার চিরপরিচিত আকাশটা কোন সময়ে বুঝি গড়িয়ে নীচে পড়ে গিয়েছে! পাঁচ হাজার ফুটের চেয়েও বেশী উঁচুতে সেই বরাসু গ্রামে চটির দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাঁ দিকে চেয়ে সেদিন অনেক দূর পর্যন্ত মন্দাকিনীর উপত্যকা বেশ দেখতে পেলাম, কিন্তু মেঘ বা মেঘের মত কুয়াশার একটি ফালিও নয়। বৃথাই খুঁজলাম সন্ধ্যার আকাশে বর্ণের সমারোহ। ছাই রঙ সামনের এক ফালি আকাশের। দূরের গাছগুলিও এখন মনে হয় বিবর্ণ।

তবে ওরই মধ্যে একটি চমক। চোখ দুটি আমার দূরে দূরে ফিরছিল বলেই বুঝি এতক্ষণ দেখতে পাই নি আমি। দৃষ্টি গুটিয়ে আনতেই এখন চোখে পড়ল। এই সরু বারান্দারই দক্ষিণ প্রান্তে কম্বল পেতে মুখোমুখি ঘন হয়ে বসেছে জিতেন আর গঙ্গোত্রীর জননী। চুপচাপ বসে থাকা নয়, গল্পে মেতে উঠেছে দুজনে। বৃদ্ধা বসেছেন পথের দিকে মুখ করে, তাই ধোঁয়াটে আলোকে মোটামুটি দেখা যাচ্ছে তাঁর সম্পূর্ণ মুখখানিই। কুঞ্চিত চর্মের ভাঁজে ভাঁজে স্বাভাবিক রেখাগুলি আরও বুঝি গভীর হয়েছে বলেই দূর থেকেও দেখতে পেলাম আমি। করুণ মুখখানি আরও করুণ দেখাচ্ছে যেন। থেকে থেকে তিনি হাত নাড়ছেন, মাথা নাড়ছেন—যা থেকে মনে হয় যেন একটু উত্তেজিত হয়েছেন তিনি।

জিতেনও কথা বলছে দেখলাম, কিন্তু শুনছেই সে বেশী মনে হল যেন থমথমে দেখাচ্ছে তার মুখখানিও।

ইচ্ছে ছিল যে ওদের কাছে গিয়েই বসব যতক্ষণ উনানের উপর আমার ভাত সেদ্ধ না হয়। কিন্তু ওরা তন্ময় হয়ে আলাপ করছে বুঝে দমন করলাম আমার ইচ্ছাটি। একটু ইতস্ততঃ করবার পর ঢুকলাম গিয়ে গঙ্গোত্রীর রান্নাঘরেই।

রুটি গড়ছিলেন গঙ্গোত্রী। আমাকে দেখে আটার তালসুদ্ধ থালাখানি সরিয়ে রেখে কুণ্ঠিতস্বরে তিনি বললেন, ডাল নিয়ে বিপদে পড়ে গিয়েছি চাচা।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন ?

সেদ্ধ হচ্ছে না।—উত্তর দিলেন গঙ্গোত্রী : অস্বাভাবিক অবশ্য নয়। এসব জায়গার জল এমন যে ডাল তাতে পড়লেই যেন লোহা হয়ে যায়। যত উপরে যাব ততই এই ঝামেলা বাড়বে। অথচ কি যে ভুল হয়ে গেল আমার— সোডার শিশিটাই ফেলে এলাম।

আমি হেসে বললাম, ডাল তেমন সেদ্ধ না হলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। আমরা আধসেদ্ধ ডালই বেশ খেতে পারব।

আপনারা খেতে পারলেও আমি পাতে দেব কেমন করে ?

পরিচিত স্বর। কিন্তু এ পথে তো ওই স্বর শোনবার আশা ছিল না ! বুকের ভিতরটা আবার দুলে উঠল আমার। এবং সেই জন্যই শব্দ করে হেসে উঠে আমি বললাম, তা হলেও ঘাবড়াবার কারণ নেই। আমার তরকারি তো এখন পর্যন্ত চাপেই নি উনানের উপর। এই জলেই তো ভাত সেদ্ধ হবে। দেরি হবে আমারও। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে রাঁধুন।

গুণ হোক, দোষ হোক—তা বুঝি ওই জলেরই। আমার ক্ষেত্রে মা-মনসার সঙ্গে ধূপের গন্ধ হয়ে জুটেছে সেদ্ধ চাল। দ্বিতীয়বার সেদ্ধ হতে বুঝি ঘোর আপত্তি তার। সে রাত্রে খেতে বসলাম আমরা আটটায়।

অত তন্ময় হয়ে কি আলাপ করছিল জিতেন গঙ্গোত্রীর মায়ের সঙ্গে ! খাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করবার উপায় ছিল না। রাত্রে শোবার পর জিজ্ঞাসা করবার দরকারই হল না।

জিতেনই আমাকে জিজ্ঞাসা করল, বলতে পারেন মণিদা, গঙ্গোত্রীর বিয়ে হয়েছে কি না ?

প্রশ্নটি অদ্ভুত বলেই হেসে উত্তর দিলাম আমি, না। তবে অনুমান করি যে বিয়ে হয় নি।

জিতেন বললে, আমার অনুমানমাত্র নয়, সঠিক জেনেছি আমি। গঙ্গোত্রীর বিয়ে হয় নি।

একটু চুপ করে থেকে আমি বললাম, তখন ওঁর মায়ের সঙ্গে তোমার এই সব কথাই হচ্ছিল বুঝি?

কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে স্বীকার করল জিতেন। শুনে ক্ষুণ্ণকণ্ঠে আমি বললাম, ভাল কর নি জিতেন। ভিন্ন দেশ ভিন্ন সমাজের লোক আমরা। ওঁদের সঙ্গে পথের পরিচয় আমাদের। এইটুকু পরিচয়ের সূত্রে কি বয়স্থা মেয়ের বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করতে আছে?

যেমন তার স্বভাব—আমার আপত্তি যেন তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিল জিতেন। সে বললে, মেয়ের বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করেছি মেয়ের মাকে, আর কাউকে তো নয়। আর আপনার মত সাহেবী ও শহুরে মনই নয় বুড়ী মাসীমার। কথাটা আমি তুলতেই তিনি গড়গড় করে বলে গেলেন।

কিন্তু শুনে লাভটা কি হল তোমার?

যা জানতাম না তা জানলাম। শুধু জানাটাই তো একটা মস্ত লাভ।

তর্ক নিরর্থক বুঝে আর উত্তর দিলাম না। কিন্তু জিতেনের বুঝি পেট ফুলছিল। একটু পরেই সে আবার জিজ্ঞাসা করল, বলতে পারেন মণিদা, ওই দক্ষিণী সাধুকে মাসীমা তখন অমনভাবে তাড়া করেছিলেন কেন?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, তাড়া আবার উনি কখন করলেন তাঁকে?

জিতেন বললে, ওই যে সাধুকে ঘরে ফিরে গিয়ে বিয়ে-থা করতে বললেন—ওকেই তাড়া করা বলে। ওর কারণটা কি জানেন?

না।

আমি জানি। মাসীমার মনে অনেক ক্ষোভ জমে রয়েছে। কেন না, ওঁর স্বামী সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন।

অসম্ভব অবশ্য নয়, তবু চমকে উঠলাম যে দুটি সদ্য-পরিচিতা নারীকে এতক্ষণ পথের সাথী হিসাবে কেবলই ভাল লেগেছে, এখন তাঁদের জন্য অকস্মাৎ অনেকখানি যেন সমবেদনা অনুভব করলাম। উৎকণ্ঠিত হয়ে বললাম, উনি নিজে বললেন তোমাকে এ কথা?

হ্যাঁ।—জিতেন উত্তর দিল: আর বললেন তাঁর স্বামীর বিবাগী হবার কারণও—তা ওই গঙ্গোত্রী।

কি!—বলতে বলতে উঠেই বসলাম আমি।

অন্ধকারেও বুঝতে পেরে জিতেন হাসল। হাসতে হাসতেই সে বললে, আমায় ভুষছিলেন মণিদা। এখন বুঝুন, আপনার মনেও কৌতূহল আছে কিনা।

মন্তব্যের উত্তর না দিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, গঙ্গোত্রীর কথা কি বললেন উনি?

তা খুব রসিয়েই বলেছেন।—উত্তর দিল জিতেন: বললেন যে ও মেয়ে দেখতে-শুনতে অত ভাল হলে কি হবে, বড্ড গোঁ ওই গঙ্গোত্রীর। ও নাকি ভাঙবে, তবু মচকাবে না।

মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আমি। এ কোন অপবাদ নয়। ঠিক এইরকমই আমারও মনে হয়েছিল। তবে সঙ্গে সঙ্গেই আমার জানবার ইচ্ছাও অনেক বেড়ে গেল। জিতেন আরও হাসবে বুঝেও প্রায় অনুনয়ের স্বরেই তাকে আমি বললাম, যা সে জানতে পেরেছে তা সব খুলে বলতে।

তার শোনা কাহিনীর পুনরাবৃত্তি শুনলাম জিতেনের মুখে। তেমন দীর্ঘ বা অসাধারণ কাহিনী নয়, তবু তখন মনে হয়েছিল যে বুঝি কাহিনীই শুনছি।

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পরিবার গঙ্গোত্রীদের। নেপালী হয়েও উত্তর-প্রদেশের অধিবাসী। প্রাদেশিক সরকারের পি-ডব্লিউ-ডি'র ওভারসিয়ার গঙ্গোত্রীর পিতা। ইংরেজের আমল থেকে সরকারী কর্মচারী তিনি। রাজভক্তি তাঁর একালে দেশের রাজা না থাকলেও সেকালের মতই খাঁটি ছিল। তেমনি গভীর ছিল তাঁর ধর্মনিষ্ঠা। সরকারের যে কাহন তিনি নিতেন তাঁর বেতন হিসাবে, তা কড়ায়-গণ্ডায় উসুল দিতেন সরকারী কর্তব্য স্বয়ং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করে। সরকারী কাজের বাইরে যে বে-সরকারী জগৎটাতে একেবারে ভিন্ন জাতের ভাঙা-গড়ার কাজ চলছে সে জগতের কোন খোঁজই রাখতেন না তিনি। সরকারী কাজ শেষ হলেই ঢুকে যেতেন তিনি তাঁর নিজের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যে—যার একটা কোণে স্ত্রী আর ওই একমাত্র সন্তান গঙ্গোত্রী, আর বাকি সবটাই অধিকার করে থাকতেন পশুপতিনাথ। ছত্রিশ জাতের কুলিকামিন

নিয়ে যাঁর কারবার এবং জলাজঙ্গল পাহাড়-পর্বতেই বেশীর ভাগ কাজ, তাঁর সন্ধ্যা-আহ্নিক কোনদিন একবেলাও বাদ যেত না। মাথার চুলে পাক ধরবার পূর্বেই দীক্ষা নিয়েছিলেন তিনি কাশীর এক সন্ন্যাসীর কাছে। তার পর থেকে প্রায়ই স্ত্রীকে তিনি বলতেন যে গঙ্গোত্রীর বিয়েটা দিয়ে দিতে পারলেই চাকরি ছেড়ে বানপ্রস্থ নেবেন তিনি।

গঙ্গোত্রীর জন্য মোটামুটি সম্বন্ধও স্থির করে রেখেছিলেন তাঁর বাবা। নেপাল-দরবারে উঁচুস্তরের ওমরাহ একজনের একমাত্র পুত্রের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা একরকম পাকাই হয়ে ছিল। হীরের টুকরো ছেলে নাকি সে। বংশ ও অর্থকৌলীন্যের উপরেও বিদ্যা ছিল তার। বি. এ. পাস ছেলে। নেপাল সরকারেরই চাকুরে। বাকি ছিল তার কেবল চাকরিতে পাকা হওয়া। সেইটুকুর জন্য বিয়েতে দেরি হচ্ছিল বলেই ম্যাট্রিক পাস গঙ্গোত্রীকে তার বাবা আবার কলেজে ভর্ত্তি করে দিয়েছিলেন।

আদুরে মেয়ে গঙ্গোত্রী। বাপের মনে পশুপতিনাথের ঠিক নীচেই বুঝি তার স্থান। মেয়ের গুণ মুখে ধরত না ওভারসিয়ার সাহেবের। আর গুণও ছিল বইকি গঙ্গোত্রীর। যেমন ঘরের কাজে, তেমনি লেখাপড়াতেও মনোযোগ তার। কলেজের শিক্ষিকারা বাড়িতে এসে মায়ের কাছে প্রশংসা করতেন তাঁর মেয়ের। বিশেষ করে বলতেন তাঁরা কলেজের বিতর্ক সভায় গঙ্গোত্রীর কৃতিত্বের কথা—তার বক্তৃতায় নাকি আগুন ছুটত। তার উপর গঙ্গোত্রীর ছিল দশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বার ঝোঁক। সুতরাং ছোট শহর আলমোড়াতে ছড়িয়ে পড়েছিল তার সুখ্যাতি, জড়িয়ে পড়েছিল সে নিজে স্থানীয় নানাবিধ জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে।

সেই গঙ্গোত্রী—একদিন কলেজ থেকে বাড়িতে ফিরে এল না সে। রাত্রে চেনাজানা সব জায়গায় খোঁজ করেও সন্ধান পাওয়া গেল না তার। তিন দিন পর ওভারসিয়ার সাহেবের কাছে খবর এল যে কাঠমাণ্ডুর পথে একদল বিদ্রোহীর সঙ্গে গঙ্গোত্রীও নেপাল-সরকারের পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে।

ওই যে ভাঙল গঙ্গোত্রীর জননীর সংসার তার পর তা আর জোড়া লাগে নি।

গঙ্গোত্রীর বাবা ছাড়িয়ে এনেছিলেন মেয়েকে। এনেই তার বিয়ের আয়োজন শুরু করেছিলেন। পাত্র সেই নেপাল-দরবারের ওমরাহের চাকুরে পুত্র। রাণাশাহীর পতন হয় নি তখনও। আর পতন হলেও ছেলেটির

চাকরি মারে কে! নিজের দৃষ্টান্ত থেকেই তো ওভারসিয়ার সাহেব জানেন যে, রাষ্ট্রবিপ্লব সম্পূর্ণ ও সার্থক হলেও সরকারী চাকুরিয়ার চাকরি যায় না।

কিন্তু বেঁকে বসল গঙ্গোত্রী স্বয়ং। অত যে বাপসোহাগী মেয়ে, সেও সেদিন বাপের মুখের উপরেই স্পষ্ট বলে বসল যে মুক্তিফৌজের দলে নাম না লিখিয়ে যে নেপালী যুবক ওই যুগে সরকারী কাজ নিয়েছে, তার গলায় কিছুতেই সে বরমাল্য দেবে না।

স্তম্ভিত পিতা রুদ্ধনিশ্বাসে বললেন, কিন্তু মা, আমি যে তাদের কথা দিয়েছি।

গঙ্গোত্রীর উত্তর আগের চেয়েও স্পষ্ট: তা হলে বাবা, তোমার কথা রাখবার জন্যে আমার দেহটাই তাদের হাতে তুমি তুলে দিতে পারবে—তার আগে আমার প্রাণটা আমি নিবেদন করে দেব যাকে আমি কথা দিয়েছি।

তার মাকে জানিয়েছিল গঙ্গোত্রী তার দয়িতের পরিচয়। বিদ্রোহী দলের নীচের স্তরের একজন নেতা সে যুবক—যার সঙ্গে মাস তিনেক আগে নিজেও সে একটি অভিযানে যোগ দিয়ে পুলিসের হাতে ধরা পড়েছিল। লক্ষ্ণৌতে মেডিকেল কলেজের ছাত্র সে, কিন্তু তখন নেপালের জেলে বিচারাধীন কয়েদী।

খোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন ওভারসিয়ার সাহেব যে চালচুলো নেই সে ছেলের। ওর চেয়েও গুরুতর অযোগ্যতা তার—সে জাতিতে বৈশ্য। এই সব আপত্তি বাবার মুখ থেকে শোনবার পর গঙ্গোত্রী খুব শান্ত দৃঢ় স্বরে উত্তর দিয়েছিল, তোমার কথা অমান্য করে আমি তাকে বিয়ে করব না বাবা—কথা দিচ্ছি তোমায়। কিন্তু সেই সঙ্গেই আর একটি কথা আছে আমার—আমি মোটে বিয়ে করব না।

বছর দশেক আগের ঘটনা এ সব। পিতা ও পুত্রীর মধ্যে তখন যে সন্ধি হয়েছিল তার কোন শর্ত কোন পক্ষই ভঙ্গ করে নি। ওভারসিয়ার সাহেব ফিরে গিয়েছিলেন তাঁর কাজ আর পুজোর মধ্যে, গঙ্গোত্রী ফিরে গিয়েছিল তার কলেজে। কিন্তু কলেজের পড়া শেষ করবার পর গঙ্গোত্রী যখন চাকরি খুঁজতে শুরু করল তখন দ্বিতীয় বার ধ্যান ভাঙল তার বাবার। একবার লক্ষ্ণৌ থেকে ঘুরে এলেন তিনি। এসে স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে আবার গেলেন পশুপতিনাথের মন্দিরে পুজো দিতে। আলমোড়াতে ফিরে এসে মায়ের সামনে মেয়ের মাথার উপর ডান হাতখানি রেখে ওভারসিয়ার সাহেব বললেন, অসবর্ণ বিয়েতে আমার যে আপত্তি ছিল তা আমি প্রত্যাহার করলাম মা। ছেলেটিকে আমি দেখে

[illegible] [illegible]ই মেডিকেল [illegible] শেষ পরীক্ষা দেবে সে। তারপর বিয়েতে তো [illegible] দুজনেরই মত যদি হয় তবে আমার আশীর্বাদও তোমরা পাবে।

পরদিন কাজের নাম করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ওভারসিয়ার সাহেব। আর ফিরে আসেন নি। গঙ্গোত্রীর জননী জিতেনকে বলেছেন যে মনের দুঃখে সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন তিনি—হয়তো পরিব্রাজক হয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

একটি প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করি নি। তন্ময় হয়ে শুনছিলাম জিতেনের মুখে গঙ্গোত্রীর পারিবারিক ইতিহাস। শুনছিলাম বলাটা ঠিক হল না—বুঝি মনে মনে এতক্ষণ বিচরণ করছিলাম কখনও আলমোড়া, কখনও কাঠমাণ্ডু, কখনও বা লক্ষ্ণৌ শহরে। আমার শ্রবণেন্দ্রিয় সজাগ থাকলে এতক্ষণ বাইরে বৃষ্টিপাতের অমন মধুর ঝমঝম আওয়াজ কানে আসে নি কেন! এতক্ষণ পর মনে পড়ল যে আমি কেদারনাথের পথে বরাসু গ্রামে একটি চটিতে শুয়ে আছি। তবে পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হবার সঙ্গে সঙ্গেই শোনা কাহিনীর অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধেও সজাগ হয়ে উঠল আমার মন। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম, তা হলে গঙ্গোত্রী বিয়ে করলেন না কেন? তাঁর বাবা যখন তাঁকে অনুমতি দিয়েই গিয়েছেন।

উত্তরে জিতেন বললে, মাসীমাও তো সেই দুঃখই করছেন। কত বার নাকি উনি অনুরোধ করেছেন মেয়েকে, কিন্তু গঙ্গোত্রী রাজী হন নি। সেই ছেলেটিও নাকি অনেক বার ওদের আলমোড়ার বাড়িতে এসেছে। গঙ্গোত্রী অভ্যর্থনা করেছেন তাকে, মিশেছেনও খুব তার সঙ্গে। তবু দুজনের বিয়ে হয় নি।

একটু থেমে জিতেন আবার বললে, সেই পুরনো কথা মণিদা, মনে পড়ছে আমার—স্ত্রীয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।

বলেই সশব্দে হেসে উঠল সে।

হাসিতে যোগ দিতে পারলাম না আমি। বাইরে অত হাসি-খুশী যে মেয়েটি—বুকের মধ্যে কি যে গভীর দুঃখ সে বহন করে বেড়াচ্ছে তাই কিছু কিছু অনুমান করে ততক্ষণে মনটা আমার মুষড়ে পড়েছে।

ঘুমও আসে না চোখে। বুকের মধ্যে কি একটা কাঁটা যেন খচখচ করছে।

মৈখণ্ডা নাম-করা চটি। কিন্তু চটির চেয়েও তীর্থমাহাত্ম্য বেশী ওই স্থানের। মহিষমর্দিনীর পীঠস্থান এটি। মৈ মানে মহিষ। মহিষাসুরকে এখানেই নাকি দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন দেবী ভগবতী। তারপর সে কি উল্লাস দেবীর! আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তখন দোলায় দোল খেয়েছিলেন তিনি। দোলা এখনও আছে মন্দিরের প্রাঙ্গণে। একালের যাত্রীরাও কিছু কিছু দক্ষিণা দিয়ে দোল খায় তাতে।

কিন্তু যে মহিষ মৈখণ্ডাতে অসুর, সেই মহিষই কেদারনাথে গিয়ে দেবতা হলেন কেমন করে? শ্রীকেদারনাথের বিগ্রহই তো শুনেছি বিশাল আকারের একটি মহিষের পশ্চাদ্দেশ।

গল্প শুনেছিলাম পাণ্ডার মুখে। অবিশ্বাস্য গল্প। দেবতার অদ্ভুত লীলা, না, মানুষের উদ্ভট কল্পনা, ভেবে পাই নে। কাশীর বিশ্বনাথকে ধরবার জন্য দুর্দান্ত পাণ্ডবেরা গুপ্তকাশী পর্যন্ত ধাওয়া করেছে দেখে বিশ্বনাথ সেখান থেকে আবার ছুটলেন উত্তর দিকে। অনেক পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করবার পর কেদারনাথের মালভূমিতে গিয়ে পৌছলেন তিনি। কিন্তু নাছোড়বান্দা পঞ্চ-পাণ্ডব। তাঁরাও পিছু পিছু গিয়ে উপস্থিত হলেন সেখানে। এইবার ফাঁদে পড়লেন মহেশ্বর। উত্তর দিকে আরও উঁচু পাহাড়—তা আবার বরফে ঢাকা। অত পথ ছুটে আসবার পর ক্লান্তদেহে আর তাঁর সাধ্য নেই ওই আকাশসমান উঁচু পাহাড়ের প্রাচীর অতিক্রম করবার। সুতরাং হাল ছেড়ে দিয়ে মহিষের আকার ধারণ করে ওই জন্তুদের একটি দলের মধ্যে চলে গেলেন আত্মগোপন করবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই। পাণ্ডবেরা ছদ্মবেশী মহেশ্বরকে চিনে ফেলেছেন। 'ধর' 'ধর' করে ছুটে এলেন পাঁচ ভাই পাণ্ডব। তখন সামনেই একটি সুড়ঙ্গ দেখতে পেয়ে সেই পথে পাতালে পালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে মহিষরূপী মহাদেব ঢুকে গেলেন সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে। তাতেও বাধা পড়ল। মহিষের মাথার দিকটা সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকতে না ঢুকতেই মহাবীর মধ্যম পাণ্ডব ছুটে এসে দুই হাতে তাঁর পাছাটা ধরে ফেলে গতিরোধ করলেন তাঁর। অগত্যা হার মানতে হল বিশ্বনাথকে। পাণ্ডবদের বর দিলেন তিনি। মহিষরূপী শিবদেহের যে অংশটুকু তখন পর্যন্তও মাটির উপরে ছিল বলে ভীম তা ধরতে পেরেছিলেন, তা আপাততঃ পাণ্ডবদের ও ভবিষ্যতে সকল ভক্তের

[illegible] কেদারনাথ [illegible] ...নাতেই চিরস্থায়ী হয়ে থেকে গেল। কাশীর বিশ্বনাথ এমনি এক দুর্দৈবের ভিতর দিয়ে উত্তরাখণ্ডে শ্রীকেদারেশ্বর হলেন।

কেদারখণ্ড স্কন্দপুরাণের পবিত্র কাহিনী। তবু আমি নিজে কেদারনাথের যাত্রী হয়েও শুনে হাসি গোপন করতে পারি নি। তারপর ওই গল্প ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু মৈখণ্ডা পার হবার পর তুচ্ছ মহিষের এ-হেন বিপুল গৌরবলাভের তাৎপর্য কিছুটা যেন বুঝতে পারলাম আমি।

মহিষকে ভুলে থাকবার উপায় নেই এই উত্তরাখণ্ডে।

কলকাতায় টাকা টাকা সের দরে কিনেও খাঁটি দুধ পাই নে আমরা। আর এখানে আট আনা সের দরে জাল দেওয়া খাঁটি ঘন দুধ পাচ্ছি। সরবরাহ অঢেল। আকার পরিবর্তন করেও দুধই পাতে আসে ঘুরে-ফিরে। জিতেনের পেটে দুধ সয় না, সে পেড়া খাচ্ছে মুঠো মুঠো। দইও খোঁজ করলে পাওয়া যায় কোন কোন চটিতে। চিনি-পাতা দই না হলেও মিষ্টি আস্বাদ তার। একেবারে খাঁটি জিনিস। জল মিশিয়ে দুধের, সুতরাং লাভেরও পরিমাণ যে বাড়ানো যায় তা যেন জানেই না এদেশের লোকেরা।

তবে মোষের দুধই সর্বত্র। গরুর দুধ খুঁজেছিলাম, কিন্তু কোথাও পাই নি।

পথ চলতে চলতে সেই মোষ দেখছি দলে দলে। বিপরীত দিক থেকে আসছে—মানে নেমে আসছে উপর থেকে। লক্ষ্য না করে উপায় নেই। স্ত্রীপুত্রপরিজন নিয়ে বেশ বড় বড় এক একটি যূথ। ওই সরু আঁকা-বাঁকা পথে ওদের মুখোমুখি হলেই ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে। আত্মরক্ষার জন্য খদের মধ্যে নেমে যেতে ভরসা হয় না, সুতরাং প্রাণের ভয়ে পাহাড়ের গা ঘেঁষে রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি যতক্ষণ মোষের পাল আমাকে অতিক্রম করে না যায়।

সংখ্যায় এত যেখানে মহিষ এবং জীবনধারণের জন্য এত যার প্রয়োজন সেখানে সংস্কৃতির কুলুঙ্গিতে উঁচু একটি আসন পাবে বইকি ওই বিশেষ জন্তুটি।

তবে চলন্ত মোষগুলির অধিকাংশই মনে হয় যে স্থানীয় নয়। খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে ওরাও এক হিসাবে কেদারনাথের যাত্রী। যাযাবর ওদের মালিকেরা, ওরাও তাই। যাত্রীর মরসুম শুরু হলেই দুধের চাহিদা বাড়ে এই পার্বত্য-অঞ্চলে। তখন মোষের পাল নিয়ে উপরে আসে ওদের পালকেরা—

যেমন নানারকম সওদা নিয়ে দোকান খুলতে আসে চটিওয়ালারা। যাত্রী চলাচল যতদিন থাকে ততদিন ওরাও থাকে এখানে। গরুর মত বাবু-পশু তো আর নয়! সুতরাং তেমন অসুবিধা হয় না ওদের। বনে বনে বিচরণ করে খায়, যেখানে-সেখানে শুয়ে রাত কাটায়। ওরাই প্রয়োজনীয় ও কখনও বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুধ সরবরাহ করে চটিগুলিতে। তারপর যাত্রীর মরসুম যখন শেষ হয়ে যায়, বরফ পড়বার সময় যখন এগিয়ে আসতে থাকে, তখন ওরাও উপর থেকে ক্রমেই নীচে নামতে থাকে। হরিদ্বার পার হয়েও আরও নীচে চলে যায়—কখনও কখনও বাংলাদেশ পর্যন্ত।

আমাদের ওদিকেও তো মাঝে মাঝে দেখেছি। শহরের উপান্তে বা পল্লীর সীমানার বাইরে—দূরপাল্লার সড়কের ধারে ধারে। আগের দিন বিকেলেই হয়তো দেখে গিয়েছি ফাঁকা মাঠ, কিন্তু পরদিন সকালে দেখেছি পঙ্গপালের মত পশুরা এসে সে মাঠ ছেয়ে ফেলেছে। দেখেছি পালে পালে মোষ, সঙ্গে কয়েকটি টাট্টুঘোড়া বা খচ্চর আর অবশ্যই দু-একটি ভীষণ-দর্শন কুকুর। পশুপাল থেকে একটু দূরে দেখেছি দু-চারটি তাঁবু পড়েছে এবং তার ভিতরে বসে আছে বা বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিচিত্র আকৃতি ও বিচিত্র সাজের বিভিন্ন বয়সের কিছুসংখ্যক স্ত্রী-পুরুষ। শুনেছি যে তারা যাযাবর—পূর্ববঙ্গে সম্পূর্ণ ঘরসংসার ছোট একটি ডিঙি নৌকোর মধ্যে পুরে নদীনালায় ভেসে বেড়ায় যে বেদেরা তাদেরই সগোত্র স্থলপথের অসভ্য বর্বর পশুপালক।

দীর্ঘ জীবনে কতবার কত জায়গাতেই তো চোখে পড়েছে এই যাযাবর এবং তাদের পশুপাল। তবে দেখা যাকে বলে তা হল এই প্রথম।

গভীর বনের ভিতর দিয়ে একা একা চলছিলাম। ওই দুপুরবেলাতেও মনে হচ্ছিল যেন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। পায়ের দিকে চেয়েই চলছিলাম। হঠাৎ মনে হল যে ফিকে আঁধার বুঝি গভীর কালো হয়ে উঠল।

পথের উপরেই শুয়ে আছে কয়েকটি মোষ; কয়েকটি আবার একটু উপরে পাহাড়ের কোলে। একটু যেখানে বেঁকে গিয়েছে পথটা সেখানেই এই কাণ্ড। আবার ওই বাঁকের মুখেই পাহাড়ের গা ঘেঁষে উঠেছে প্রকাণ্ড একটি মহীরুহ। গাছটির ওপারে কি যে আছে তা বোধ করি চনচনে রোদ থাকলেও সঠিক বোঝা যেত না।

একটি মোষের গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিয়েছিলাম।

[illegible] [illegible]নের ওইরকম বিরল [illegible] ছায়ামূর্তির মত সেই লোকটি আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

সে যে ছায়া নয়, আমারই মত রক্ত-মাংসের মানুষ তা ঠিক বুঝতে বুঝি পুরো একটি মিনিটই লেগেছিল আমার। বেঁটেখাটো মানুষটি। পরনে কম্বলের পাতলুন আর জওহর-কোট ধাঁচের একটি জামা। শ'খানেক বুঝি তালি এক-একটিতে। বৃষ্টির জলে ছাড়া আর কোনরকমে কখনও যে কাচা হয়েছে ওই পোশাক তা মনে হয় না। তবে লোকটির মুখের রঙ ফরসা, গঠনও মন্দ নয়। মাথার চুল তার ছোট ছোট করে ছাঁটা—যেমন আর সকলেরও দেখছি উত্তরাখণ্ডে প্রবেশ করবার পর থেকেই। কিন্তু যা আর কোন লোকের মুখেই দেখি নি তাই দেখলাম এ লোকটির মুখে—তার চিবুকে ছোটমত মুসলমানী নূর একটি।

কত তার বয়স কে জানে! কিন্তু মুখখানি কাঁচা। সেই মুখে একগাল হেসে ডান হাতখানি আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে বললে, জরিবুটি লেওগে বাবু?

গোড়াতে বিহ্বল হয়েছিলাম, এবার বিরক্ত হয়ে বললাম, কি হবে ওতে?

আরও যেন মোলায়েম স্বরে উত্তর দিল লোকটি: সাপের বিষের ওষুধ বাবু। কালকেউটের বিষও জল করে দিতে পারে।

বুঝলাম যে পাকা ক্যানভাসার লোকটি। হেসে বললাম, দরকার নেই।—বলেই ওকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম আমি।

লোকটি তবুও বললে, মাত্র আট আনা দাম বাবুজী।

আমি বললাম, বিনে পয়সায় পেলেও চাই নে।

শুনে কেমন অবস্থা হল লোকটির মুখের তাই দেখবার জন্য মুখ ফেরাতে চেষ্টা করেছিলাম। বাঁ দিকে পাহাড়, সেই দিক দিয়ে মুখ ফিরবে আমার। কিন্তু অর্ধবৃত্তের অর্ধেকটা পার হতে না হতেই আমার চোখ দুটির সঙ্গে সঙ্গে মাথাটাও নিশ্চল হয়ে গেল।

আলোয় আলো হয়ে রয়েছে পাহাড়ের কোল।

গাছের গুঁড়িটা এতক্ষণ আড়াল করেছিল ভৈসালের সংসার। ছোট একটি তাঁবু পড়েছে গাছের গা ঘেঁষে। কাছাকাছি ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে কয়েকটি ছোট-বড় কলাই-করা হাঁড়ি-কড়া। এতক্ষণ শুধু মোষই দেখছিলাম, এখন দেখলাম গলায় বকলস আঁটা বাঘের মত বড় বড় দুটি কুকুর। শিকল

াদয়ে বাধা আছে তাবুর খুঁটির সঙ্গে। তার একটি কুকুরের সামনে কানা-উঁচু বড় একটি থালা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক সুন্দরী যুবতী।

পরিধানে তার কত বর্ণের শত তালি দেওয়া বিচিত্র ঘাগরা। পীনোন্নত বক্ষে আঁটসাঁট কাঁচুলি। ছোট একখানি ওড়নাও দুই কাঁধের উপর দিয়ে পিঠে গিয়ে পড়েছে। তবে ঢাকা পড়ে নি দেহের অনেকখানিই। দুটি পায়েরই পাতা থেকে প্রায় হাঁটু পর্যন্তই চোখে পড়ে; চোখে পড়ে অনাবৃত সুডৌল দুখানি হাত, সাপের মত লকলকে দীর্ঘ একটি বেণী, কাঁচাসোনা রঙের মুখখানিতে টিকলো নাক আর দুটি টানা টানা নীল কালো চোখ।

ঘাড় বেঁকিয়ে সেই চোখ দুটি মেলে মেয়েটিও তাকিয়েছে আমার দিকে। বিজলীর ঝিলিক সেই দৃষ্টিতে।

কিন্তু আমার হৃদপিণ্ডটি হঠাৎ লাফিয়ে উঠেই তখনকার মত একেবারে যে থেমে গেল তা অন্য কারণে। হঠাৎ যেন বাঘের গর্জন কানে এল আমার। মেয়েটির উপর আমার চোখ গিয়ে পড়েছে বলেই ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠেছে প্রভুভক্ত একটি কুকু র

তবে পরের মুহূর্তেই ভয় কেটে গেল আমার। মেয়েটি দেখি তার বাঁ হাতখানি কুকুরটির মাথার উপর রেখে বললে, চোপরহো—যাত্রী হ্যায়।

ফিরে আমার দিকে চেয়ে সে বললে, ঘাবড়াও মত।

তৎক্ষণাৎ গর্জন থেমে গেল কুকুরের। আশ্বস্ত হলাম আমি এবং আরও একটু বেশী। এগিয়ে যাবার জন্য পা বাড়িয়েও পুনরায় থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম মেয়েটিকে, কুত্তা তুমহারা হ্যায়?

হ্যা।—উত্তর দিল মেয়েটি।

ভৈস?

স—ব। ওহভী।

মেয়েটির চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে চেয়ে দেখি যে, সেই নুরওয়ালা যুবকটি কখন যেন নিঃশব্দে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মুচকি মুচকি হাসছে সেও।

মেয়েটিই আবার বললে, মেরা মরদ।

লোকটির মুখে হাসি দেখে আমি আশ্বস্ত হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, তুমলোগ ক্যা করতে হো?

মেয়েটিই উত্তর দিল আমারই মত অশুদ্ধ হিন্দীতে: ভৈস চরাতা, দুধ বেচতা।

বলছে আর হাসছে সে। তার যৌবনপুষ্পিত দেহের লাবণ্যের মতই সতেজ প্রাণের অকারণের খুশীও যেন উপচে পড়ছে তার টুকটুকে লাল দুটি ওষ্ঠ ও ঝকঝকে চোখ দুটি থেকে। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে মুক্তার মত কটি দাঁত।

আমি একটি হাঁড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে জিজ্ঞাসা করলাম, ক্যা হ্যায় ইসমে? দুং

হ্যা -া -া—মেয়েটি উত্তর দিল।

একটি বর্ণের তো উত্তর। কিন্তু 'আ'কারটিকে টেনে নিয়ে নিয়ে কথাটা সম্পূর্ণ করতে লাগছে তার প্রায় এক মিনিট। হেসে কথা বলার মত টেনে টেনে কথা বলাও ওই মেয়েটির বুঝি স্বভাব।

এতক্ষণ কুকুরটি একদৃষ্টে আমার দিকেই তাকিয়েছিল, এখন অধৈর্য হয়ে উঠল সেটি। গোঁ গোঁ করল কয়েকবার, সঙ্গে সঙ্গে পিছনের পা দুটিতে ভর দিয়ে যতটা সম্ভব খাড়া হয়ে সামনের পা দুটি দিয়ে আঁচড়াতে লাগল মেয়েটির ঘাঘরাতে। দেখে হাসতে হাসতে মেয়েটি তার হাতের থালাখানি মাটিতে নামিয়ে রাখল কুকুরটির মুখের কাছে। এখন চোখে পড়ল আমার যে থালাভরা সাদা তরল কি একটা জিনিস রয়েছে। মুখের সামনে পাওয়া মাত্রই কুকুরটি চুকচুক করে খেতে আরম্ভ করল তা।

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমি, ক্যা হ্যায় থালিমে?

মঠ্ঠা—উত্তর দিল মেয়েটি।

মানে ঘোল। লোভনীয় পানীয় আমার। একটু লুব্ধ হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম আমি, কৌন বনায়া হ্যায়?

সে উত্তর দিল, হম—অপনা হাতসে বনায়া।

বেশ যেন গর্বিত কণ্ঠস্বর তার। শুনে হেসে জিজ্ঞাসা করলাম আমি, মঠ্ঠা ঔর হ্যায়?

সে উত্তর দিল, হ্যায়।

পিলাওগে হমকো?

জরুর।—উত্তর দিল মেয়েটি, কিন্তু পরমুহূর্তেই সে হাসি থামিয়ে গম্ভীর স্বরে আবার বললে, চার আনা সের।

আমি বললাম, দো।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পেতল কি তামার একটি ঘটি ওই বড় বড় হাঁড়িগুলির

একটির মধ্যে ডুবিয়ে তুলে পূর্ণ এক ঘটি ঘোল নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল সে।

বেশ বুঝতে পারলাম যে হাঁড়িভরা ঘোলের মধ্যে প্রায় কনুই পর্যন্ত ডুবিয়ে ঘটিটি পূর্ণ করেছে সে। তার সুগোল সুডৌল সোনালী রঙের হাতখানি থেকে বিন্দু বিন্দু ঘোল তখনও ঝরে পড়ছে। অনিবার্য রূপেই এখানে-সেখানে লেগে রয়েছে ফেনার মত হালকা মাখন; ডান হাতের ছুটি আঙুলের অনেকখানি তখনও ডুবে রয়েছে ঘটিভরা ঘোলের মধ্যে।

এ ঘোল মুখে দেওয়া যায় না। পকেট থেকে তাড়াতাড়ি একটি সিকি বের করে মেয়েটির প্রসারিত বাঁ হাতের তেলোতে টুপ করে ফেলে দিলাম সেটি। তারপর হেসে বললাম, তুমহী পী লো বেটি। হম অ্যায়সা হী কহা থা।

তুম নহী পিওগে?—বিস্মিত জিজ্ঞাসা মেয়েটির।

মুখ ফুটে 'না' বলতে পারলাম না, শুধু ঘাড় নেড়ে অস্বীকার করলাম।

অসম্ভব ওর হাত থেকে ঘোল নিয়ে খাওয়া। বেশ কাছে থেকেই দেখছি এখন ওকে। ওর পরিধেয় কেবল যে জরাজীর্ণ তাই নয়, অত্যন্ত নোংরা; নোংরা ওর দেহও। চাপ চাপ ময়লা এখানে-সেখানে জমে রয়েছে, দেখা যাচ্ছে ওর হাত-পায়ের বড় বড় নখের ভিতরেও। কাছে থেকে ওর মাথার চুল দেখে মনে হয় বুঝি জন্মের পর এই মেয়েটি আর কোনদিনই স্নান করে নি। ও আমার কাছে এসে দাঁড়াবার পর যে গন্ধটা নাকে আসছে তাকে সুবাস বলা যায় না।

না, ঘোল দূরে থাক, কিছুই নেওয়া যায় না এই মেয়েটির হাত থেকে। কোন প্রয়োজনেই লাগতে পারে না সে।

তথাপি সুন্দরী রূপসী। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছি তার মুখের দিকে। কি যেন জাদু আছে তাতে। দেখলেই যেন আনন্দের জোয়ার আসে মনে—ওই অনেক দূরের কেদারনাথ পাহাড়ের বরফ-ঢাকা শৃঙ্গগুলির মত। কোন কাজে লাগবে না তা, কাছেই যাওয়া যাবে না তার। তবু মন টানে, দেখতে ভাল লাগে এবং সে ভাল লাগার আর শেষ নেই।

কেদারশৃঙ্গের অপরূপ রূপেরই স্বগোত্র মহিষমর্দিনীর দেশে এই যাযাবরী মহিষপালিকার রূপ।

কিন্তু কেদারনাথের পথে এ সব যেন ক্ষণপ্রভা। চকিতে ফুটে উঠে

পরক্ষণেই মিলিয়ে যায়। তারপর অন্ধকার মনে হয় আগের চেয়েও গভীর।

কল্পনা নয় আমার, সত্যিই অন্ধকার। গহন বনের ভিতর দিয়ে পথ। ও জায়গাটা একটা চড়াইয়ের মাথায় ছিল বলে গাছের পাতায় রোদের একটু ঝিলিমিলি ও ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে দু-এক ফালি আকাশ চোখে পড়েছিল। তারপরেই উতরাই শুরু হল আবার। মনে হল যে সুড়ঙ্গপথে, বুঝি বা পাতালেই নেমে যাচ্ছি।

চড়াই ভেঙেও লাভ নেই। চূড়ায় আর ওঠা হয় না। চলারও শেষ নেই।

চলেছি একেবারে একা। খুব ভোরে উঠেই গঙ্গোত্রীরা রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। বরাসুর চটিতে গঙ্গোত্রীর ডাকেই সকালে ঘুম ভেঙেছিল আমার। চোখ মুছতে মুছতে বাইরে এসে তারই মুখে শুনেছিলাম তার পরিকল্পনা, শুনেছিলাম তার কণ্ঠের আশ্বাসও। মাইল পাঁচেক দূরে রামপুর চটি—এ পথের প্রসিদ্ধ তীর্থ এবং প্রায় কেদারের সমানই উঁচু, ত্রিযুগীনারায়ণ পাহাড়ের কাছাকাছি। চুক্তি-করা কুলিরা বোঝা নিয়ে অতিরিক্ত চড়াই ভাঙতে রাজী হয় না বলে রামপুর একবার ছেড়ে গেলে গৌরীকুণ্ড পর্যন্ত না গিয়ে যাত্রীর নিস্তার নেই। এই পথেই তিন মাইল খাড়া চড়াই ত্রিযুগীনারায়ণের, স্বভাবতঃই আবার নামতেও হয় ওই অতিরিক্ত তিন মাইল। সুতরাং রামপুরেই ইঞ্জিনে জল ভরবার ইচ্ছে গঙ্গোত্রীর। অর্থাৎ রামপুরেই খাওয়াটা সেরে নিয়ে তারপর গৌরীকুণ্ডের পথে যাত্রা করবার পরিকল্পনা তাঁর। আমাকে আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, আমাদের তিন জনের জন্যও ভাতে-ভাত রেঁধে রাখবেন তিনি।

আশ্বাস হিসাবে নিশ্চয়ই তুচ্ছ নয় তা। তবু মন মানে কই! আমার পা-দুটির সঙ্গে সঙ্গে তাও বুঝি ভেঙে আসছে।

জিতেনও সঙ্গে নেই। পায়ে বুঝি পাখা আছে তার। রোজই দেখছি যে পথে নামলেই যেন উড়তে শুরু করে সে। এই অচেনা দেশের দুর্গম পথে কত রকম দুর্ঘটনাই ঘটতে পারে—তা তাকে বলতে গেলে এমনি ভাবেই হেসে উড়িয়ে দেয় সে যে সাহস করে আর বলতেই পারি নি তাকে যে লক্ষ্মণ ভাইয়ের ভরসাতেই কলির রাম এবার বনবাসে আসতে রাজী হয়েছিল। গত দুদিন যেমন, আজও তেমনি হয়েছে। বাহাদুরকে আমার মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখতে নির্দেশ দিয়ে নিজে হনহন করে এগিয়ে গিয়েছে সে।

কিন্তু বাহাদুর তো আমাদের পাপের বোঝা তার পিঠে নিয়ে পিছনে পড়ে আছে। অন্য যাত্রীও পথে নেই। আপাততঃ সুড়ঙ্গপথে চলেছি আমি একা।

ক্লান্ত দেহ। তিন দিন যাবৎ হাঁটছি। অভ্যস্ত জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে। সময়মত খাওয়া নেই, নাওয়া নেই। দাড়ি কামাই নে, চুলে তেল দিই নে। মেটে দাওয়াতে বসতে বা নগ্ন পাথরের উপরেই শুয়ে পড়তে কোন দ্বিধা জাগে না মনে। জামাকাপড় ময়লা হচ্ছে, ভ্রূক্ষেপ নেই। অজানতেই কখন যেন গাজনের সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছি। কিন্তু এ তো আমার সঙ্কল্প করে কৃচ্ছ্র সাধনা গ্রহণ করা নয়। কাজেই থেকে থেকে দেহ আমার প্রতিবাদ করছে, বিদ্রোহী হয়ে উঠছে মন।

সারা গায়ে ব্যথা, পা দুটি আর চলতে চায় না। আর মন? সে বুঝি মুক্তি চায় এই জটার জাল থেকে।

উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। দূরত্বের মত উচ্চতারও সঠিক নির্দেশ রয়েছে একটু দূরে দূরেই শিলালিপিতে। ৬,০০০ ফুট উঠে এসেছি দেখলাম এক জায়গায়। কিন্তু মন বিশ্বাস করতে চায় না। একই রকম পরিবেশ। সেই ঘোরঘোর ভাব, সেই বন, চারিদিকেই সেই পাষাণ-প্রাকার। চড়াই ভেঙে উপরে যখন উঠি তখনও দিগন্ত অদৃশ্য, আকাশও বড় একটা চোখে পড়ে না।

জীবনের অনেকগুলি বৎসর জেলে কাটিয়েছি আমি। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেল। কিন্তু সব এক ছাঁচে ঢালা। হাজার মাইল পার হয়ে গিয়েও দেখেছি একই রকম ঘরবাড়ি, একই মাপ ও বর্ণের উঁচু দেয়াল আমার চারিদিকে। দুঃসহ একঘেয়ে বন্দীজীবন। অথচ সেই জীবনেরই দম-আটকানো অনুভূতিই যেন আমার মনে জেগে উঠল হিমালয়ের কোলে কোলে এই মহামুক্তির পথে ক্রমাগত চলতে চলতে। পট বড়, দৃশ্যও অনেক ; কিন্তু ছবি এক। কত পথ পার হয়ে এলাম, ডিঙিয়ে এলাম কত পাহাড়। কিন্তু সে যেন ওই এক জেল থেকে আর এক জেলে যাওয়া। আবর্তনের ঘূর্ণাবর্তে বৈচিত্র্যের সমাধি হয়েছে এখানে।

সেই চড়াই আর উতরাই, পাহাড়ের পর পাহাড়, বনের পর বন। পাহাড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে বারবার পরাজিত আমি। যত এগিয়ে যাচ্ছি ততই মনে হচ্ছে যে, চারিদিকের পাহাড় যেন আরও উঁচু হয়ে উঠেছে, ক্রমেই যেন চারিদিক থেকেই এগিয়ে আসছে আমার দিকে নিষ্ঠুর আলিঙ্গনে আমাকে

পিয়ে যাবার জন্য। নিবিড় হতে নিবিড়তর বনের গাঢ় অন্ধকারে নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে আবার।

বারবার চোখ যায় অনেক নীচে মন্দাকিনীর দিকে। বিপরীত দিকে গতি তার। মনে মনে সেই গতিপথে আমিও যেন পার হয়ে আসা সম্পূর্ণ পথটাই অতিক্রম করে আবার নীচে চলে চাই—যেখানে পায়ের নীচে সমভূমি, মাথার উপর উদার মুক্ত নীল আকাশ। যেখানে মাঠের পর মাঠ পার হয়ে সুদূর দিগন্ত পর্যন্ত ছুটে যেতে কোন বাধা পায় না দুটি চোখের অস্থির কৌতূহলী দৃষ্টি।

সর্বনাশ! মনের অগোচরে তো পাপ নেই। কেদারনাথে গিয়ে পৌছবার পূর্বেই সমতলের ডাক আমার মনের কানে এসে প্রবেশ করল নাকি!

কিন্তু গুছিয়ে ভাবতেও পারি নে। দেহ বড় ক্লান্ত। গতি নয়, সে এখন চায় বিশ্রাম।

রামপুরে ধর্মশালার সামনে পথেই আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন গঙ্গোত্রী। আমাকে দেখেই মুখে হাসি ফুটল তাঁর। বললেন, এই যে চাচা, ত্রিযুগীনারায়ণ এখান থেকে মন্দির পর্যন্ত ঠিক চার মাইল।

আমি কিন্তু ভদ্রতার খাতিরেও হাসতে পারলাম না। ফস করে মুখ থেকে উত্তর বেরুল: ত্রিযুগীনারায়ণ মাথায় থাকুন আমার, আমি নীচের পথটাই ধরব।

ততক্ষণে বুঝি আমার অবস্থা চোখে পড়েছে গঙ্গোত্রীর। হাসি থামিয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, আপনার শরীরটা কি খারাপ হয়েছে?

শুষ্ক হাসি হেসে উত্তর দিলাম: হলে তাকে খুব দোষ দেওয়া যায় না। হাঁটা তো কম হচ্ছে না! আর যে পথ!

আমার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে দেখলেন গঙ্গোত্রী। তারপর অল্প একটু হেসে বললেন, আচ্ছা, ও সব কথা পরে হবে। আপনি স্নানটান করুন, ভাতে-ভাত তৈরিই আছে আমার। তবে একেবারে শুকনো খেতে হবে না। ভাল দই পাওয়া গিয়েছে এক ময়রার দোকানে।

॥ ১১ ॥

কেরলের সেই নবীন সন্ন্যাসীকে গঙ্গোত্রীর জননী সেদিন বলেছিলেন যে, এই দুর্গম হিমালয়ের কোলে কোলে সংসার ছড়িয়ে রয়েছে। গঙ্গোত্রীর নিজের হাতে রাঁধা ভাতে-ভাত খেতে খেতে সেই কথা আমার মনে পড়ে গিয়েছিল। পরে বুঝলাম যে আর এক অর্থেও কথাটা সত্য।

শিব-পার্বতীর সংসারে এসে পড়েছি আমরা। তাঁদের ঘর-গৃহস্থালির কাহিনী শুনলাম আমাদের চক্রধর পাণ্ডার মুখে।

মৈখণ্ডাও তো পার্বতীরই লীলাক্ষেত্র। তবে দেবী সেখানে মহিষমর্দিনী, ভয়ঙ্করী। কিন্তু এখানে তিনি আমাদের ঘরের মেয়ে, ঘরের বধূ। বাংলা-দেশে শিউলী-ফোটা শরৎকালে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে দশভুজা দশ-প্রহরণধারিণীর সড়ৈশ্বর্যসমৃদ্ধ মূর্তির ষোড়শোপচার পূজার বিপুল আড়ম্বর সত্ত্বেও সকালের সোনালী রোদ ও নহবতখানায় সানাইয়ের আগমনীর সুরে সুরে লালপেড়ে শাড়িপরা যে মেয়েটির অদৃশ্য আবির্ভাব মনের চোখে প্রত্যক্ষ করি আমরা, সেই মেয়েটিকেই যেন মুখোমুখি দেখলাম চক্রধরের মুখে শিব-পার্বতীর গার্হস্থ্যলীলার বিচিত্র কাহিনী শুনতে শুনতে।

অপ্রত্যাশিত নয় চক্রধরের আবির্ভাব। ত্রিযুগীনারায়ণের মন্দিরে যজমানের জন্য কিছু কর্তব্য আছে তাঁর, প্রতিদানে কিছু দক্ষিণাও আমাদের কাছে আশা করে সে। তারও অন্তরের ইচ্ছে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবার। কিন্তু বাধা পড়ল। আমাদের খাওয়া শেষ হবার আগেই চেপে জল এল। ভিজে ভিজে হাতমুখ ধোওয়া যায়, কিন্তু পাহাড়ের দুর্গম পথে যাত্রা শুরু করা যায় না। সুতরাং খাওয়ার পর বারান্দায় উনানের ধারেই সকলে মিলে গোল হয়ে বসেছিলাম। মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকিয়ে ও পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে কিছুটা সময় কাটল। তারপর সর্বসম্মতি-ক্রমে শুরু হল চক্রধরের মুখে লীলাকীর্তন।

অনুকূল পরিবেশ। বাইরে ঝমঝম বৃষ্টি হচ্ছে। একে তো আকাশ বেশী দেখাই যায় না এখানে। তায় আবার এখন মেঘে-ছাওয়া সে আকাশ। দুপুরবেলাতেই যেন রাত-রাত ভাব। বসে আছি প্রকৃতি ও অপ্রাকৃতের সীমান্ত-ভূমিতে। অতি সহজেই সীমান্ত পার হয়ে কল্পনায় দেবদেবীর স্বর্গরাজ্যে চলে গেল চক্রধর। অতটা অবশ্য আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তবু

কথার [illegible] বেঁধে আমাকেও যেন অনেক দূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল সে। ওই রামপুরের চটিতে বসেই মনে মনে আমি ত্রিযুগীনারায়ণ হয়ে গৌরীকুণ্ড অবধি বিচরণ করে এলাম।

পুরাণের গল্পের সঙ্গে সব জায়গায় মিল নেই। বিগ্রহের গায়ে চাপ-চাপ চন্দন-সিঁদুরের মত পৌরাণিক মূল কাহিনীর উপর চক্রধরের মত বহু পাণ্ডা-কথকের উদ্ভট কল্পনার রঙ লেগেছে। ক্ষতি নেই তাতে, বরং ভালই হয়েছে। শিব-পার্বতীকে পেলাম আমরা আমাদের ঘরের মানুষের মত।

দক্ষরাজকন্যা সতী পতিনিন্দা সহ্য করতে না পেরে কনখলে পিতৃগৃহে দেহত্যাগ করবার পর হিমালয়ের ঘরে উমা হয়ে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। এই সেই ঘর। হিমালয় তো রাজা, ঘর তার রাজপ্রাসাদ। এক একটি পাহাড় এখানে সেই রাজপ্রাসাদেরই এক একটি কক্ষ। এই পিত্রালয়েই কেটেছে উমার শৈশব, কৈশোর ও প্রথম যৌবন। মানিক-মুক্তা নিয়ে এখানেই খেলা করেছেন তিনি। হাতের বালা, পায়ের মল বাজিয়ে ছুটে ছুটে বেড়িয়েছেন এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে। আদরিণী মেয়ে দিনে-রাত্রে, সকাল-সন্ধ্যায় কক্ষ বদল করেছেন। পাহাড়ে পাহাড়ে নিদর্শন রয়ে গিয়েছে সেই সুমধুর বাল্য, কৈশোর ও যৌবন লীলার। সেকালের লীলাক্ষেত্র হয়েছে একালের তীর্থ।

যেমন ওই ত্রিযুগীনারায়ণ পাহাড়।

নিশ্চয়ই গৌরীদান করেছিলেন পিতা হিমালয়।

উমার বর এল কৈলাস থেকে। শ্মশানচারী শিব। নামেও ভোলানাথ, কাজেও তাই। দক্ষ-দুহিতা সতীর শব কাঁধে নিয়ে ত্রিভুবন ভ্রমণ করলে কি হবে—পত্নীশোক ভুলতে আর কদিন লাগে তাঁর। হিমালয়ের ঘরে সুলক্ষণা কন্যা আছে শুনে নন্দীভৃঙ্গী ভূত-প্রেতসহ সদলবলে এলেন তিনি হিমালয়ের এই বাড়িতে। বিবাহ-বাসর সামনের ওই পাহাড়টার উপর।

যে সে ব্যাপার তো নয়, শিবের সঙ্গে শক্তির বিবাহ! তার আয়োজন-অনুষ্ঠান তো আর সাধারণ পর্যায়ের হতে পারে না। ব্রহ্মাকে আমন্ত্রণ করে আনা হল পৌরোহিত্য করবার জন্য। তবুও হিমালয়ের মনে সন্দেহ—বাপের মন তো! বর হলেন ভোলানাথ শিব। শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়ান। সালঙ্কারা কন্যারত্নের পাণিগ্রহণ করবার পর একদিন যদি তিনি বিয়েটাই অস্বীকার করে বসেন! আর তেমন বেইমানি তিনি না করলেও

বিয়ের কথাটা ভুলে যাওয়া অসম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। সুতরাং [illegible]লয় মনে করলেন যে বিয়ের একজন অতিরিক্ত সাক্ষী থাকা উচিত। সে সাক্ষীও এমন সাক্ষী হওয়া চাই যার সাক্ষ্য শিব অবিশ্বাস করতে না পারেন। ভাবতে ভাবতে নারায়ণের কথা মনে পড়ল। তখন হিমালয় বৈকুণ্ঠে গিয়ে নারায়ণের হাতে-পায়ে ধরে নিয়ে এলেন তাঁকে। তারপর তাঁকে সাক্ষী রেখে শিবের হাতে কন্যা দান করলেন হিমালয়। সম্প্রদানের পর কুশণ্ডিকা। খোঁড়া হল যজ্ঞকুণ্ড। কদম্বকাষ্ঠে অগ্নিসংযোগে প্রজ্বলিত হল হোমাগ্নি। তাতে পূর্ণাহুতি দিয়ে শিব-পার্বতী পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন—ওই সামনের পাহাড়টার উপর।

গল্প শোনবার পর সেদিকে তাকিয়ে গায়ে কাঁটা দেয়।

সেই সত্য যুগের ঘটনা। বিয়ের পর আর সবাই চলে গেলেন, যেতে পারলেন না শুধু নারায়ণ। সেই থেকেই নাকি কৃতকর্মের বন্ধনে ওখানেই বন্দী হয়ে রয়েছেন তিনি। সেই রাত্রে হোমকুণ্ডে যে পবিত্র অনল জ্বলে উঠেছিল, নিয়মিত ইন্ধনের যোগান পেয়ে আজও নাকি সেই অনলই জ্বলছে সেই সত্যযুগের হোমকুণ্ডে। ত্রিযুগ-বয়স্ক ত্রিযুগীনারায়ণ ওই পাহাড়ের উপর বসে আজও সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে শিবের সঙ্গে সত্যিই পার্বতীর বিয়ে হয়েছিল। তার নীরব সাক্ষ্যের জ্বলন্ত সমর্থন সামনের হোমকুণ্ডে।

তবে অত তোড়জোড় না করলেও চলত। ভুল হয় নি ভোলানাথের। কে জানে কার বেশী প্রভাব—নারায়ণের সতর্ক খবরদারি, না, সদ্য-বিবাহিতা গৌরীর কটাক্ষের। তখনও ছেলেমানুষ গৌরী। বাপের বাড়ি ছেড়ে বরের ঘর করতে কৈলাসে যেতে চান না তিনি। সুতরাং গাঁটছড়া খোলবার পরেও কি যেন এক অদৃশ্য বন্ধনে বন্দী হয়ে পড়ে রইলেন শিব ওই হিমালয়ের শিখরে শিখরেই। খাঁ-খাঁ করতে থাকল কৈলাস। এদিকে শ্মশানচারীর সংসার জমে উঠল ওই হিমালয়ের কোলে। নইলে গৌরীকুণ্ড ওখানে আসে কোথা থেকে?

বালিকা গৌরী অকস্মাৎ একদিন নারী হয়ে উঠলেন। রজস্বলা হলেন তিনি।

পার্বতীর কাছে পথের দূরত্ব কিছুই নয়। গৌরী ঋতুস্নান করলেন প্রায় পাঁচ মাইল দূরবর্তী গৌরীকুণ্ডে। স্ফটিকশুভ্র কুণ্ডবারি পার্বতীর অঙ্গরাগে রঞ্জিত হয়ে গেল।

ত্রেতা যুগ আগের ঘটনা। কিন্তু আজও হেমবর্ণ রয়েছে গৌরীকুণ্ডের শীতল জল।

ত্রিযুগীনারায়ণ ও গৌরীকুণ্ডের মাঝামাঝি এক জায়গায়, শোণপ্রয়াগ থেকে খানিকটা উত্তরে গণেশের মন্দির। প্রচুর তেল-সিঁদুর মাখা টকটকে লাল রঙের বিগ্রহ। কিন্তু বেচারা শিরহীন বিগ্রহ, নামও তাই—মুণ্ডুকাটা গণেশ।

তাঁর কাহিনীও শুনলাম চক্রধরের মুখে।

গণেশজননী হবার পর ভাবান্তর হল গৌরীর। পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়ে থাকলেও আসলে তো তিনি আদ্যাশক্তি। স্বীয় চিন্ময় সত্তার জন্য ব্যাকুল হলেন পার্বতী। তখন যোগিনী-ভাব তাঁর। জপতপের দিকে মন। স্বামীকে কাছে ঘেঁষতে দিতে চান না। দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে ধ্যানে বসলেন একদিন—সিদ্ধিলাভ না করে উঠবেন না। দ্বারপাল রাখলেন পুত্র গণেশকে। কড়া হুকুম তাঁর উপর যেন কাউকে ধ্যান-ঘরে ঢুকতে না দেওয়া হয়। শিব তখন কোথায় যেন বেড়াতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে অন্দরমহলে ঢুকতে গিয়ে বাধা পেলেন গণেশের কাছে। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, অবিশ্বাস্য পরিস্থিতি।

তৃতীয় নয়নে ধকধক আগুন জ্বলে উঠল মহেশ্বরের। বললেন তিনি, আমি তোর বাবা।

কর্তব্যপরায়ণ গণেশ অবিচলিতকণ্ঠে উত্তর দিলেন, আমার মাতৃ-আজ্ঞা—তোমাকে ঢুকতে দেব না আমি।

প্রলয়ের দেবতা নটরাজ শিব। প্রত্যাখ্যান ও অপমানের কশাঘাতে তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন তিনি। চক্ষের পলকে শিবের ত্রিশূলের আঘাতে মুণ্ড উড়ে গেল গণেশের।

আধ-বোজা চোখে তন্ময় হয়ে গল্প বলে যাচ্ছিল চক্রধর। কিন্তু সে এই পর্যন্ত আসতেই বাধা পড়ল।

জিতেন কেবল বিস্মিত নয়, বুঝি শিবের মতই রুষ্ট হয়ে বলে উঠল, এ কি গাঁজাখুরি গল্প তুমি বলছ ঠাকুর? আমরা তো জানি যে শনির দৃষ্টিতেই গণেশের মুণ্ড উড়ে গিয়েছিল!

কয়েক সেকেণ্ডের জন্য একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল চক্রধর। কিন্তু তখনই নিজেকে সামলে নিয়ে পরম বিজ্ঞের মত গম্ভীর স্বরে সে উত্তর দিল, সে গণেশ হল গণপতি—শ্বেতহস্তীর মুণ্ডু কেটে এনে কবন্ধের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে

পুনর্জীবিত করা হয়েছিল যাঁকে। আমি বলছি কেদারখণ্ডের মুণ্ডুকাটা গণেশের কথা। এখন বিশ্বাস না করেন, আপনারা এগিয়ে চলুন তখন নিজের চোখেই দেখতে পাবেন যে এ গণেশের কাটা মুণ্ডু আর জোড়া লাগে নি।

মোক্ষম যুক্তি। জিতেনের পক্ষেও আর প্রতিবাদ করা সম্ভব হল না। কিন্তু এর পর কথকতাও আর আগের মত জমল না।

দেব-দেবীকে ছেড়ে পথের কথা উঠল তখন। একা আমি ছাড়া দলের আর প্রত্যেকেরই এগিয়ে যাবার ইচ্ছে। কিন্তু বাদ সেধেছে ওই বৃষ্টি। ঝমঝম বৃষ্টি হচ্ছে তখনও। আকাশ যেন আগের চেয়েও কালো। তবুও জিতেন বললে, চলুন, রওনা হওয়া যাক।

কিন্তু দাঁতে জিভ কেটে মাথা নেড়ে চক্রধর বলে উঠল, না বাবুজী, এমন বৃষ্টি থাকতে পাহাড়ের পথে চলতে নেই।

ঘড়ি দেখলেন গঙ্গোত্রী। তারপর বললেন, বৃষ্টি থামলেও আজ আর যাওয়া হবে না। বেলা দুটো বেজে গিয়েছে। চলতে শুরু করলেই যেতে হবে একেবারে গৌরীকুণ্ড পর্যন্ত—কমপক্ষে দশ মাইল পথ। অবেলায় অতটা ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না।

জিতেন অধৈর্য হয়ে বললে, ঝুঁকি আবার কি! দশ মাইল পথ চলতে বড় জোর চার ঘণ্টা লাগবে। এখন তো মোটে দুটো।

মুচকি হেসে উত্তর দিলেন গঙ্গোত্রী: কিন্তু ভাইয়া, এখনই তো বেরুতে পারছি নে আমরা। বৃষ্টি তো চলছেই। থামতে থামতে যদি তিনটে বেজে যায় তখন তো আর আপনার হিসাব টিকবে না।

যুক্তি অকাট্য বুঝে গুম হয়ে রইল জিতেন।

গল্প শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম বলে এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি আমরা। এখন চোখে পড়ল যে আমাদের বাহাদুর ও গঙ্গোত্রীদের ছত্রী দুজনেই একটু দূরে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। গঙ্গোত্রীর জননীর নিষ্প্রভ চোখেও ঢুলুঢুলু ভাব।

বোধ করি তাঁর মায়ের কথা ভেবেই গঙ্গোত্রী আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, যাত্রা যখন শুরু করা যাচ্ছে না তখন আর বসে থেকে কি লাভ? তার চেয়ে সবাই একটু ঘুমিয়ে নিলে হয় না?

ঠিক আমারই মনের কথা ওটা। সুতরাং সায় দিতে একটুও দেরি হল না আমার।

ঘুম ভাঙার পর বিছানায় শুয়েই বেশ বুঝতে পারলাম যে বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। বাইরে এসে দেখি যে আরও একটু বেশী। কাছাকাছি পাহাড়গুলির চূড়ায় চোখে পড়ল ঝিকিমিকি রোদ। এ কদিনে বেশ বুঝতে পেরেছি যে এই রকমই হয় এখানে—রোদ নিভিয়ে বৃষ্টি নামে, আবার রোদ ওঠে বৃষ্টি থামলেই। বসন্ত ও বর্ষার নির্বিবাদ সহ-অবস্থান দেখছি এই হিমালয়ে।

গঙ্গোত্রী আর বাহাদুর দেখি বারান্দায় গল্পে মেতে উঠেছে। বেশ উৎফুল্ল বাহাদুরের মুখের ভাব।

গঙ্গোত্রীর মুখেই শুনলাম যে, সেদিন আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না বুঝে ক্ষুব্ধ জিতেন বৃষ্টি থামবার পর কিছুটা ক্ষতিপূরণের আশায় সামনের ওই পাহাড়টিকে আবিষ্কার করতে বেরিয়েছে; তার পথপ্রদর্শক হয়েছে গাড়োয়ালী কুলি ছত্রী। গঙ্গোত্রীর জননী শুনলাম চক্রধরের সঙ্গে গিয়েছেন স্থানীয় এক সাধুর আস্তানায়।

শুনতে শুনতে আড়চোখে বাহাদুরকে দেখছিলাম আমি। তখনও খুশী খুশী ভাব তার। কারণটা মনে মনে আন্দাজ করে গঙ্গোত্রীকে বললাম, আপনাকে দেশের লোক পেয়ে খুব খুশী হয়েছে বাহাদুর।

হেসে উত্তর দিলেন গঙ্গোত্রী, তা ঠিক। এতক্ষণ আমাদের দেশের চলতি ভাষায় কথা বলছিলাম আমরা।

আমিও হেসেই বললাম, তা হলে কুলি বদল করলে হয় না? আপনাদের দলে যেতে পারলে বাহাদুর বোধ করি আরও খুশী হবে।

মোটেই নয়।

গঙ্গোত্রীর উত্তর শুনে বিস্মিত হয়েছিলাম আমি, কিন্তু ব্যাখ্যা শুনে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ অনুভব করলাম।

গঙ্গোত্রী বললেন, আপনি বুঝি ভেবেছিলেন যে দুজনে আমরা আমাদের দেশের কথা আলোচনা করছিলাম? তা মোটেই নয়। দেশী ভাষায় বললেও বাহাদুর বলছিল আপনাদেরই কথা। আপনাদের সঙ্গে ও নাকি বাড়ির আদর ও আরামে আছে। আমি ডবল ভাড়া দিতে চাইলেও যাত্রী বদল করবে না ও।

হিন্দী তো ভালই বোঝে বাহাদুর। গঙ্গোত্রীর কথা শুনে দেখি যে সে হাসছে। সে হাসি পরিতৃপ্তির—সমর্থনেরও।

টেনে আর বাড়ালাম না কথাটা। একটু ইতস্ততঃ করবার পর গঙ্গোত্রীকে বললাম, চলুন, একটা ভাল দোকানে গিয়ে চা খেয়ে আসি। আমি কেমন চা তৈরি করতে পারি তা পরখ করবেন।

তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন গঙ্গোত্রী। কিন্তু আমার প্রস্তাবে সায় দেবার জন্য নয়—বাহাদুরকে তিনি হুকুম [illegible] উনান ধরাতে। তারপর একমুখ হাসি হেসে আমাকে বললেন, বা[illegible] মুখে শুনেছি আমি, কেমন চা আপনি খান। ততটা ভাল চা আমি তৈরি করতে না পারলেও কাছাকাছি যেতে পারব আশা করি।

কিন্তু তার পরেই যা তিনি বললেন এবং যে ভঙ্গিতে বললেন তা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত আমার কাছে। সারা মুখে ছড়িয়ে-পড়া হাসি তাঁর শুধু যেন চোখ দুটির মধ্যে গুটিয়ে এনে, ঠোঁট দুখানি ঈষৎ বেঁকিয়ে প্রায় আবদারের স্বরেই তিনি বললেন, আমি তো গোড়া থেকেই 'চাচা' বলে ডাকছি আপনাকে। আপনি তবে আমাকে 'তুমি' না বলে ক্রমাগতই 'আপনি' বলছেন কেন?

অনুযোগের নীচে সুস্পষ্ট অনুরোধ। বেশ বুঝতে পারলাম যে একটুও ভেজাল নেই তাতে। আমার নিজের মন তো গত রাত্রি থেকেই অনুকম্পায় আর্দ্র হয়ে রয়েছে। এখন তা গলে জল হয় আর কি! কিন্তু মন চাইলেও তখনই 'তুমি' সম্বোধন মুখে আসে না আমার।

হাসিমুখে চুপ করেই ছিলাম তখন। চা খেতে খেতেও ভাববাচ্যে কথা বলে সমূহ সঙ্কট এড়াবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আবার আমাকে চেপে ধরলেন গঙ্গোত্রী। বললেন, আমার নাম ধরে আর 'তুমি' বলে আমাকে যদি না ডাকেন আপনি, তবে আমিও এর পর আপনাকে 'চাচা' না বলে মিঃ রায় বলে ডাকব।

সশ্রদ্ধ স্নেহের ওই শেষ আঘাতে আমার মনের মধ্যে সঙ্কোচের বাঁধ একেবারে ভেঙে গেল এবং গত রাত্রে জিতেনের মুখে সংক্ষেপে গঙ্গোত্রীদের পারিবারিক ইতিহাস শোনবার পর থেকে যত অনুভূতি ও যত প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে জমে উঠেছিল তা বাঁধ-ভাঙা জলস্রোতের মতই বেরিয়ে এল।

খেয়ালই হয় নি তখন যে ওই প্রবল স্রোতের মুখে কি দুর্দশা হতে পারে বেচারী গঙ্গোত্রীর!

অবরুদ্ধ আবেগ আমার মনের অর্গল ভেঙে বেরিয়ে এসেছে—গলা একটু কাঁপবে বইকি!

আমি বললাম, অত কাছে আমাকে টানলে তুমি যে মা বিপদে পড়ে যাবে। শেষে যদি বাপ-খুড়োর মতই খবরদারি শুরু করে দিই?

তাতে তো আমারই লাভ।—হেসে উত্তর দিলেন গঙ্গোত্রী: বাপের খবরদারি যে কি মিষ্টি, হারাবার পরেই না তা ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছি!

তা হলে গঙ্গোত্রী, তুমি বিয়ে করলে না কেন? সন্ন্যাসী হবার আগে তিনি তো তোমাকে অনুমতি দিয়েই গিয়েছেন।

ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলে ফেলেছিলাম আমি। কিন্তু বলেই চমকে উঠলাম। ভাল করে চেয়ে দেখি যে গঙ্গোত্রীর মুখের চেহারা একেবারে বদলে গিয়েছে। হাসি নিশ্চিহ্ন, রক্তচলাচলও বুঝি বন্ধ হয়ে গিয়েছে তাঁর মুখের উপর। স্বাভাবিক হরিদ্রাভ বর্ণ এখন মনে হয় অসুস্থ পাণ্ডুর। নীল চোখের কালো তারা দুটি তাঁর অকস্মাৎ যেন একেবারে নিশ্চল হয়ে গেল।

আমি সবিস্ময়ে বললাম, কি হল তোমার?

উত্তর দিলেন না গঙ্গোত্রী। দেখে হঠাৎ বুকটা কেঁপে উঠল আমার। অপরাধীর মত কুণ্ঠিত স্বরে আমি আবার বললাম, যদি আমার বেয়াদবি হয়ে থাকে তা মার্জনা করবেন গঙ্গোত্রীদেবী।

কিন্তু এই কথা শুনেই আবার বদলে গেল গঙ্গোত্রীর মুখের চেহারা। একসঙ্গে অনেকখানি রক্ত যেন শিরা-উপশিরার পথে ছুটে এসে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর মুখের উপর। প্রতিবাদের দৃঢ়স্বরে তিনি বললেন, না, 'দেবী' আবার কেন জুড়ছেন নামের সঙ্গে? বলুন 'গঙ্গোত্রী'—'বেটি' বলুন। বেয়াদবি কেন হবে আপনার? আপন চাচার মতই তো কথা বলেছেন আপনি। আমি শুধু ভাবছিলাম—

বলতে বলতে থেমে গেলেন গঙ্গোত্রী। হঠাৎ বাধা পাওয়া নির্ঝরের মতই ভাবখানা তাঁর—এক সঙ্গেই বিব্রত ও অসহিষ্ণু। কিন্তু তা ওই কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। তারপরেই হেসে ফেললেন তিনি। আবার তিনি যেন বেশী বয়সের ছোট মেয়েটি।

জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, কে বললে আপনাকে? মা?

তখনও কুণ্ঠিত ভাব আমার। ঘাড় কাত করে স্বীকার করলাম।

আর কি বলেছেন?

বলেছেন যে তোমার উপর অভিমান করেই তোমার বাবা [illegible] হয়েছেন।

মুখের হাসি গঙ্গোত্রীর আবার নিভে গেল। চোখ নামিয়ে নিলেন তিনি। শক্ত মুঠোয় চেপে ধরলেন তাঁর নিজের শাড়ির আঁচলেরই একটি কোণ। কিছুক্ষণ পর আবার যখন তিনি আমার মুখের দিকে তাকালেন, তখন দেখি যে গম্ভীর তাঁর মুখের ভাব, দৃষ্টি বিষণ্ণ। বিষণ্ণ কণ্ঠেই তিনি বললেন, চাচা, ওটা আমার মায়ের ভ্রান্তি—একটা অসুস্থ আবেশ। আমার বাবা বেঁচে নেই।

অ্যাঁ!—একেবারে যেন আকাশ থেকে পড়লাম আমি।

গঙ্গোত্রী কিন্তু সহজ ভাবেই বললেন, হ্যাঁ চাচা, আমাদের বাড়িতে তো মারা যান নি তিনি, কাজ করতে গিয়ে মারা পড়েছিলেন। তাঁর শবদেহও আমরা পাই নি। সেইজন্যই বাবার মৃত্যুসংবাদ আমার মা বিশ্বাস করেন নি তখন। সন্ন্যাসী হবার একটা ঝোঁক চিরদিনই বাবার ছিল বলেই মা ধরে নিলেন যে মনের দুঃখে সন্ন্যাসীই হয়েছেন তিনি। পাঁচ বছর হয়ে গেল তারপর, কিন্তু সেই আবেশই রয়ে গেছে মায়ের মনে! এই যে ওঁর তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ানো এও আসলে আমার বাবারই খোঁজে। মায়ের ধারণা যে, কোন তীর্থস্থানে বা তীর্থের পথেই বাবার সঙ্গে ওঁর দেখা হয়ে যাবে।

কিছু কিছু যেন বুঝলাম ব্যাপারটা। বুঝলাম, কেন সাধু-সন্ন্যাসী সম্বন্ধে আগ্রহ সত্ত্বেও সন্ন্যাস সম্বন্ধে অত বিরূপ ধারণা ওই বৃদ্ধার। গত রাত্রে জিতেনের মুখে অন্য রকমের কাহিনী শুনেও সমবেদনা বোধ করেছিলাম ওই জরাজীর্ণা মহিলার প্রতি; এখন তা আরও বাড়ল। কিন্তু কি করতে পারি আমি! স্বয়ং কন্যা হয়েও অত শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী গঙ্গোত্রী যে রোগ আরাম করতে পারেন নি আমি তার কি করব!

কিছুক্ষণ পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে গঙ্গোত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছিল তোমার বাবার?

কিছুই হয় নি।—মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন গঙ্গোত্রী: নিয়তি তাঁকে টেনে নিয়েছে।

তার মানে?

তরাই অঞ্চলে রাস্তা তৈরি করাচ্ছিলেন আমার বাবা। তখন ধস নামল। চাপা পড়ে মারা গেলেন তিনি।

ধস্ কি?

পাহাড়ের ধস নামে জানেন না?

শব্দটি জানা থাকলেও তার অর্থ সম্বন্ধে আমার তেমন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এখন গঙ্গোত্রীর মুখে শুনে কিছু কিছু বুঝলাম ব্যাপারটা।

দৈত্যের মত বিরাট আর আকাশসমান উঁচু হলে কি হবে—অনেক পাহাড়েরই ভিতরটা নাকি কাঁচা। বৃষ্টির জল সে সব পাহাড়ের পরতে পরতে ঢুকে যায়। মাটি দিয়ে গাঁথা ইটের দেওয়ালের মত পাথর আর পাথরের মাঝখানের মাটি গলে যায় তখন; নড়বড়ে হয়ে যায় পাথরগুলি। তখন যদি আরও বৃষ্টি হতে থাকে তা হলে নীচের দিকে বসে যেতে থাকে পাহাড়। উপরের মাটিপাথর ঝুর ঝুর করে পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে গড়িয়ে পড়তে থাকে। পাহাড় অঞ্চলে বর্ষাকালে এ হল গিয়ে অতি সাধারণ দৈনন্দিন ঘটনা। তবে বারিপাতের পরিমাণ তেমন বেশী যদি হয় অথবা যদি ভূমিকম্প হয় তা হলে পাহাড়ের ওই স্বাভাবিক ধস অসাধারণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। বল্মীকের ছোট একটি স্তূপের মতই বড় বড় পাহাড়ও তখন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সে রকম অবস্থায় দু-একটি মানুষ তো কোন্ ছার, গ্রামকে গ্রামও ভগ্নস্তূপের নীচে চাপা পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

এমনি এক বিপর্যয়ের বলি হয়েছিলেন গঙ্গোত্রীর পিতা। অনেক কুলি-কামিন নিয়ে ওভারসিয়ার সাহেব নাকি নতুন একটি সড়ক নির্মাণ করছিলেন উত্তর-প্রদেশের তরাই অঞ্চলে। সরকারী কাজ; সতর্কতার ত্রুটি হয় নি। তবু ধস নেমেছিল। তারই নীচে চাপা পড়েছিল স্বয়ং ওভারসিয়ার সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে তারই দলের জন দশেক লোক। তাদের একজনকেও জীবন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি।

না, সংশয়ের কোন অবকাশই নেই। আমার প্রশ্নের উত্তরে স্বীকার করলেন গঙ্গোত্রী যে, তাঁর পিতার মৃত্যুর সম্পূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ সরকারী দফ্তর থেকে যথাসময়েই পেয়েছিলেন তিনি।

আমার মনেও আর সংশয় থাকল না। বুঝি সেইজন্যই আর একটা সংশয় জেগে উঠল সেখানে। সেই সঙ্গে ক্ষীণ একটু আশাও। গলার স্বর খাদে নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমি, তা হলে মা, আর যে একটা কথা আমি শুনেছি তাও কি ভুল?

স্মৃতির অনুসরণ করে গঙ্গোত্রীর মনটা বুঝি পাঁচ বৎসর পূর্বের অতীতে ফিরে গিয়েছিল। সুতরাং আমার প্রশ্ন শুনে বিহ্বলের মত তিনি বললেন, কোন্‌টা?

আমি বললাম, তোমার বিয়ে সম্বন্ধে একটা র

বুঝতে আরও একটু সময় লাগল গঙ্গোত্রীর। কিন্তু বুঝেই চোখ নামিয়ে নিলেন তিনি। মুখে বললেন, না, ওটা ঠিকই শুনেছেন আপনি।

একটু আশাভঙ্গ হল বইকি। তবু কথার টানেই কথা বেরিয়ে গেল আমার মুখ থেকে। আমি বললাম, তা হলে মা, বিয়ে তুমি করলে না কেন? তোমার বাবা শুনেছি তোমাকে অনুমতি দিয়েই গিয়েছিলেন। আর তোমার মাও তো আপত্তি করেন নি।

তাই বলেই কি বিয়ে করতে পারি আমি?

গঙ্গোত্রী যেন স্বপ্নাবিষ্টের মত বললেন কথাটা। কিন্তু তারপর চোখ তুলে সোজা তিনি তাকালেন আমার চোখের দিকে। অন্তরের স্বাভাবিক সঙ্কোচটুকু যেন জোর করেই ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তিনি আবার বললেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থাও বদলে যায় চাচা। বাবা থাকতে ব্যাপারটা চুকে গেলে ভালমন্দ যা হবার হয়েই যেত; তা হয় নি বলেই পরেও বিয়ে আর হল না।

তা কেন?

বাঃ! এই তো দেখছেন আমার মায়ের অবস্থা। বছর পাঁচেক যাবৎ এই রকমই চলছে। এই মাকে ফেলে আর একজনের ঘরে আমি যাই কেমন করে? আর তার ঘরেই যদি না যেতে পারি তবে তাকে বাঁধতে যাব কেন?

এত কথা আমি ভাবি নি। শুনে সসম্ভ্রম বিস্ময়ে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম গঙ্গোত্রীর মুখের দিকে। কিন্তু ইতিমধ্যেই মেয়েটির উপর আমার যে মায়া পড়েছে। ওঁর আত্মত্যাগের মহিমায় মুগ্ধ হয়েও ওঁর বুকের তলে অন্তঃসাললা ফল্গুধারার মত বঞ্চিতের বেদনার প্রবাহ কল্পনা করে সমবেদনায় ব্যথিত হয়ে উঠল আমার মন। গাঢ়স্বরে আমি বললাম, কিন্তু গঙ্গোত্রী, এ তো তোমার স্বাভাবিক জীবন নয়, মা। আর মানুষের জীবনটা তার যে কোন আবেগের চেয়েও দীর্ঘ।

আশ্চর্য! শুনে হেসে ফেললেন গঙ্গোত্রী। হাসতে হাসতেই বললেন, আমার জীবন কিন্তু, চাচা, আমার কাছে মোটেই অস্বাভাবিক মনে হয় না। কলেজে যাদের আমি পড়াই তারাই মনে হয় যেন আমার বোন। আর কিছুদিন পরে মনে হবে বুঝি আমারই মেয়ে তারা। আর বিয়ে করি

নি[illegible]ই তোমাকে নিয়ে এত তীর্থে তীর্থে বেড়াতে পারছি। সব মিলিয়ে আমি তো দেখছি যে ক্ষতিপূরণ হয়েও লাভ হচ্ছে আমার।

হেরেই গিয়েছি ভেবেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ আর একটি যুক্তি মনে এল। এবার পরিহাসতরল কণ্ঠেই গঙ্গোত্রীকে বললাম, কিন্তু মা, সেই ডাক্তারটি আর কতদিন অপেক্ষা করে থাকবে! তার কথাটাও তো তোমার ভাবা উচিত।

কিন্তু ব্যর্থ হল আমার ব্রহ্মাস্ত্রও। কেবল যে গঙ্গোত্রীর হাসির বর্মে বাধা পেয়েই তা ফিরে এল, তা নয়; যে লক্ষ্যভেদ করবার কথা আমার ব্রহ্মাস্ত্রের, সেই নিশানার অস্তিত্বই মোটে নেই। হেসে উত্তর দিলেন গঙ্গোত্রী: সে কর্তব্যেরও ত্রুটি হয় নি চাচা। পরস্পরকে মুক্তি দিয়েছি আমরা। তিনি তারপর বিয়েও করেছেন। তাই তো গোড়াতেই বললাম আপনাকে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবই বদলে যায়।

এবার খট করে কানে এসে লাগল আগে একবার শোনা শেষের ওই কথাটা। কিন্তু ওইটুকুতেই নিস্তার নেই। আমার চোখ ও মন দুয়েরই বিভ্রম নাকি! গঙ্গোত্রীর মুখে হাসি, না, চোখে জল দেখছি আমি?

কিন্তু ঠিক ওই সময়েই তাল কেটে গেল। বাইরে থেকে আমার কানে এল জিতেনের উল্লসিত কণ্ঠস্বর: ঘরে আছেন নাকি মণিদা? দেখুন কাকে ধরে এনেছি।

তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ফেললেন গঙ্গোত্রী। তারপর মিনতিভরা চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে মৃদুস্বরে তিনি বললেন, এ সম্বন্ধে চাচা, আমার মায়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা না করাই ভাল। সব কথা তো বুঝতে পারেন না তিনি, শুধু দুঃখই বেড়ে যায় তাঁর।

চেনা মুখ ভদ্রলোকের। রুদ্রপ্রয়াগে যে বাঙালী যাত্রীদলকে দেখেছিলাম তাঁদেরই একজন। দ্বিতীয়বার তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই মনে পড়ল যে, যে মহিলার ছাতার জন্য আবদার সমর্থন করে সেদিন তাঁর একটু কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম, ইনি সেই মহিলারই স্বামী। দ্বিতীয়বার তাঁকে আমি দেখেছিলাম কুণ্ডচটিতে।

নাম জানবার সুযোগ হল এখন—হরেন্দ্রনাথ রক্ষিত।

দুঃখের কাহিনী বললেন তিনি। দল তাঁদের ভেঙে গিয়েছে। সেদিন

রুদ্রপ্রয়াগে মনোমালিন্যের যে অদৃশ্য বীজ পড়েছিল তাদের কারও কারও মনের মাটিতে, তাই থেকেই উদ্ভূত বিষবৃক্ষ। এবারও কারণ হরেন্দ্রবাবুর স্ত্রী। পথশ্রম আর সহ্য করতে না পেরে একটি সম্পূর্ণ দিন এই চটিতে বিশ্রাম করতে চেয়েছিলেন মৃন্ময়ী। কিন্তু দলের নেতা ও অধিকাংশ সদস্য রাজী হন নি সে প্রস্তাবে। অগত্যা স্বামীর কর্তব্য পালন করেছেন হরেন্দ্রবাবু। স্ত্রীর স্বাস্থ্যের খাতিরে দলকে ছেড়ে স্ত্রীর সঙ্গে গতকাল থেকে এই রামপুর চটিতেই থেকে গিয়েছেন দুজনে।

ততক্ষণে গঙ্গোত্রীর জননীকে নিয়ে চক্রধর পাণ্ডাও ফিরে এসেছে। কাছে দাঁড়িয়ে শেষের কথাটা শুনেছিল সে। শুনে বললে, এ পথে এমন ঘটনা হামেশাই ঘটে বাবুজী। এও কেদারনাথজীর এক লীলা। বাড়ি থেকে মস্ত দলবল নিয়ে বেরিয়ে এলেন, কিন্তু বাবার কাছে গিয়ে যখন পৌছলেন তখন হয়তো মোটে দুজন। চলতে চলতে দলের মধ্যে মন কষাকষি হয়, রাগারাগি হয়, অসুখও হয়তো হয় দলের কোন লোকের। এই সব কারণে ভাঙতে ভাঙতে তেমন বড় দলও কখনও কখনও খুব ছোট হয়ে যায়।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে হরেন্দ্রবাবু বললেন, আমাদের বেলায় তাই তো হল দেখলাম।

কিন্তু তারপরেই তিনি আবার বললেন, তবে ভালই করেছিলাম এখানে থেকে গিয়ে। আজ সকালে উঠে দেখি যে আমার স্ত্রীর জ্বর হয়েছে। খুব বেশী অবশ্য নয়, তবুও মনে হয় আমাকে দিয়ে বাবা কেদারনাথ যে আমাদের দল ভাঙলেন সে বুঝি আমাদের মঙ্গলের জন্যই।

তবে মৃন্ময়ী মানতে চান না ওই ব্যাখ্যা। তাঁর মনে কেমন যেন একটু ভয় হয়েছে তাঁদের চটির বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ মালিকের কথা শুনে।

হরেন্দ্রবাবুর সঙ্গেই আমি আর জিতেন দেখতে গিয়েছিলাম তাঁর স্ত্রীকে। মহা খুশী তিনি আমাদের দেখে। তীর্থভ্রমণের, বিশেষতঃ এই কেদারবদরীর হাঁটা পথে এই আমি দেখছি একটি মস্ত লাভ। আগে যাকে কোনদিনই দেখি নি এবং হয়তো বা কয়েক ঘণ্টা পরেই যার সঙ্গে জন্মের মতই ছাড়াছাড়ি হবে, তাকেও পথে বা চটিতে মনে হয় যেন পরম আত্মীয়। একবার ছাড়াছাড়ির পর দ্বিতীয়বার দেখা হলে উভয় পক্ষেরই মনে হয় বুঝি হারানিধি ফিরে পাওয়া গিয়েছে।

আমাদের দুজনকে দেখে তেমনি উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন মৃন্ময়ী। খুব

উৎসাহের সঙ্গে তিনি খোঁজখবর নিলেন আমাদের। কিন্তু বিদায়কালে বিষণ্নকণ্ঠে তিনি বললেন, শেষ পর্যন্ত ঠাকুর তাঁর কাছে আমাদের যেতে দেবেন কিনা কে জানে! আমাদের চটির চৌধুরী তো বলছে যে, অনেক যাত্রীকেই তিনি পথ থেকেই ফিরিয়ে দেন।

পরে এ কথাও সমর্থন করেছিল আমাদের চক্রধর পাণ্ডা। পরিহাস নয়, বরং কথাটা উঠতেই মুখের হাসি নিভে গেল তার। যুক্তকর ললাটে ঠেকিয়ে উদ্দেশে কেদারনাথকে প্রণাম করে কেমন যেন ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে সে বললে, চৌধুরী ঠিক কথাই বলেছে বাবুজী। সকলেই কি কেদারনাথের চরণ পর্যন্ত যেতে পারে! যত টাকাই কেউ খরচ করুক না কেন, মনে যদি ভক্তি না থাকে, বাবাকে দর্শন করতে এসেও পথে সংযম-নিয়ম পালন না করে, তবে বাবা তেমন যাত্রীকে পথ থেকেই ফিরিয়ে দেন। নিজের চোখেই কত দেখেছি আমি—কারও হয়তো হাত-পা ভাঙে, কারও অন্য কোনও শক্ত ব্যারাম হয়, কারও হয়তো আর-কিছু। এই রামপুর তো অনেক দূর! সেবার রামোয়াড়া পার হয়ে যাবার পরেও এমন জ্বর হল এক যাত্রীর যে ডাণ্ডিওয়ালারাই ভয় পেয়ে গৌরীকুণ্ডে ফিরিয়ে নিয়ে এল তাকে। সেখানেই হাসপাতালে মারা গেল সে।

মিনিটখানেক চুপ করে থাকবার পর একেবারে মোক্ষম উদাহরণ দিল চক্রধর। সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণকেও দর্শন দেন নি কেদারনাথ।

পথের কথা কি বলছেন বাবুজী?—বললে চক্রধর: সেবার কেদারনাথের নাটমন্দির পর্যন্ত গিয়েও জয়প্রকাশজী বাবার দর্শন পেলেন না।

সে কি কথা!—বিস্মিত হয়ে বললাম আমি।

চক্রধর গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিল, কেদারনাথজীর নাম নিয়ে মিছে কথা কি বলতে পারি বাঙালীবাবু? একজন অছুত ছিল জয়প্রকাশজীর দলে। তাকে রাওলসাহেব মন্দিরে ঢুকতে দিলেন না দেখে জয়প্রকাশজী মন্দিরের দোরগোড়া থেকে ফিরে গেলেন।

ঘটনা যদি সত্যি হয় তবে আচরণ জয়প্রকাশনারায়ণের মতই বটে। কিন্তু চক্রধর সে কথা মানবে কেন? সে উপসংহারে আবার বললে, কেদারনাথজী জয়প্রকাশের উপর রুষ্ট হয়েছিলেন বলেই অমনভাবে তাঁর বুদ্ধিনাশ করেছিলেন। সুতরাং দর্শন আর তাঁর ভাগ্যে হল না।

॥ ১২ ॥

নীচেই প্রস্তরফলকে স্পষ্ট লেখা আছে—ত্রিযুগীপাহাড়ের পাদদেশ থেকে উপরে মন্দির পর্যন্ত পথের দূরত্ব তিন মাইল। সে পথ নীচের যাত্রী-সড়কের মত অত প্রশস্ত ও মসৃণ নয়। লোকজন আর ছাগল-মোষের পায়ের তাগিদে সৃষ্টি হয়েছে সেই পাকদণ্ডী পথ; ওর স্থিতিও সেই সব পায়েরই তাড়নায়। কেদারপথের অধিকাংশ যাত্রীই অতিরিক্ত চড়াই ভাঙবার কষ্ট এড়াবার জন্য বৈষ্ণবতীর্থ ত্রিযুগীনারায়ণের মন্দিরকে এড়িয়ে যান বলে সরকারের তেমন নজরও নেই ওই পথটুকুর দিকে।

অমনই পাকদণ্ডী পথ আছে উপর থেকে বিপরীত দিক দিয়ে শোণপ্রয়াগের পুলের মুখে নীচের এই যাত্রী-সড়কের সঙ্গে জংশন পর্যন্ত। তারও দূরত্ব ওই তিন মাইল। অঙ্কের হিসাবে মোট ছ মাইল হলেও নীচের যাত্রী-সড়ক দিয়ে সোজা এগিয়ে গেলে ঠিক অতটা দূরত্ব এড়ানো যায় না—মাইল দুয়েক হাঁটতেই হয়।

তাই করেছিলাম আমি। আগের দিন যেমন বলেছিলাম গঙ্গোত্রীকে, পরদিন কাজেও তেমনি। ত্রিযুগীনারায়ণকে মাথায় রেখে পাহাড়ের কোমর বেয়ে বেয়ে উতরাই-পথে সোজা এগিয়ে গেলাম গৌরীকুণ্ডের দিকে। মাইল চারেক অতিরিক্ত চড়াই-উতরাই পথ চলবার ক্লেশ থেকে অব্যাহতি পেল আমার ক্লান্ত দেহ।

তবু মনে মনে লাভ-লোকসানের হিসাব খতিয়ে দেখি—কই, লাভের ঘরে তেমন কিছু নজরে পড়ছে না তো! শোণপ্রয়াগ পর্যন্ত উতরাই পথ। গতি তাতে দ্রুততর হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু পরিশ্রম কিছু কম হয় না। তারপর শোণপ্রয়াগের পুল পার হবার পরেই চড়াই শুরু হল। কঠিন চড়াই এটি। ত্রিযুগীনারায়ণের চড়াইকে এড়িয়ে এসেছি বলেই বুঝি কেদারপথের এই গৌরীশৃঙ্গ তার প্রতিশোধ নিতে চায়। পথের প্রকৃতিও বদলে গিয়েছে এ পারে। শোণপ্রয়াগ পর্যন্ত নিবিড় বন ছিল। এপারে পথের দু পাশে বনস্পতির পরিবর্তে দেখছি লম্বা লম্বা একরকম ঘাস। আর চারদিক থেকেই যেন পাহাড়গুলি এগিয়ে এসে আমাকে ঘিরে ধরছে। এদিকেও গভীর খদ আমার দক্ষিণে। থেকে থেকেই শূলবিদ্ধ অজগরের দেহের মত মন্দাকিনীর বিপুল কুটিল জলধারা চোখে পড়ছে। কিন্তু অদৃশ্য হয়েছে মন্দাকিনীর বিশাল উপত্যকা। ওপারের পাহাড় এখন অনেক কাছে মনে হয়। পায়ের নীচের পথও ক্রমশঃই সরু হয়ে আসছে। গজ দুই মাত্র প্রশস্ত পাথুরে পথে

সন্তর্পণে পা ফেলে হাতের লাঠির ঠকঠক শব্দ শুনে অতি কষ্টে পথ চলতে চলতে বেশ বুঝতে পারছি যে, এ কালের উন্নত স্থপতি-বিদ্যাও হার মেনেছে এই আসল হিমালয়ের কাছে। বেঁকে বসেছেন গিরিরাজ—সড়ক তৈরির জন্য আর সূচ্যগ্র ভূমিও তিনি ছেড়ে দেবেন না।

আসল কথা, ভূমিই এখানে নেই—যা কেটেকুটে সড়ক তৈরি করবে বাস্তুকার। শোণপ্রয়াগের পুল পার হয়েই দেখেছিলাম এক পাহাড়ী কিশোরকে। জলের ধারে সে খুঁড়ছে খানিকটা জায়গা, তারপর পাথর বেছে বেছে মাটি ভরছে একটি ছোট ঝুড়িতে। ওই মাটি সে পিঠে করে বয়ে নিয়ে যাবে গৌরীকুণ্ডে। আমার বিস্মিত জিজ্ঞাসার উত্তরে সে বলেছিল যে, উপরে মাটি পাওয়া যায় না বলেই তার মনিব তাকে পাঠিয়েছে নীচে থেকে মাটি নিয়ে যেতে।

তখন বিশ্বাস হয় নি ছেলেটির কথায়। কিন্তু যত উপরে উঠছি ততই বুঝতে পারছি যে, একবর্ণও মিথ্যা বলে নি সে। গৌরীকুণ্ডের পথে পাহাড় পাহাড়ই। ওর মধ্যে মাটি যদি থাকেও তবে স্বর্গের মাটি তা—মর্ত্যের মানুষের কোন কাজেই লাগবে না।

কঠিন পথ পায়ের নীচে কঠিন চড়াই ভেঙে উপরে উঠছি। ত্রিযুগীনারায়ণকে এড়িয়ে এসে কি যে লাভ হল তা বুঝতেই পারছি নে।

দেহের শ্রান্তির চেয়েও মনের অবসাদ বেশী।

রোজই তো বেশীর ভাগ পথ একা একাই চলেছি আমি। কিন্তু আজ নিজেকে আমার যেন বড় বেশী নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে।

কেবল নিঃসঙ্গ নয়, নিজেকে যেন পরিত্যক্ত বোধ করলাম ওঁদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পরেই। রামপুর থেকে মাইলখানেক পথ একসঙ্গেই এসেছিলাম। হাসি-গল্পে বেশ কেটেছিল সময়টুকু, কিন্তু ত্রিযুগীপাহাড়ের পাদদেশে আসতেই তাল কেটে গেল।

আমি যে উপরে যাব না তা বুঝি এতক্ষণ বিশ্বাস করেন নি গঙ্গোত্রী। যখন অবিশ্বাস করবার উপায় আর থাকল না তখন ক্ষুণ্ণ হলেন তিনি। কিন্তু মায়ে-ঝিয়ে তাঁরা হাসিমুখেই বিদায় নিলেন আমার কাছ থেকে।

খুবই স্বাভাবিক তাঁদের পক্ষে—তাঁরা আমার পথের সাথী বই তো নন! তবু যেন অপ্রত্যাশিত আমার কাছে। একটা যেন মোচড় লাগল আমার বুকের মধ্যে।

তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে তাকালাম জিতেনের মুখের দিকে। সে তো

আমার নিজের দলের লোক—আমার লক্ষ্মণ-ভাই। বেশ খানিকটা প্রত্যাশা নিয়েই বললাম তাকে, তোমার না গেলে হয় না জিতেন ?

কিন্তু শুনে কেবল বিরক্ত নয় সে, একটু যেন রুষ্টও। উত্তরে সে বললে, এখন না গেলে আর কি সুযোগ পাব কোনদিন ?

কি উত্তর দেব ! উত্তরের জন্য অপেক্ষাও করল না জিতেন। তরতর করে উপরে উঠে গেল সে। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই চক্রধরকে নিয়ে ওদের চারজনের দলটি একটি ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সামনে তাকিয়ে দেখি যে আমার পথ একেবারেই জনশূন্য। আমাদের কুলিরাও গৌরীকুণ্ডের দিকে এগিয়ে গিয়েছে।

জানি যে ঘণ্টাকয়েক পরেই গৌরীকুণ্ডে আবার দেখা হবে ওঁদের সকলের সঙ্গেই। তবু মনটা আমার উদাস হয়ে গেল।

আগেও তো পথে নামবার পরেই কতবার ছাড়াছাড়ি হয়েছে আমাদের। কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি আজকের ঘটনার। ইতিপূর্বে পথের টানেই ছিটকে পড়েছি আমরা, কিন্তু একই পথের আগে বা পিছে। আজ ওঁরা গেলেন তেমন দীর্ঘ না হলেও একেবারে ভিন্ন এক পথে, অন্য এক আকর্ষণে—যার তুলনায় আমার টানের জোর অনেক কম। সুতরাং এবারের ছাড়াছাড়িটা স্থূল ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করে একেবারে আমার মনের গোড়ায় গিয়ে ঘা দিয়েছে যেন।

থেকে থেকেই মৃন্ময়ীর কথা মনে পড়ছে আমার। দল তাঁদের ভেঙে গিয়েছে বলে কি দুঃখ আর দুর্ভাবনা মৃন্ময়ীর। তুলনায় আমাদের ছাড়াছাড়িটা সাময়িক। তবু ঘটনাটিকে সহজ বলে মানতে চায় না আমার মন।

দুঃখ করছে সে, না অভিমান ? ঠিক ধরতে পারি নে। একবার ভাবছি, ওরা ত্রিযুগীনারায়ণকে ছেড়ে আমার সঙ্গে এলেন না কেন ? পরক্ষণেই মনে হচ্ছে যে, আমিই ভুল করেছি ওঁদের সঙ্গে না গিয়ে।

মনের বীণায় সরু ও মোটা দুটি তার একসঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে বলেই আসল সুরটিকে সঠিক ধরা যাচ্ছে না।

কিন্তু নিঃসঙ্গতার অনুভূতি আমার নির্ভুল। গোপন মনের কোন সূক্ষ্মপথ বেয়ে সূক্ষ্মতর না জানি কোন আশাভঙ্গের বেদনা তার সঙ্গে মিশেছে বলেই আজ তীব্রতর সে অনুভূতি।

দার্শনিক হতে চেষ্টা করলাম একবার। ভাবলাম যে মহাপ্রস্থানের পথে যখন চলেছি তখন নিঃসঙ্গ হয়েছি বলে দুঃখ করব কেন ? কিন্তু বৃথা চেষ্টা।

আমি যুধিষ্ঠির নই। আর সত্যিই মহাপ্রস্থানের যাত্রীও তো নই আমি! দৈহিক কষ্ট ও মনের দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি পাব কেন আমি!

তবে শক্তি পেয়েছিলাম নিশ্চয়ই ওই দুস্তর পথে নিঃসঙ্গ যাত্রাও আমার সম্পূর্ণ করবার; কিছু সান্ত্বনা এবং ক্ষতিপূরণও।

তেমন দীর্ঘ নয় নির্দিষ্ট পথটুকু—মাইল ছয়েকেরও কম। আর ওই পথেই তো রয়েছে শোণপ্রয়াগের ফুলঝুরিও। তা থেকে যে লক্ষ লক্ষ জলকণা ছিটকে এসে পড়ল আমার মুখ ও মাথায়, তার স্নিগ্ধ প্রলেপ কি মনের গায়েও কিছুটা না লেগে পারে!

কিছু সান্ত্বনা পেলাম আরও একটি উৎস থেকে।

শোণপ্রয়াগের পুলের কাছে বাহাদুর আর ছত্রী বিশ্রাম করতে বসেছিল। আমি ওখানে পৌছতে না পৌছতেই আমার কাঁধের ঝুলিটি একরকম টেনেই নামিয়ে নিল বাহাদুর। নিয়েই সে ওটাকে বেঁধে ফেলল তার নিজের মোটের সঙ্গে। সরবে প্রতিবাদ করবার সুযোগই পেলাম না আমি। প্রায় অভিভাবকের কর্তৃত্বের স্বরেই সে বললে, ওপারে কঠিন চড়াই আছে বাবুজী। নিজে হালকা না হলে আপনি চলতে পারবেন কেন?

কিন্তু ওতেই শেষ নয়।

আমি মুগ্ধ চোখে শোণগঙ্গার অভিসারযাত্রা দর্শন করছি বুঝে আমাকে ওখানে রেখেই ওরা দুজনে এগিয়ে গিয়েছিল। পরে আমি চড়াই পথে মাইল-খানেক চলবার পর দেখি যে, বাহাদুর পথের ধারে শিলাখণ্ডের উপর একা বসে রয়েছে।

বোঝা নিয়ে চড়াই ভাঙতে খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি?—মোলায়েম সুরে জিজ্ঞাসা করলাম তাকে।

কিন্তু সবেগে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করল বাহাদুর: নহী বাবুজী।

তবে এখানে বসে আছিস কেন?

আপনি যে একা একা আসছেন।

চমকে উঠলাম—ধরা পড়ে গিয়েছি নাকি বাহাদুরের চোখে! কিন্তু তখনই আবার কানে এল তার কথা: বড় কঠিন পথ এ দিকটাতে। আপনি বাবুজী, আমার কাঁধে উঠে বসুন।

বলে কি বাহাদুর! বোঝা তো আছেই ওর পিঠে, তার উপর ঠিক

শাকের আঁটি হব না তো আমি। সেই আমাকেও সে তার সোয়ামণী বোঝার উপরে তুলে নিতে চাইছে! সবিস্ময়ে আমি বললাম, বলিস কি রে! এত ভার তুই বইতে পারবি কেন?

আগের মতই আত্মবিশ্বাস তার, সনির্বন্ধ অনুরোধও: খুব পারব বাবু।

আমি বললাম, পারলেও তা করতে যাবি কেন তুই?

হাঁটতে যে আপনার কষ্ট হচ্ছে।

ভাষা ছলনাময়ী, কিন্তু গলার স্বর আর চোখের দৃষ্টি তো মিথ্যা দিয়ে কলুষিত হয় না। আর চিত্র বা মঞ্চের অভিনেতাও নয় এই পর্বতসন্তান অ-সভ্য বাহাদুর। কিছুতেই মনে করতে পারি নে আমি যে, তার মনের আসল ভাব মুখে প্রকাশ করে নি সে। চোখের দর্পণে ওর মনটাকে যে স্পষ্ট দেখছি আমি।

বুকের মধ্যে প্রচণ্ড একটি দোলা লাগল আমার—তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

তবুও আবার অনুরোধ করে বাহাদুর: আ জাইয়ে বাবু।

উত্তরে যা আমার বলা উচিত ছিল তা বলতে পারলাম না। বরং ধমক দিলাম তাকে: দূর বোকা! আমি তোর কাঁধে চাপলে দুজনেই গড়িয়ে পড়ে মারা যাব যে!

শুনে নিরাশ হল বাহাদুর। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর সে ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বললে, তা হলে বাবুজী, আমার আগে আগে কাছাকাছি চলুন আপনি, যাতে আমি চোখে চোখে রাখতে পারি আপনাকে।

তাই চললাম বাকি পথটুকু। মাইল দুয়েক মোটে দূরত্ব। তবু থেমে এবং বসে বিশ্রাম করলাম বারকয়েক। আর অমনি এক বিশ্রামের ফাঁকেই দেখলাম সেই কুকুরটিকে।

আকস্মিক দর্শন। মনে হল যেন মাটি ফুঁড়ে উঠেছে। খুব বড় নয়, দেহের তুলনায় মুখটা তার আরও ছোট—প্রায় কচি শিশুর মুখের মতই কাঁচা ও কোমল মনে হয়। কিন্তু বলিষ্ঠ গঠন তার, আর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার ছোট ছোট দুটি চোখে। সারা গায়েই লম্বা লম্বা লোম, আগাগোড়া কালো। প্রায় দুই ইঞ্চি প্রশস্ত ইস্পাতের ঝকঝকে বকলস আঁট করে বাঁধা আছে তার গলায়। হঠাৎ ওকে কাছে দেখে চমকে উঠেছিলাম আমি।

কিন্তু বাহাদুর বুঝিয়ে বললে যে উপরে কোন মেষপালকের পশুপাল চরে

বেড়াচ্ছে হয়তো। [illegible] পোষা পাহারাওয়ালা কুকুর এটি। নীচের পথে মানুষের সাড়া পেয়ে নেমে এসেছে। অথবা গৌরীকুণ্ড থেকেও এগিয়ে আসতে পারে। সরকারী কুকুর আছে সেখানে, আছে কোন কোন চটিওয়ালারও। সব চটিতেই থাকে এমন কুকুর। রাত্রে চটি পাহারা দেয় তারা, দিনের বেলায় মনিবের ছাগল-মোষ পাহাড়ের উপর চরতে গেলে সঙ্গে গিয়ে তাদের খবরদারি করে। যাযাবর পশুপালকের প্রয়োজনে ভাড়াও খাটে এই সব কুকুর।

নেকড়ে বা চিতাবাঘের চেয়েও নাকি তীক্ষ্ণ এদের দাঁত ; গায়ের জোরও কম নয়।

ওই 'বাঘ' শব্দটির প্রভাবেই নিশ্চয়ই বিদ্যুদ্দীপ্তির মত আমার মনে পড়ে গেল অনেক বৎসর পূর্বে রুদ্ধনিশ্বাসে যা পড়েছিলাম সেই জিম করবেটের বইতে রুদ্রপ্রয়াগের মানুষখেকো চিতাবাঘের প্রায়-অলৌকিক কুকীর্তিগাথা। আশ্চর্য! সেই রুদ্রপ্রয়াগ অতিক্রম করে গাড়োয়াল জিলায় কত বনের ভিতর দিয়ে অনেক সময় একা একা চলতে চলতেও একদিনও সে কাহিনী বা বাঘের ভয় একবারও মনে জাগে নি কেন? সে বাঘটা যে অবশেষে মারা পড়েছিল তা নিশ্চিত জানি বলেই অমন তামসিক বিস্মৃতি আমার, না, মন আমার সুদৃঢ় আশ্বাসের প্রসাদ পেয়েছে অন্য কোন উৎস থেকে?

এখন মনে পড়বার পরেও করবেটের সেই শয়তান বাঘটাকে কল্পনার চোখে অস্পষ্ট ভাবে দেখতে দেখতেও হালকা কৌতূহলের স্বরেই জিজ্ঞাসা করলাম আমি, বাঘটাঘ আছে নাকি এ সব পাহাড়ে?

আমারই মত নির্ভয় বাহাদুরও। সে হেসে উত্তর দিল, উপরের জঙ্গলে থাকে তারা। ছোট ছোট জানোয়ার সব। মানুষের কাছ দিয়েও ঘেঁষে না। কুকুরের সঙ্গে লড়াই হলে হেরে যায়, মারা পড়ে।

আশ্বস্ত হবার মতই খবর। কিন্তু বিশ্বাস হয় না। আমার সন্দেহ বুঝতে পেরে নিজেই বুঝিয়ে বললে বাহাদুর।

ওই যে বকলস আছে কুকুরের গলায়, নেকড়ের দাঁত তা ভেদ করতে পারবে না। কিন্তু কুকুরের তীক্ষ্ণ দাঁতগুলি চক্ষের নিমেষে নেকড়ের গলার মাংস ভেদ করে ঢুকে যাবে। তা ছাড়া নেকড়ে বা চিতা আসে একক, কুকুর থাকে জোড়া জোড়া। একটি নেকড়ে বা চিতা যত বলবানই হোক না কেন, দুটি কুকুরের সঙ্গে লড়ে সে জিততে পারবে কেন? তাই পালিয়ে যদি সে বাঁচতে না পারে তবে কুকুরের সঙ্গে যুদ্ধে মৃত্যু তার অনিবার্য।

কিন্তু অতবড় যোদ্ধা যে কুকুর সে দেখতে অত [illegible] কেন? [illegible]রের মুখে গল্প শোনবার পর আবার কুকুরটির দিকে তাকিয়ে দেখি যে, সে একদৃষ্টে আমাদের দিকে চেয়ে আছে বটে, তবে দৃষ্টিতে তার একটুও হিংস্রতা নেই।

তবু সন্ত্রস্ত কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করলাম আমি, এটা কামড়াবে না তো?

না বাবুজী।—হেসে উত্তর দিল বাহাদুর: দিনের বেলায় কাউকে কিছু বলে না ওরা। আর যাত্রীকে রাত্রেও চিনতে পারে।

সত্যিই নিরীহ জীব মনে হচ্ছে কুকুরটিকে। আমরা উঠে চলতে আরম্ভ করবার পর দেখি যে, পোষা কুকুরের মতই ওটি আমার পিছনে পিছনে আসছে।

আবার পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থানের কাহিনী মনে পড়ে গেল আমার। ভুল করেছিলাম তখন। যুধিষ্ঠির তো সে যাত্রায় একেবারে নিঃসঙ্গ কখনও হন নি—একটি কুকুর স্বর্গ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে গিয়েছিল।

মনে পড়বার পরেই আরও ভাল লেগেছিল কুকুরটিকে। কিন্তু তখনই পিছন ফিরে আর দেখতে পেলাম না তাকে। কোন্ ফাঁকে কোন্ দিকে যে গেল সে, তা বাহাদুরও বলতে পারে না।

একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম বইকি! কিন্তু মিনিট দশেক পর অভ্যাসমত আবার পিছন দিকে তাকিয়ে দেখি—কুকুরটি আমার পিছনে না থাকুক, হাতের গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ভারবাহী বীরবাহাদুর আমার অনুসরণ করছে।

আবার চকিত বিদ্যুদ্দীপ্তি আমার মনে। চোখের সামনে উপস্থিত না থাকলেও সেই কুকুরটিকে এখন আমার আরও বেশী ভাল লাগছে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তার। সে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে যে, আমার মঙ্গলকামনায় আমাকে তার অনুসরণ না করলেও চলে।

এ পথের সর্বত্রই দেখছি যে, চটির এলাকায় ঢুকলেই প্রতিটি দোকান থেকেই সাদর সম্ভাষণ কানে আসে। গৌরীকুণ্ডের অভ্যর্থনা পেলাম বসতি এলাকায় ঢোকবার আগেই।

বেশ সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন রূপ গৌরীকুণ্ডের। গুপ্তকাশী ছাড়বার পর এমন আর চোখে পড়ে নি। শহর বলেই মনে হয়। অনেকগুলো বাড়ি—সব কখানাই পাকা। আরও বৈশিষ্ট্য গৌরীকুণ্ডের—দুই থাকের বসতি এটি। মে

পথে [illegible] পথ দেখি উপর [illegible] চলে গিয়েছে। সেই পথ থেকেই একটি শা[illegible] বেরিয়ে গিয়েছে নীচের থাকের ভিতর দিয়ে। ঘরবাড়ির সংখ্যা নীচেই বেশী। খোলামেলা একটি চত্বরও উপর থেকেই চোখে পড়ল সেখানে—যা ধর্মশালার প্রাঙ্গণও হতে পারে, আবার বাজারও। কোন্ দিকে যাব ঠিক করতে না পেরে থমকে দাঁড়িয়েছিলাম সেই মোড়ে।

আর সেখানেই আমার মুখোমুখি থমকে দাঁড়ালেন যিনি হন হন করে উপর থেকে নীচে, মানে রামপুরের দিকে যাচ্ছিলেন—সুঠাম, দীর্ঘ দেহ; তেমন উজ্জ্বল না হলেও গৌরবর্ণ, গায়ে সুতির কামিজ। হাতে তার লাঠি নেই দেখেই বুঝলাম যে, তিনি আমাদের মত বিদেশী যাত্রী নন।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি তো বাঙালী—কলকাতা থেকে আসছেন?

ভাষা বাংলা, কিন্তু উচ্চারণে একটু আড় আছে। আমি ঘাড় নেড়ে স্বীকার করা মাত্রই তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, রামকৃষ্ণ মিশনের শিষ্য নাকি আপনি?

চটিওয়ালাদের সম্ভাষণের মাধুর্য নেই তাঁর কথায়। কেমন যেন জেরার সুর। চোখের দৃষ্টিতে তাঁর তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা রয়েছে বলেই যেন তাঁর সুরটা অত বেশী কানে লাগল আমার। ঈষৎ বিরক্ত হয়েই আমি বললাম, কেন বলুন তো?

উত্তর তৎক্ষণাৎ আমার কথার পিঠেই: আমার নাম মহাদেবপ্রসাদ। রামকৃষ্ণ মিশনের পাণ্ডা কিনা আমি, তাই জিজ্ঞাসা করছি আপনাকে।—বলতে বলতে হাসলেন তিনি।

হাসলাম আমিও। পাণ্ডা না হলে কি আর অত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে কারও চোখে! অমন জেরা করে কেউ! তবে খুশীও হয়েছি। গুপ্তকাশীতে চক্রধরের সঙ্গে যখন রফা হয় আমাদের তখনই জিতেনের মুখে শুনে মহাদেবপ্রসাদ উপাধ্যায়ের নামটা আমার মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। কেদারনাথের পাণ্ডা ইনি। কেদারে পৌছবার পূর্বেই তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন পেয়ে এখন খুশী হব বইকি!

এরপর সহজভাবেই কথা বললাম তাঁর সঙ্গে। বললাম তাঁকে চক্রধরের কথাও—প্রশংসার সুরেই বললাম। সত্যিই কিছু উপকার তো আমরা পেয়েছি তার কাছে। জিতেনদের সঙ্গে ত্রিযুগীপাহাড়ে উঠে গিয়েছে চক্রধর, তাদের সঙ্গেই সেও এখানে এল বলে।

কিন্তু মহাদেবপ্রসাদ দেখি একটু যেন ক্ষুণ্ণ। [illegible]ন, হরিদ্বার থেকে বাবুজী, একখানা যদি চিঠি লিখে [illegible] তা হলে এত আগে কেদার থেকে নেমে আসতাম না আমি। তবু কে[illegible] ভাবনা নেই আপনাদের। আজ এখান থেকেই আমার গোমস্তাকে আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। সে আপনাদের উপযুক্ত যত্ন-সমাদর করবে। আমি ওখানে না থাকলেও কোন কষ্ট হবে না আপনাদের। কজন আছেন আপনারা? নাম বলুন তো।

তখনই টুকে নিলেন তিনি। শুধুই কি তাই! নীচের থাকে ঠিক গৌরীকুণ্ডের ধারে ভাল একখানা চটিতে আমার থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। বারবার হুঁশিয়ার করে দিলেন চটিওয়ালাকে যাতে আমার বা আমার দলের কারও কোন অসুবিধা না হয়।

বিদায় নেবার আগে মহাদেবপ্রসাদ সতর্ক করে দিলেন আমাকে: অনেক বেলা যদি থাকেও, তবু বাবু, আজ এখান থেকে যাত্রা করবেন না। সামনে পথ মোটে সাত মাইল হলে কি হবে, এইটুকুই হল কেদারের বিকট পন্থ।

শুনে আসছি কথাটা কলকাতা ছাড়বার আগে থেকেই। শেষের এই পথটুকু সম্বন্ধে আমার একাধিক অভিজ্ঞ বন্ধু বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন আমাকে। সেই সব স্মরণ করে বিজ্ঞের হাসি হেসেই আমি বললাম, না পাণ্ডাজী, আজ তো যাবই না, কালও একদিনে সবটা পথ চলবার ইচ্ছে নেই আমার। রামোয়াড়াতে রাত্রিবাস করব।

শুনে তৎক্ষণাৎ সায় দিলেন মহাদেবপ্রসাদ: তাই ভাল বাবু। শরীর মন দুই-ই ভাল থাকবে তাতে। আর তাড়াহুড়ো করে যাবার দরকারই বা কি! কেদার-বদরীতে বরফ পড়তে এখনও ঢের দেরি।

গঙ্গোত্রীর তাড়াতেই আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল তা। সেদিন রামপুর থেকে খুব ভোরে যাত্রা করেছিলাম। সুতরাং পথে অনেক জায়গায় বিশ্রাম করে ধীর-মন্থরগতিতে এগিয়ে এলেও বেশ সকাল সকাল গৌরীকুণ্ডে পৌঁছে গিয়েছি। জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখবার পর ঘড়িতে দেখি যে তখনও দশটা বাজে নি।

জানি যে এখানে এসে পৌঁছতে দেরি হবে ওদের। তাড়াতাড়ি রান্না চাপাবার দরকার নেই। সুতরাং স্নানের আয়োজনও আমার চলল মন্থরগতিতেই।

...ছি তার [illegible] আসল গৌরীকুণ্ড—এখানেই নাকি ঋতুস্নান [illegible] মা। কেবল নামে নয়, আসলে এটি কুণ্ডই। হাত দশেক [illegible]য়তো লম্বা, চওড়াও তেমনি। ঠিক কানায় কানায় না হলেও প্রায় পরিপূর্ণ। যাত্রী-সড়কের গা ঘেঁষে অবস্থিতি ওর। সেই সড়ক ভেদ করে উপরের পাহাড় থেকে কুণ্ড পর্যন্ত কোন নল নিয়ে আসা হয়েছে কি না কে জানে। কিন্তু এদিক থেকে বাঁধের মত উঁচু সড়কের নীচের দিকে ফুটো ও নল দুই-ই বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। সেই নল দিয়ে অনবরত জল পড়ছে কুণ্ডের মধ্যে। পড়ন্ত জল দেখতে সাধারণ জলের মতই, কিন্তু কুণ্ডের জল হলদেটে। ওই রঙটাই আরও একটু ঘন হয়ে দুধের সরের মত কুণ্ডের জলের উপর এখানে-সেখানে ভাসছে এবং মলমের মত লেগে আছে নলের মুখে। ঠাণ্ডা জল। সব মিলিয়ে গৌরীকুণ্ড পল্লীবাংলার পানাপচা খিড়কির ডোবার মত।

যাত্রীরা, বিশেষতঃ সধবা ও কুমারী মেয়েরা নাকি পরম ভক্তিভরে এই গৌরীকুণ্ডে অবগাহন স্নান করে। কিন্তু সেদিন ওই কুণ্ডে একজন স্নানার্থীও চোখে পড়ল না আমার। আমি নিজে ওই জলে স্নান করবার কথা ভাবতেও পারি নে। সুতরাং এগিয়ে গেলাম উত্তরে তপ্তকুণ্ডের দিকে। সেটিও ওই নীচের থাকেই—বেশী দূরেও নয়।

কোন অদৃশ্য উৎস থেকে যেন এই কুণ্ডেও জল আসছে। ওদিকে ঠাণ্ডা কুণ্ডে যেমন, এই কুণ্ডের গায়েও তেমনি দেখা যাচ্ছে একটি নলের মুখ। তবে এ জল গরম, এ কুণ্ড আকারে অপেক্ষাকৃত বড়। এর পরিবেশও ঢের বেশী পরিচ্ছন্ন ও সমৃদ্ধ। গুপ্তকাশীতে যেমন দেখেছিলাম তেমনি চকমিলান গঠন এখানেও। প্রাঙ্গণের ঠিক মাঝখানে কুণ্ড। পারে গৌরীদেবীর মন্দির। স্ত্রী-পুরুষ কজন যাত্রী দেখলাম স্নান করতে এসে কুণ্ডের চারিদিকে ছড়িয়ে বসেছে। মাহাত্ম্যের কথা বলতে পারি নে, জনপ্রিয়তা দেখলাম এই তপ্তকুণ্ডেরই বেশী।

আর হবেই বা না কেন! একে তো এ কুণ্ডের জল পরিষ্কার সাদা, তায় আবার উষ্ণ সে জল। ছ হাজার ফুটেরও বেশী উঁচু এই গৌরীকুণ্ড বসতি। বেশ শীত এখানে। ঘরে গিয়ে গায়ের জামা ছাড়বার পর কাঁপুনি ধরেছিল। কুণ্ডের প্রাঙ্গণে চনচনে রোদ আছে বলেই আদুড়-গা হতে পেরেছি এখন। এ-হেন জায়গায় একেবারে নিখরচায় ও বিনা পরিশ্রমে যত খুশী গরম জল যদি পাওয়া যায় তবে তার কদর হবে বইকি! আমি তো তপ্তকুণ্ডের খবর পেয়েই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম।

কিন্তু বড্ড গরম ওই কুণ্ডের জল। [illegible] টি জলে ডোবাতেই এমন ছেঁকা লাগল যে, চমকে হাত টেনে [illegible] তারপর যখনই চেষ্টা করি তখনই ওই একই অভিজ্ঞতা। অত ত[illegible] জলের কুণ্ডের মধ্যে নেমে ডুব দিয়ে যে স্নান করা যায় তা আমার বিশ্বাসই হয় না। মন্দিরের পূজারী অভয় দিল আমাকে, উৎসাহও দিল। কিন্তু সাহস হয় না আমার। আধ ঘণ্টাখানেক ওখানে বসে থেকেও ডুব দিতে দেখলাম না একজনকেও। যে দু-একজনকে যাত্রী বলে মনে হচ্ছিল তারাও দেখি ঘটি ডুবিয়ে জল তুলে তাই অল্প অল্প গায়ে ঢালছে।

ততক্ষণে আমার কানে অন্য একটি নিমন্ত্রণ এসে পৌঁছেছে। সেই পরিচিত গর্জনধ্বনি মন্দাকিনীর। শুনলাম যে খুব কাছেই আছেন তিনি। আর দেখি যে সত্যিই তাই। কুণ্ড থেকে দু মিনিটেরও পথ নয়। আর তেমন খাড়াও নয় পাড়। অন্যত্র যেমন দেখেছি এখানেও তেমনি ভয়ঙ্কর রূপ মূল ধারার। কিন্তু তীর থেকে তা অনেক দূরে। পাড়ের কাছে ছোটবড় অসংখ্য শিলাখণ্ডের গা ঘেঁষে বা উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সেই মন্দাকিনীরই যে জল ছুটে চলেছে তাতে তীব্র গতি থাকলেও গভীরতা মোটেই নেই। পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত সেই জলে ডুবিয়ে কোন একখানি শিলাসনে নির্ভয়ে বসে তোয়ালে ভিজিয়ে গা রগড়ানো যায় এখানে, ঘটি ভরে জল তুলে মাথায় ঢালা যায়।

তপ্তকুণ্ডের জল যত গরম, মন্দাকিনীর জল তত ঠাণ্ডা। এ জলেও আঙুল ডুবিয়েই একেবারে বিপরীত কারণে তৎক্ষণাৎ হাত টেনে নিয়েছিলাম। তবু দেখি যে মন্দাকিনী আমায় টানছেন। টানের চেয়েও বেশী—সেই যে কনখলের গঙ্গায় একটি ডুব দেবার পরেই গঙ্গা-স্নানের নেশা লেগেছিল আমার, এ সেই নেশা। কুণ্ডচটি ছাড়াবার পর এ কদিন মাঝে মাঝে মন্দাকিনীর দর্শন পেলেও স্পর্শ আর পাই নি। আজ তা লাভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার মাতাল হয়ে উঠল আমার মন। এক নিমেষেই শীতের ভয়, নিউমোনিয়ার ভয় দুই-ই কাটিয়ে উঠল।

অবগাহন স্নান নয়, তবু তাতেই পরম তৃপ্তি। ক্লান্ত দেহ ও ক্লিষ্ট মন আমার সঞ্জীবিত হয়ে উঠল যেন। গঙ্গার প্রসাদ বলব নাকি একে! যাই হোক, এ যাত্রায় গঙ্গাস্নানের আনন্দ নিঃসংশয়ে আমার এক পরম লাভ।

॥ ১৩ ॥

'ভুংক্তে ভোজয়তে চৈব'। শাস্ত্রমতে নিমন্ত্রণ খাওয়ার মত খাওয়ানোও প্রীতির লক্ষণ। আগের দিন গঙ্গোত্রী আমাদের জন্য ভাতে-ভাত রেঁধে রেখেছিলেন। আজ তাঁদের জন্যও রেঁধে রাখলাম আমি। অতিরিক্ত কেবল ডাল। বাহাদুর অনেক খুঁজেও এক চিলতে সবজিও সংগ্রহ করতে পারে নি।

রান্না শেষ করে আমি যখন বারান্দায় এসে বসলাম তখনও রোদ ছিল। কিন্তু হঠাৎ নিভে গেল তা। মেঘে মেঘে ঢেকে গেল আকাশ। গুরুগুরু গর্জন কানে এল কয়েকবার। তারপর ঝম ঝম বৃষ্টি শুরু হল।

এ আর কি দেখছেন!—বললেন চটিওয়ালা শেঠজী: বরফ পড়া যদি দেখতেন তবে বুঝতেন যে কি সুখে আমরা এখানে থাকি। দেখতে দেখতে সব ঢেকে যায়—পথ-ঘাট আর ঘরের চালের মত গাছপালাও সাদা হয়ে যায়।

সে সব স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনা নয় শেঠজীর কাছে। সশঙ্ক সম্ভ্রমে দুই যুক্ত কর ললাটে ঠেকিয়ে নিজের কথার ব্যাখ্যা নিজেই করেন তিনি: সবই কেদারনাথজীর লীলা। প্রলয়ের দেবতা তিনি—সবকিছু তছনছ করে দেন। তাতেই তাঁর আনন্দ।

সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত শেঠজীর ওই কথা। আর প্রবল উত্তেজক স্মৃতি ও কল্পনার। নটরাজের রূপ মনে পড়ে গেল আমার; মনে এল গুরুদেবের গানের দু-একটি কলিও—'প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে, হে নটরাজ'—

তবে মাটির মানুষ আমি—স্বর্গ থেকে তখনই মর্ত্যে নেমে এল আমার মন। ভাবানুষঙ্গে গঙ্গোত্রীকেও মনে পড়ে গেল। গুরুদেবের রচনা কিছু কিছু পড়েছেন তিনি, অথবা অন্য কেউ তাঁকে পড়ে শুনিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এখন এখানে তিনি উপস্থিত থাকলে সুরে না পারি, কবিতার ছন্দে ওই গানখানি শুনিয়ে দিতাম তাঁকে।

তখন কি আর জানি যে, আমাদের দলটিকে নিয়েও নটরাজের কৌতুকলীলা শুরু হয়ে গিয়েছে!

সেই যে তাল কেটে গিয়েছিল তারপর আসর আর তেমন জমল না।

শেষ বেলায় ফিরে এলেন তাঁরা। কিন্তু একা চক্রধরকে ছাড়া আর কাউকে যেন চেনাই যায় না।

গায়ে বর্ষাতি চাপিয়েও ভিজে ঢোল হয়েছে; [illegible] জায়
অতিরিক্ত কাদার প্রলেপ। মুখে-চোখে কালি পড়েছে। [illegible] চোখ
দুটিতে মনে হচ্ছে দৃষ্টি একেবারেই নেই—গঙ্গোত্রীর কাঁধে ভর দিয়ে এগিয়ে
আসছেন তিনি। জিতেনের মুখের ভাব অপ্রসন্ন, আর কেমন যেন উদাস
দৃষ্টি তার চোখে।

একটু সজীবতা যা আছে একা ওই গঙ্গোত্রীর মনেই। তাই ক্লিষ্ট মুখেও
অল্প একটু হাসি ফুটিয়ে তিনি বললেন, খুব শিক্ষা হল আজ। ভিজতে ভিজতে
কেবলই মনে হয়েছে যে পঞ্চকেদারের রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করে আছেন
যে নারায়ণ, তাঁকেই আগে দর্শন করতে গিয়েছি বলে রুষ্ট কেদারনাথ আমাদের
সাজা দিচ্ছেন।

আসলে অনুতপ্ত তিনি অন্য কারণে—বৃদ্ধা জননীর জন্যে রামপুরেই কাণ্ডি
ভাড়া করেন নি বলে। তখনই তিনি ঘোষণা করলেন যে অতঃপর মাকে
তিনি এক পাও হাঁটতে দেবেন না।

জিতেনের মুখ ভার হয়েছে নৈরাশ্যে। মনের মত কিছুই দেখতে পায় নি
সে, কারণ নীচেও যেমন, উপরেও তাই।

আপনিই, মণিদা, বুদ্ধিমান।—এই প্রথম মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করল সে:
একেবারে অনর্থক হেঁটেছি অতিরিক্ত ছ মাইল পথ। ব্যর্থশ্রম বলেই ক্লান্তিও
বোধ করছি বেশী।

সুতরাং আমি আশা করেছিলাম যে বিশ্রাম করবার সুযোগ পেলে জিতেন
ছাড়বে না তা। এবং সেইজন্যই বৃদ্ধার একটু জ্বর-জ্বর ভাব দেখে পরদিন ভোরে
গঙ্গোত্রী যখন আমাদের ঘরে এসে বললেন যে সে দিনটা তাঁরা গৌরীকুণ্ডেই
বিশ্রাম করতে চান তখন আমি খুব উৎসাহের সঙ্গেই এ প্রস্তাব সমর্থন করে
বললাম, বেশ তো, তীর্থবাসের কালটা আমাদের আরও চব্বিশ ঘণ্টা বাড়বে
তাতে।

কিন্তু ফস করে অস্বীকার করে বসল জিতেন: না মণিদা, আর দেরি
করতে মন চায় না আমার।

কেন হে?—বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

উত্তর না দিয়ে আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করল জিতেন: ভাল
লাগছে না।

[illegible] তো অসামাজিক [illegible] জিতেনের, তার ওপর বলবার ধরনটাও তার রূঢ়। শুনে অপ্রতিভের একশেষ আমি।

কিন্তু গঙ্গোত্রী মুচকি হেসে বললেন, কালই তো ভাইয়া ত্রিযুগী পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে উঠতে চেয়েছিলেন। তখনই বুঝেছিলাম আমরা যে কেদারনাথ দর্শন করবার জন্যে ওঁর মন ব্যাকুল হয়েছে। তা বেশ তো, এগিয়ে যান আপনারা। বরং কেদারে গিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন।

তবু লজ্জা যায় না আমার। ওঁদের মা ও মেয়েকে সহযাত্রী হিসাবে পাবার জন্য আমরাই আগ্রহ প্রকাশ করেছিলাম বেশী। অথচ বৃদ্ধাকে অসুস্থ জেনেও একটি দিন মাত্রও অপেক্ষা করতে চায় না জিতেন। ততক্ষণে পায়ে পট্টি বাঁধতে শুরু করেছে সে। তার মুখের ভাবও দেখি অসাধারণ রকমের গম্ভীর। আর একবার তাকে অনুরোধ করতে সাহস হল না আমার। নিজের লজ্জা ঢাকবার জন্য উত্তরে গঙ্গোত্রীকে আমি বললাম, না মা, কেদারে পৌঁছবার আগেই আবার দেখা হবে আমাদের। কলকাতা থেকেই ঠিক করে এসেছি আমি যে, রামোয়াড়া চটিতে রাত্রিবাস করতে হবে শেষ পরীক্ষাটা পাস করবার মত শক্তি সঞ্চয় করবার জন্যে। সুতরাং আজ সেই পর্যন্ত গিয়েই আমাদের হাঁটা শেষ। কাল সকালেও সেখানেই তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করব আমরা।

বলতে বলতে আড়চোখে জিতেনের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। পাছে জিতেন প্রতিবাদ করে সেই ভয়। সে কিছুই করল না দেখে মনে মনে একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম আমি।

এবার আসল কেদারের পথ—সত্যিই বিকট পন্থ।

পথ বলে মনেই হয় না। খাঁজ-কাটা থাকলে বলতে পারতাম যে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছি। একতলা থেকে দোতলায়, দোতলা থেকে তিনতলায়, উপর থেকে আরও উপরে। আর তা কলকাতায় নয়, কাশীর বিশ্বনাথ গলিতে প্রাসাদের মত কোন একটা বাড়িতে—তেমনই ঘেরা, তেমনই সংকীর্ণ, তেমনই কঠিন, তেমনই খাড়া ওই পথ। কিন্তু ধাপ নেই, তাই যেন হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড়ে উঠছি। আগাগোড়া পাথরের পাহাড় এদিকে। উপরে গাছপালা খুবই কম, পায়ের কাছে ঘাস বা গুল্মের মত যা আছে তাও মনে হয় যেন পাথর। উতরাই আর নেই—এবার একটানা চড়াই। এ পথও যদি আর সব পার্বত্য পথের মতই ঘুরে ঘুরে গিয়ে থাকে তবে তা বোঝবার জো নেই।

মস্ত মনোযোগই তো নিজের পা-তুখানির দিকে—[illegible]
বেশী দেখাই যায় না। সেটুকুর গতি সর্বত্রই দেখছি উর্ধ্বমু[illegible]

মানসিক, দৈহিক ও পারিপার্শ্বিক প্রত্যেকটি অবস্থাই সপ্তপদীর প্রতিকূল। তবু এ যাত্রায় ওই সপ্তপদী গতি আমার—মানে, পাঁচ-সাত পা চলবার পরেই থমকে দাঁড়াতে হচ্ছে। কারণ, হয় পা ভেঙে আসছে, নয় দম বন্ধ হবার উপক্রম। ক্রমান্বয়ে লজেঞ্চ বা মিছরির টুকরো মুখে পুরেও শুকনো জিভ আর তালু সরস রাখতে পারছি নে। এত তুঃখেও হাসি পাচ্ছে আজ—গত কদিন চড়াই ভাঙতে যে কষ্ট পেয়েছি তাকেই কষ্ট মনে করেছি বলে।

শুনি যে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে এই পথের উপরেই পুরু হয়ে বরফ পড়ে থাকে। কোথাও পাথরের মতই শক্ত, কোথাও আবার দইয়ের মত কাদা কাদা। কিন্তু সর্বত্রই স্বগুণে তুষারশীতল। সাধে কি আর বিকট পন্থ বলে একে!

সেই আবদার আবার আজ সকালেও করেছিল বাহাতুর—আমাকেও সে তার পিঠে তুলে নেবে। ধমক খেয়ে মুখ কাঁচুমাচু করে সে বললে: তা হলে বাবুজী, ঘোড়ায় চেপে চলুন আপনি—সামনে বড়ই কঠিন পথ।

কঠিন পথ কথাটা শুনে শুনে সঙ্কল্পও কঠিন হয়েছে আমার। যত কষ্টই হোক না কেন, পায়ে হেঁটেই এ পথ অতিক্রম করব আমি। সুতরাং বাহাতুরের বিকল্প প্রস্তাবও অগ্রাহ্য করেছিলাম।

তাই শুনেই বাহাতুর বললে, ঘোড়ার ভাড়া আমার মজুরি থেকে কেটে নেবেন বাবু।

ড্যাবডেবে চোখ তুটির দিকে চেয়ে কথা তার অবিশ্বাস করতে পারি নি বলেই এবার আর মুখ ফুটে প্রত্যাখ্যান করতে পারি নি তার অনুরোধ। কিন্তু নিজের সঙ্কল্পে আমি অটুট থেকে হেঁটেই রওনা হয়েছিলাম গৌরীকুণ্ড থেকে।

খানিকটা চলবার পরেই বেশ বুঝতে পারলাম যে, আমার মনের একটা অংশ এখন হায় হায় করে অনুতাপ করছে।

পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থানের কাহিনী আবার বারবার মনে পড়ছে আমার। দ্রৌপদী থেকে শুরু করে পাঁচজনের পতন যে হয়েছিল তা বোধ হয় এই শেষের সাত মাইলের মধ্যে।

৬০০০ ফুট লেখা দেখেছিলাম গৌরীকুণ্ডে ঢোকবার মুখে। এবার ৭০০০

ফু[illegible] [illegible]না চোখে পড়ল। [illegible]ার দোখ ওখান থেকে ছ মাইল। মানে, দূরত্বের হিসাবে যে পথটুকু এক মাইলেরও কম, সেইটুকুই আকাশের দিকে উঠে গিয়েছে পুরো ১০০০ ফুট। কৌতূহলী হয়ে ঘড়ি দেখলাম—এটুকু পথ আসতে আমার লেগেছে প্রায় এক ঘণ্টা।

আরও খানিকটা এগিয়ে দেখি, সড়ক থেকে কিছুটা উপরে ভাঙা ভাঙা একখানি কুটির। কাছেই নেড়া নেড়া একটি গাছ। ঘরের চাল আর গাছের ডালে ডালে দেখি ছোট ছোট অসংখ্য জীর্ণ কাপড়ের টুকরো ঝুলছে।

মানুষের থাকবার ঘর নয়, ভৈরবের মন্দির। চীরবাসা ভৈরব। মন্দিরের সামনেই একখানি পাথরের উপর জিতেন বসে রয়েছে। কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি তার চোখে।

বোধ করি মন্দিরের পুরোহিতই হবেন তিনি যিনি বুঝিয়ে বললেন আমাকে।

কেদারক্ষেত্রের দ্বারপাল চীরবাসা ভৈরব। তাঁকে পূজায় সন্তুষ্ট করে তাঁর অনুমতি লাভ করতে পারলে তবেই কেদারনাথের দর্শন পাওয়া যাবে।

এত যাঁর ক্ষমতা, কি দিয়ে সন্তুষ্ট করতে হবে তাঁকে!

উত্তর হল: জীর্ণ চীরমাত্র—ইনি যে চীরবাসা ভৈরব।

তাই গাছের ডালে ডালে ঝুলছে ওই জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডগুলি।

নিজের দৈহিক অবস্থার তাগিদেই হবে, মাথায় আমার একটা ব্যাখ্যা এসে গেল ভক্তের কাছে অমন শক্ত ভৈরবের অত তুচ্ছ দাবির।

জিতেনকে উদ্দেশ করে হেসে বললাম আমি, গায়ের কাপড় তো ছার, হালকা হবার জন্যে দেহটিকেই তো এখানে ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে হয়। আর এই দুর্গম পথে এতদিন হেঁটে আসবার পর পরিধেয় বস্ত্র চীর হবে না তো কি?

কিন্তু পরিহাসের ধার দিয়েও গেল না জিতেন। রীতিমত গম্ভীর স্বরে সে বললে, না মণিদা, আমার মনে হয়, পুজোর এই যে অসাধারণ উপকরণের দাবি এখানে, অত্যন্ত গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ আছে তার। ভোগের সর্বশেষ উপকরণের সঙ্গে লজ্জাটুকুও এই ভৈরবের চরণে উৎসর্গ করতে না পারলে কেদারনাথের দর্শন পাওয়া যায় না—তিনি যে সর্বত্যাগী শিব।

শুনে বিস্মিত হয়ে বললাম আমি, ব্যাপার কি জিতেন? এত সব তত্ত্বকথা তোমার মনে আসছে কেন?

অল্প একটু হেসে জিতেন উত্তর দিল, আসবে না? কত উপরে উঠে এসেছি একবার ভাবুন তো!

বলেই উঠে দাঁড়াল সে। পরক্ষণেই অ[illegible] তার। [illegible] অনুসরণ করছি কি না দেখবার জন্য একবারও পিছন ফিরে তাকাল [illegible]

বাহাদুরেরও চোখ এড়ায় নি। নিজের মোট পিঠে তুলে নেবার আগে ক্ষুণ্ণকণ্ঠে সে বললে, ছোটা বাবুজী ন মালুম কিসলিয়ে উদাস হো গয়া।

কেদারপথের শেষ চটি রামোয়াড়া। ৮০০০ ফুট উঁচুতে মন্দাকিনীর পারে স্বল্পপরিসর ঢালু পাথর জাতের জমির উপর চার-পাঁচখানা চালাঘর ও একখানি মাত্র দ্বিতল কাঠের বড় যাত্রী-নিবাস নিয়ে এ পথে শেষ বিশ্রামস্থান ক্লান্ত যাত্রীদের। চার মাইলেরও কিছু কম পথ পাকা সাড়ে তিন ঘণ্টায় অতিক্রম করে সেই অর্ধমৃত অবস্থাতেও এই ভেবে মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম আমি যে, অন্ততঃ সে দিনের মত চলা আমাদের শেষ হয়েছে।

অথচ ঠিক তখনই জিতেন বললে, এখানে শুনছি যে দুধের সঙ্গে আটার রুটিও কিনতে পাওয়া যায়। একটু বিশ্রাম করবার পর তাই কিছু খেয়ে চলুন যাওয়া যাক। বেলা তো এখন বারোটাও বাজে নি, আর সামনে পথ বাকি আছে মোটে তিন মাইল।

পরিহাস মনে করতে চেয়েও পারি নে—জিতেনের মুখের ভাবে সঙ্কল্পের দৃঢ়তার সঙ্গে কেমন যেন এক অস্বাভাবিক অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে।

তথাপি পরিহাসের স্বরেই আমি বললাম, এত তাড়া কেন জিতেন? কেদারনাথ তো উড়ে যাচ্ছেন না। একদিন পরে গেলেও ঠিকই তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে।

কিন্তু ভঙ্গিতেও পরিহাসে যোগ দিল না জিতেন। বরং আগের চেয়েও গম্ভীর স্বরেই সে বললে, আমি এগিয়েই যেতে চাই, মণিদা। বেশ দম আছে আমার।

আমি তখন বিরক্ত হয়ে বললাম, কিন্তু আমার নেই। আজ আর এক পাও হাঁটতে পারব না আমি।

বৃদ্ধ চটিওয়ালাও আমাকেই সমর্থন করল। জিতেনকে উদ্দেশ করে সে বললে, সামনে আরও বিকট চড়াই আছে, বাবুজী। তা ছাড়া বিকেলের দিকে ঝড়বৃষ্টির ভয়ও খুব। ভাল হয় আজ এখানেই থেকে গেলে। কেদারনাথজীর চুড়ো তো এখান থেকেও দেখা যায়—ওই সামনে তাকালেই হল।

[illegible] বেরিয়েও [illegible]। সত্যিই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একাধিক বরফ-ঢাকা পর্বতশৃঙ্গ। রোদ নেই, তবু ঝলমল করছে নির্মল শুভ্রতা।

জিতেনও সেই দিকে তাকিয়েছে। দেখে অনুনয়ের কোমল স্বরেই আমি আবার তাকে বললাম, পাগলামি করো না জিতেন। আজ সন্ধ্যেবেলায় কেদারে গিয়ে পৌঁছনোর চেয়ে কাল সকালের দিকে সেখানে পৌঁছনো ঢের ভাল হবে। ভাল সাথীও পাব কাল সকালে। গঙ্গোত্রীরাও তো ভোরেই গৌরীকুণ্ড থেকে রওনা হয়ে আসবেন।

জিতেন কোন উত্তর দিল না দেখে ভাবলাম যে, একটু বুঝি নরম হয়েছে তার মন। সুতরাং অপেক্ষাকৃত আশ্বস্ত হয়ে মালপত্র নিয়ে আমি আর বাহাদুর উপরে গেলাম ভাল একখানি ঘর দখল করবার উদ্দেশ্যে।

আপাততঃ কোন প্রতিযোগিতা নেই। তবে এ সব চটিতে প্রতিযোগিতার সম্ভাবনাকে সর্বদাই মনে না রাখলে অনেক সময়েই অসতর্ক যাত্রীর দুর্ভোগের সীমা থাকে না। কেন না, যে কোন সময়েই যে কোন দিক থেকেই এক বা একাধিক ঝাঁক যাত্রী এসে অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে।

তবে নির্বাচনের ক্ষেত্র খুবই সঙ্কীর্ণ এই রামোয়াড়াতে। উপরে দুখানা মাত্র ঘর। সিঁড়ির কাছের ঘরখানাকে ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্য রেখে ভিতরের ঘরখানাই দখল করলাম আমরা।

বেশ বড় ঘর। রান্নার জন্য উত্তর দিকে সারি সারি উনান পাতা থাকলেও শোবার জন্য জায়গার অভাব মনে হয় না। কেবল তিনজনের জন্য জায়গা তো অঢেল। দক্ষিণ দিকে সরু হলেও ঢালা বারান্দাও আছে। সেখানে দাঁড়ালে নীচে মন্দাকিনীর ধারা একটু দূরে হলেও স্পষ্ট দেখা যায়। আর বেশ খানিকটা দূর পর্যন্তও। নীচে মন্দাকিনী রয়েছেন বলেই দু পারে দু সারি পাহাড়ের মাঝখানটা স্বভাবতঃই ফাঁকা। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ক্রমাগত পাহাড়ের প্রাকার দেখবার পর এখন খানিকটা ফাঁকা জায়গা চোখে পড়তেই মনের সেই হাঁফ-ধরা ভাবটা অনেক কমে গেল।

কিন্তু ঘরের মধ্যে অন্য রকম। বারান্দায় যাবার দরজা মাত্র ওই একটি। উত্তর দিকের দেয়ালে গবাক্ষের মত যে দু-একটি জানলা আছে তা দেখলাম বন্ধ রয়েছে। বন্ধ ঘরের পাতলা অন্ধকারে পরস্পরের মুখও ভাল দেখা যায় না।

তবু বাহাদুর তার অভ্যস্ত হাতে ঝোলা থেকে দরকারী জিনিসগুলি বের

করে ফেলল। নীচের দোকান থেকে সওদা করবার পর [illegible] সেরে আসতে পারি তার জন্য প্রয়োজনীয় সব জিনিসই একসঙ্গে [illegible] সে।

কিন্তু জিতেন তো জিনিস নয়। দূর থেকেই দেখি যে সে ওই চায়ের দোকানের সামনে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। আমি কাছে আসতেই সে বললে, আমি চলি মণিদা।

শুনে স্তম্ভিত আমি—মুখে কথাই ফুটল না আমার।

জিতেনই আবার বললে, এত কাছে এসেও পথে আটক থাকতে মন চায় না আমার।

দৃঢ় সঙ্কল্পের স্পষ্ট ছাপ তার মুখের উপর। অনুনয়ে কোন ফল হবে না বুঝে আমিও দৃঢ়স্বরে বললাম, আমি আজ যেতে পারব না—যাব না।

ব্রহ্মাস্ত্র মনে করেছিলাম আমি আমার ওই ঘোষণাকে। কিন্তু ব্যর্থ হল তা। উত্তরে জিতেন বললে, আপনারা এখানেই থাকুন, আমি একাই যাব।

পাশের পাহাড়টার মতই যেন সুদৃঢ়, অনড় সঙ্কল্প তার। আমার প্রতিটি যুক্তিই তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিল সে।

বাহাদুরকে ছেড়ে দেব না আমি। এখানে তুমি দ্বিতীয় কুলি কোথায় পাবে?

আমার কুলির দরকার নেই।

তোমার জিনিসপত্র তুমি নিজে বয়ে নিতে পারবে?

বয়ে কেন নেব? সব আপনাদের কাছেই থাকবে।

কিন্তু কেদারে যে দারুণ শীত। রাত্রে সেখানে লেপ-তোষক কোথায় পাবে তুমি?

পাণ্ডার চটিতে কিছু পাওয়া যাবে আশা করি। তাতেই আমার চলবে।

স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম জিতেনের মুখের দিকে। তারপর অপেক্ষাকৃত নরম সুরে বললাম, তোমার সব কথাই না হয় বুঝলাম এবং মানলাম। কিন্তু এই দুস্তর পথে তোমাকে আমি একা একা ছেড়ে দিই কেমন করে? পথে তোমার কোন বিপদ যদি হয়!

শুনে অদ্ভুত এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল জিতেনের ওষ্ঠপ্রান্তে; আমার মুখের দিকে চেয়েই সে বললে, বিপদ যদি হয়ই তা হলে, মণিদা, কাছে থাকলেই আপনি কি তা ঠেকাতে পারবেন?

[illegible] কথা হাসি আচার [illegible] আচরণে জিতেনকে জিতেন বলে আমি যেন [illegible] নে। আমার নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বা নিরাপত্তার অজুহাত তুলে তাকে আর একবার অনুরোধ করতে প্রবৃত্তিই হল না আমার।

আর সত্যই চলে গেল জিতেন। ওই সিঁড়ির মত খাড়া চড়াই পথেও লম্বা লম্বা পা ফেলে একটি বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

অভাবনীয় এই ঘটনায় একেবারে দমে গিয়েছে আমার মন। হঠাৎ কানে এল বৃদ্ধ চটিওয়ালার শান্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর: ফিকর মত্ করো বাবুজী। উনহোনে কেদারনাথজীকা পুকার শুনা হোগা।

•

হতেও পারে। কিন্তু আমার যে মানুষের মন। এখন বিরক্তির চেয়ে জিতেনের জন্য উদ্বেগই তার বেশী। সত্যিই তেমন কোন অঘটন যদি ঘটে! কলকাতায় ফিরে গিয়ে সুরমার কাছে কি কৈফিয়ত দেব!

অবস্থা সবই আজ প্রতিকূল। পথ চলতে চলতে অত ঘাম হচ্ছিল। কিন্তু এখানে দারুণ শীত। ঠিক রোদ না হলেও রোদ-রোদ ভাব ছিল এতক্ষণ, কিন্তু জিতেন চলে যাবার পরেই আকাশ মেঘে ঢেকে গেল। এ যাত্রায় এই প্রথমবার বাহাদুরকে বললাম আমার গায়ে তেল মাখিয়ে দিতে—আশা যে ডলাই-মলাইতে শীত ভাবটা কেটে যাবে। কিন্তু লাভ কিছুই হল না। তেল মাখা শেষ হতেই মনে হল যে আমার খালি গায়ে কারা যেন অনবরত বরফের ছুঁচ ফোটাচ্ছে। স্নান করবার জন্য নীচে মন্দাকিনী পর্যন্ত যেতে সাহসই হল না। চটির প্রাঙ্গণেই একটি জলের কল ছিল। তাই থেকেই এক বালতি জল নিয়ে কাকস্নান করলাম। আর আমি ওই কলতলায় থাকতেই বৃষ্টি নামল।

বড় বড় ফোঁটা গায়ে মুখে এসে পড়ছে আমার। তা তরল জল, না কঠিন শিলা, চোখ বুজে সঠিক বোঝা যায় না।

উপরে গিয়ে গরম জামা ও পায়জামা পরেও কোন আরামই পাই নে। পুরু কম্বলের আসনে বসে অশীতিপর বৃদ্ধের মতই মাথাটা দুই হাঁটুর কাছাকাছি এনেও ঠক ঠক করে কাঁপছি। হাতের আঙুলগুলি অবশ। একটু স্বস্তি অনুভব করলাম দাউ দাউ করে উনান জ্বলে উঠবার পর।

রান্নার জন্য আজ আর একটুও উৎসাহ নেই আমার। বাহাদুরের হাতে

সব ছেড়ে দিয়ে জিতেনের কথাই [illegible] ভাবছি। [illegible] রক্ষার জন্য কি করছে সে। মাথা গোঁজবার জন্য একটু [illegible] পায়ও তবু সঙ্গে সঙ্গেই আগুন না পেলে নিজেই যে সে বরফ হয়ে যাবে।

ঘণ্টা দুয়েক একটানা বৃষ্টি চলল। এর মধ্যে খাওয়াও হয়ে গেল আমার। খাদ্য আজ বিস্বাদ খিচুড়ি।

খাওয়ার পর দক্ষিণের বারান্দায় গিয়েছিলাম হাতমুখ ধোওয়ার জন্য তখনই দেখলাম সেই দৃশ্য—তছনছ কাণ্ড আর একটি।

আগের বার বারান্দায় এসে মন্দাকিনীকে দেখেছিলাম যেন শ্যামল পাহাড়ের কোলে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। এখন সেই শ্যাম মনে হল যেন শুভ্র—নিথর নয়, হেলেদুলে নাচছে। নীচের আকাশে হালকা মেঘ দেখা যায় না বলে সেদিন বরাস্থগ্রামের চটির বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনে মনে দুঃখ করেছিলাম। আজ সেই ক্ষোভ মিটবে নাকি! কিন্তু চোখের দৃষ্টি যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করে সেই দিকে তাকিয়ে ওই সঞ্চরণশীল শুভ্রতাকে মেঘ আর মনে হয় না। মনে হল যে ক্রমেই যেন বড় হচ্ছে তা, আর এগিয়ে আসছে আমাদেরই এই ঘরখানার দিকে। দেখতে দেখতে মন্দাকিনীর ধারাই কেবল নয়, অমন গভীর খদের সবটাই সেই শুভ্রতার আবরণে ঢাকা পড়ে গেল—ঢাকা পড়ল দু পারের পাহাড়ও। তার পরেই দেখি যে ঠিক আমার সামনেই ওই পুঞ্জীভূত শুভ্রতা।

বিস্মিত হয়ে দেখছিলাম। কিন্তু তখনই ঘরের ভিতর থেকে বাহাদুরের উদ্বিগ্নকণ্ঠের সতর্কবাণী কানে এল আমার : হুঁশিয়ার হো জাইয়ে, বাবুজী।

খাওয়া ছেড়ে পরমুহূর্তেই ছুটে বারান্দায় চলে এল বাহাদুর। থামের সঙ্গে দড়ি বেঁধে যে সব কাপড়-চোপড় শুকোতে দিয়েছিল সে তা ক্ষিপ্রহস্তে সংগ্রহ করে ভিতরে নিয়ে গেল। তারপর আমাকেও সে হাত ধরে টেনে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

ওই উদ্ধত শুভ্রতা মুক্ত দ্বারপথে ঘরের মধ্যে যদি ঢুকে যায় তা হলে আমাদের বিছানাপত্র একেবারে ভিজে না গেলেও অন্ততঃ সে রাত্রে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যাবে।

কুয়াশার রাজ-সংস্করণ! আর দু-চার ধাপ এগোলেই ওই জিনিসই তুষার-ঝড় হতে পারে। ওর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যই এমন দুর্গের মত গঠন এদিকের ঘরবাড়ির—অত ছোট আর অত কমসংখ্যক দরজা-জানলা তাতে।

একক আক্রমণ নয়। বন্ধ ঘরের মধ্যে বসেও বেশ বুঝতে পারলাম যে আবার বৃষ্টি নেমেছে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে আবার উনানের ধারে গিয়ে বসলাম।

তবে বিকেল পাঁচটা নাগাদ সব পরিষ্কার হয়ে গেল। নীচে গিয়ে দেখি যে কাছাকাছি পাহাড়গুলির চূড়ায় ঝিকিমিকি রোদ। বৃদ্ধ চটিওয়ালা পরম সমাদরে এক গ্লাস গরম চা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে উত্তর দিকের একটি পাহাড়ের চূড়া নির্দেশ করে বললে, দেখিয়ে বাবু, অভী বর্ফ গিরা। ঔর দো-চার রোজমে য়হ্ পরভী গিরনে লগে গা।

বরফ আমিও দেখলাম। কিন্তু আমার মানসনেত্রে ভেসে উঠল জিতেনের মুখখানি। ভয়ে বুক কাঁপছে আমার। সে তো আরও হাজার দুই ফুট উপরে উঠেছে। আজ সেখানেও বরফ পড়ে নি তো—জিতেনের গায়ে মাথায়!

খুব ভোরে কোন দিনই ঘুম ভাঙে না আমার। কিন্তু সেদিন ব্যতিক্রম। জিতেনের জন্য দুশ্চিন্তা তো ছিলই, তার উপর আবার দারুণ শীত। রাত্রে লেপ গায়ে দিয়েও সুনিদ্রা হয় নি। সুতরাং উঠলাম সকালেই। উঠেই বাহাদুরকে বললাম, সব বেঁধেছেঁদে যাত্রার জন্য তৈরি হতে।

গঙ্গোত্রীদের জন্য অপেক্ষা করবার ধৈর্য আর আমার নেই। গতকাল জিতেন যদি কেদারনাথের 'পুকার' শুনে থাকে তবে আমি আজ যেন জিতেনের 'পুকার' শুনছি—সামনের পথে কোথায় বুঝি বরফ চাপা পড়ে কাতরকণ্ঠে সে আমায় ডাকছে।

তথাপি প্রাতঃকৃত্য সেরে তৈরি হতে বেলা সাতটা বেজে গেল। ইতিমধ্যে চক্রধর ওখানে এসে উপস্থিত। তার মুখে সংবাদ পেলাম যে সেদিনও গঙ্গোত্রীদের আসা হচ্ছে না।

বাঁচা গেল তা হলে। তাঁদের জন্য অপেক্ষা করি নি বলে কৈফিয়ত আর দিতে হবে না। একদিকে নিশ্চিন্ত হয়েই যাত্রা করলাম।

রামোয়াড়াতে পৌছবার আগেই স্বর্গারোহণ নামের একটি ছোট চটি দেখেছিলাম। কিন্তু এ আমি স্বর্গে যাচ্ছি, না, যমালয়ে!

হামাগুড়ি দেওয়া আর নয়, এবার যেন গাছে চড়ছি। প্রতিবারেই সামনের পা পড়ছে প্রায় ফুটখানেক উচুতে। তবে পাথরের মহীরুহ এটি—

পাথরের ডালপালা ছড়িয়ে যেন আকাশে উঠে গিয়েছে। উদ্ভিদ জাতের তৃণগুল্মও আর বড় চোখে পড়ে না।

দু মিনিট চলবার পরেই পাথরের ফলকে ৮,০০০ ফুট লেখা দেখেছিলাম। ৯,০০০ ফুট চোখে যখন পড়ল তখন ঘড়ির কাঁটা দেখি দেড় ঘণ্টা এগিয়ে গিয়েছে।

আর ওখানেই বৃষ্টি নামল—মুষলধারায়।

সেই বৃষ্টি মাথায় করে পাহাড়ে চড়ছি। চক্রধর ক্রমাগত আশ্বাস ও উৎসাহ দিচ্ছে। শুনে মনে জোর পাই বইকি! কিন্তু পা দুটি তো আমার রক্ত-মাংসের—তা আর চলতে চায় না। পাঁচ-দশ পা গিয়েই থমকে দাঁড়াই, লাঠিতে ভর দিয়ে দম নিই, তারপর আবার চলতে থাকি।

রূপক নয়, এখন আক্ষরিক অর্থেই প্রায় শম্বুকগতি আমার।

তবু ১০,০০০ ফুট পর্যন্ত উঠলাম। আরও ঘণ্টাখানেক পর ১১,০০০ ফুট।

ততক্ষণে বৃষ্টির বেগ অনেক বেড়েছে। তবে চক্রধর আশ্বাস দিয়ে বললে যে, চড়াই ওখানেই শেষ—মালভূমিতে পৌঁছে গিয়েছি আমরা।

চমকে উঠলাম। পায়ের কাছাকাছি সত্যিই সমতল। তবু বিশ্বাস হয় না। ঘন কুয়াশা ভেদ করে সামনে দৃষ্টি খুব বেশী দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয় না। কিন্তু আমার কাছাকাছি ডাইনে-বাঁয়ে তো দেখছি সত্যিই ফাঁকা। কোথায় গেল পাষাণকারার সেই নিরবচ্ছিন্ন দেয়াল? তবে কি সত্যিই সশরীরে স্বর্গে উঠে এসেছি!

॥ ১৪ ॥

কেদারক্ষেত্র।

এ জগতের কোন স্থান যেন নয়। অথবা গতিশীল জগতের পরিণত রূপ। গতির সমাধি অবস্থা। জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা যে মরণ, তারই অপরূপ রূপ যেন প্রত্যক্ষ করছি। শিবশঙ্করের শ্মশানচারী অভিধার তাৎপর্য এই প্রথম হৃদয়ঙ্গম হল।

পরম পবিত্র চরম যোগের স্থান বলে যে শ্মশানের বন্দনাগান রচিত হয়েছে, এই বুঝি সেই শ্মশান। খানকয়েক ঘরবাড়ি পিছনে ফেলে মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই উদার উন্মুক্ত কেদারক্ষেত্রের রিক্ত রূপহীনতার উদাস গাম্ভীর্য মুহূর্তে মনকে অভিভূত করে। অত যে কঠিন পথের অত যে কঠোর পরিশ্রম, এক নিমেষেই কোথায় গেল তা? বিস্মৃতি নয়, মহামূল্য এক প্রাপ্তির উপলব্ধি। 'শ্রান্তপদে রক্তসিক্ত বেশে' অবশেষে সত্যসত্যই শ্রান্তিহরা শান্তিলাভ করলাম।

শীতকালের তো কথাই নেই। একাদিক্রমে ছ মাস বন্ধ থাকবার পর বৈশাখ মাসে কেদারনাথের মন্দিরদ্বার প্রথম যখন উন্মুক্ত করা হয় তখনও সর্বত্রই বরফ আর বরফ। কেদারক্ষেত্রে তখন থাকে এক সর্বব্যাপী তীক্ষ্ণ শুভ্রতা—রজতগিরি কেদারনাথের তখন যেন সমাধির অবস্থা। সে অপরূপের দেখা পেলাম না শরৎকালে। কাছাকাছি কোথাও এখন বরফের লেশমাত্রও নেই। তথাপি, অথবা বোধ করি সেই জন্যই কেদারক্ষেত্রের রিক্ত গাম্ভীর্য অত প্রশান্তি অত চরিতার্থতার উপলব্ধি এনে দিল আমার মনে।

কাশী নাকি জগতের বাইরে। এ কালে কে মানবে সে কথা! অথচ কেদারের স্বল্পায়তন এই মালভূমিটুকুকে আমাদের চেনা জগতেরই একটি অংশ বলে মানতেই চায় না মন। স্বর্গের মন্দাকিনী এই ভূমিটুকুকে চতুর্দিকেই হিমালয় পর্বতশ্রেণী থেকে যেন বিচ্ছিন্ন করে একে স্বতন্ত্র এক সত্তা ও বিপুল গৌরব দিয়েছে।

মন্দাকিনীর স্ফটিকশুভ্র জলধারা চরণের নূপুরের মতই কেদারক্ষেত্রকে বেষ্টন করে রয়েছে। গর্জন আর নয়, নূপুরেরই শিঞ্জন শুনি এখানে কেদারনাথের চরণাশ্রিতা মন্দাকিনীর গতিছন্দে।

সেই তো পাহাড়ই রয়েছে এই কেদারক্ষেত্রেরও চারদিকেই। উত্তরে

বরফঢাকা ওই চূড়াগুলির কোন কোনটির [illegible] নাকি [illegible]। তবু বদ্ধকারার অনুভূতি এখানে একবারও মনে আসে না। এখান থেকে পাহাড়গুলি মনে হয় যেন অনেক দূরে। কেদারক্ষেত্র মনে হয় যেন মুক্তভূমি। মুক্তির সৌরভ এখানকার নির্মল বাতাসে। লঘু সেই বায়ু, লঘু হয়ে গিয়েছে যেন আমার নিজের দেহও।

ধরণী থেকে বিচ্ছিন্ন এই কেদারক্ষেত্রই তা হলে স্বর্গ!

তবে নন্দনকানন নয়, মহাতাপসের তপোভূমি। খাঁ খাঁ করছে মন্দিরের পিছন দিকটা। সেদিকে তাকালেই চোখের দৃষ্টি স্বতঃই স্তিমিত হয়ে আসে। বৈরাগ্যের উদাস সুর বেজে ওঠে মনের বীণায়। আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি নয়, নিবৃত্তি হয় এই বৈরাগীর স্বর্গে।

আশ্চর্য প্রতিসাম্য এই কেদারক্ষেত্রের গঠন ও অবস্থিতির—উত্তরে পর্বতমালার বিরাট চালচিত্র ও দক্ষিণে প্রবেশপথের সঙ্গে কি বিস্ময়কর সঙ্গতি মুক্তদ্বার মন্দিরের মৌন নিমন্ত্রণের। বিশাল ভারতের কোণ কোণ থেকে অগণিত নরনারী শত-সহস্র বিভিন্ন পথ বেয়ে আসেন শ্রীকেদারনাথকে দর্শন করতে। হিমালয়ে মন্দাকিনীর উপত্যকায় প্রবেশ করবার পর কিন্তু একটিই মাত্র পথ তাঁদের সকলের জন্যই। আর কেদারের সেই "বিকট" পন্থের সমাপ্তি ঠিক কেদারনাথের এই মন্দিরের নিম্নতম সোপানে।

আশ্চর্য কল্পনার ততোধিক আশ্চর্য রূপায়ণ—সুদীর্ঘ ও সুকঠিন জীবনযাত্রার যেন সার্থক সমাপ্তি মহামরণের বিগ্রহ শ্রীকেদারেশ্বরকে আলিঙ্গনের তুহিন-শীতল পরিতৃপ্তিতে।

কোন্ মহাপুরুষের ধ্যাননেত্রে কেদারনাথের তীর্থস্বরূপ প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল, ইতিহাসের পাতায় তার অবিসম্বাদিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। পাণ্ডারা কেদারনাথকে বলেন স্বয়ম্ভূ শিব। সে সম্বন্ধে অবশ্য সন্দেহের অবকাশ নেই। বিগ্রহ বলে যাকে এখানে পূজা করা হয় তা কোন গঠিত মূর্তি নয়, আহৃত বিপুলায়তন শিলাও নয় একখানা। কেদারনাথ ছোট একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ শিলাময় পাহাড়—গঠন ও বিন্যাসের বিস্ময়কর অসাধারণত্ব সত্ত্বেও খামখেয়ালী প্রকৃতির অন্যতম একটি সাধারণ সৃষ্টি। তবে মানুষের চোখে চমক লাগাবার মত, মানুষের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করবার মতই বিচিত্র ওই গঠন ও বিন্যাস। হয়তো সেইজন্যই প্রাগৈতিহাসিক যুগের ওই বিস্ময়কর আকস্মিক

সৃষ্টি [illegible] আদিম মানবের চোখে অলৌকিক বলে প্রতিভাত হয়েছিল। তার অন্তরে স্বীকৃত হয়েছিল ঈশ্বরের অভিব্যক্তি বলে।

অনুমান করি যে ইতিহাসপূর্ব যুগ থেকেই তুষারক্ষেত্রের অধিষ্ঠাতৃ এই প্রস্তর-দেবতা হিমালয়বাসী ও হিমালয়প্রবাসী নরনারীর কাছে পূজা পেয়ে আসছেন। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক যুগে সেই খ্যাতি আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল বলেই পুরাণে কেদারনাথের অত প্রশস্তি কীর্তিত হয়েছে। বৌদ্ধযুগেও ম্লান হয় নি কেদারনাথের মহিমা। হিন্দুর দেবতা তাঁর বিশিষ্ট অবস্থিতির জন্য ধার্মিক বৌদ্ধের চোখে ধ্যানী বুদ্ধ বলে প্রতিভাত হয়েছিলেন কিনা কে জানে! বুদ্ধের মূর্তির সঙ্গে না হোক, বৌদ্ধের কাছে অত মাহাত্ম্য যে স্তূপের, তার সঙ্গে বিচিত্রগঠন কেদারেশ্বরের সাদৃশ্য তো আরও প্রকট। বুদ্ধদেবের সমাধি বলেও ওই স্তূপাকৃতি শিলার পূজা হয়ে থাকতে পারে বৌদ্ধ যুগে।

নিশ্চয়ই বিতর্কের অবকাশ আছে এ রকম ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে। তবে কেউ প্রতিবাদ করবেন না যদি বলা হয় যে, শঙ্করাচার্যের জীবদ্দশায় (৭৮৮-৮২০ খ্রীঃ ?) বিপুল গৌরব ছিল এই দুর্গম কেদারতীর্থের। হয়তো সেই সঙ্গে কিছু অখ্যাতিও তার ছিল অন্যতম বৌদ্ধতীর্থ অথবা বৌদ্ধসংস্পর্শে ভ্রষ্ট হিন্দুতীর্থ হিসাবে। সন্দেহ নেই যে ওই রকম খ্যাতি বা অখ্যাতির টানে সশিষ্য শঙ্করাচার্য স্বয়ং অন্ততঃ একবার কেদারক্ষেত্রে গমন করেছিলেন। সেই পদার্পণের শুভ মুহূর্তেই বর্তমান কেদারতীর্থের জন্ম।

ইংরেজীতে বলা হয় যে, মানুষের কল্পনায় আগুন লাগে। ওই রূপকের সার্থক প্রয়োগ হবে শঙ্করাচার্য ও কেদারনাথের মিলন সম্পর্কে। কল্পনা ছিল শঙ্করাচার্যের—অত বড় কবি কজন জন্মেছেন এ জগতে? আর এই কেদারনাথ নিঃসংশয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। উভয়ের সংস্পর্শে সৃষ্টি হয়েছে কেদারতীর্থ নামক কঠিন প্রস্তরভূমিতে বরফের অক্ষরে লেখা বর্তমান যুগের অতুলনীয় মহাকাব্য।

বলা হয় 'শঙ্করো শঙ্করঃ সাক্ষাৎ'—শঙ্করাচার্যই সাক্ষাৎ শিব। সেই জ্ঞানযোগীর নিবিড়তম উপলব্ধি—চিদানন্দরূপং শিবোঽহং। তাঁর শিব সচ্চিদেকং ব্রহ্ম—মহাযোগী, নির্বিকার পুরুষ। প্রচলিত হিন্দুধর্মের উমা-মহেশ্বরকে অনুষ্ঠানহিসাবে বন্দনা করেছেন তিনি। কিন্তু তাঁর ধ্যানের দেবতাকে খুঁজে পান নি তিনি কোন যুগলমূর্তি, অর্ধনারীশ্বর বা লিঙ্গ-বিগ্রহের মধ্যে। অনুমান করি যে প্রকৃতিবিজয়ী অদ্বৈতবাদী সিদ্ধপুরুষ সেই শঙ্করাচার্য ক্ষুব্ধচিত্তে সারা ভারত ভ্রমণ করবার পর এই কেদারক্ষেত্রে এসেই

প্রথমে স্তম্ভিত ও পরক্ষণেই [illegible] হয়ে উঠেছিলেন; [illegible] পাহাড়ের এই শিলাময় একক কেদারেশ্বরের মধ্যেই [illegible] দেবতার সার্থক প্রতীক প্রত্যক্ষ করে কেদারক্ষেত্রকে তৎক্ষণাৎ হিন্দুর শ্রেষ্ঠতম তীর্থের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

শঙ্করাচার্যের সব চাওয়া ও সব পাওয়ার শেষ হয় এই কেদারক্ষেত্রে। এখানেই দেহত্যাগ করেছিলেন তিনি। তাঁর সমাধিও রয়েছে এখানে—দেহজ্ঞানমুক্ত যোগীর উপযুক্ত অনাড়ম্বর, নিরলঙ্কার সমাধি।

মহাজ্ঞানী মহাযোগী শঙ্করাচার্যের সমস্ত জ্ঞান ও সকল স্বপ্ন যেন রূপায়িত হয়ে আছে এই কেদারক্ষেত্রে—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।

অরূপের রূপ! দেখে আর তৃপ্তি হয় না চোখের।

জিতেনকে মোটেই খুঁজতে হয় নি। সে যে স্থানীয় থানার জমাদারের সঙ্গে গল্প করছিল তা হয়তো নিছক সময় কাটাবার জন্যই, আসলে আমারই পথ চেয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল সে। আমি পুল পার হয়ে উপরে এসে উঠতেই তার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। রূপ যা হয়েছে তার তা কি আর বলব! তবু তাকে দেখেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আমি—যাক্, তেমন কোন বিপদ ঘটে নি তা হলে।

তারই মুখে শুনলাম যে, কষ্ট যা তার হয়েছিল তা ওই পথেই। এখানে আসবার পর থেকে একরকম জামাই-আদরেই আছে সে। জিতেনের পূর্বেই পাণ্ডা মহাদেবপ্রসাদের চিঠি এসে পৌঁছেছিল তার স্থানীয় গোমস্তা সত্যনারায়ণের হাতে। সুতরাং নিজের নাম প্রকাশ করে বলতে না বলতেই প্রয়োজনীয় ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক কিছুই পেয়েছে জিতেন—খাদ্য ও শয্যা তো বটেই, তার উপরে আবার গরম জল ও লোহার কড়াতে গনগনে আগুন।

অবিশ্বাস করতে পারি নে, কেন না আমার জন্যও ওই দিনের বেলাতেই দেখি লেপ-কম্বল এল, নীচের দোকান থেকে উপরে শোবার ঘরে এল গরম চা। খবর এল যে, নীচে আমার স্নানের জন্য গরম জলও প্রস্তুত হয়ে আছে।

আরও অপ্রত্যাশিত ও অসাধারণ আয়োজন—আমার দাঁত নেই জেনে একা আমারই জন্য খিচুড়ি রাঁধা হয়েছে।

ডাল-ভাত বা খিচুড়ি রাঁধবার প্রথা নেই এখানে, কারণ কাঠ এখানে

দু[illegible] জল বরফের মত ঠাণ্ডা। [illegible] ভাজতে কাঠ ও সময় কম লাগে [illegible] যাত্রীই [illegible] পুরি ও হালুয়া খায়। আমার জন্য দুছটাক সরু চাল ও দুছটাক কাঁচামুগ ডালের খিচুড়ি রাঁধতে হালুইকরের উনানের আগুনেও ঝাড়া দুঘণ্টা লেগে গেল। তবু খেতে বসে দেখি যে, চাল যেমন-তেমন, ডাল একটিও সেদ্ধ হয় নি। তবে কৃতজ্ঞ চিত্তে এবং বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই সেই খিচুড়ি আমি খেলাম সত্যনারায়ণের উনানের ধারে বসেই।

ইতিমধ্যে চক্রধর ওই দোকানে এসে আমারই মত উনানের ধারে জেঁকে বসেছিল। কি সে দেখল আমার মুখের ভাবে, তা সে-ই জানে, তবে আমার খাওয়া শেষ হবার পর সে মুচকি হেসে বললে, অব বোলিয়ে তো বাবুজী, হমলোগ ক্যা আপলোগোঁকে লিয়ে কুছ নহী করতে হ্যায়?

তার প্রশ্নের গূঢ় অর্থ তৎক্ষণাৎ বুঝতে না পেরে আমি বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে আছি দেখে সে তার বিশিষ্ট ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে আবার বললে, মনে করে দেখুন বাবুজী, আপনারাও বলেছেন। আমাকে দেখে কি বিরক্তই না হয়েছিলেন আপনিও? কুণ্ডচটিতে একবার আপনাদের ঘর থেকে আমাকে তো দূর দূর করে তাড়িয়েই দিয়েছিলেন আপনার ওই সাথী।

সহাস্য মুখ চক্রধরের, কণ্ঠস্বরে তিক্ততা একেবারেই নেই। সুর তার অভিযোগের বলেও মনে হয় না। কিন্তু কথাটা তো তার মিথ্যা নয়। সত্য বলেই ওটা খোঁচার মত গিয়ে বিঁধল আমার মনে। লজ্জিত হয়ে বললাম, না ঠাকুর, তাড়িয়ে কেন দেব? আমরা তো ক্রিয়াকর্ম তেমন করি নে—তাই বলেছিলাম তোমাকে।

ও একই হল।—বলতে বলতে হাসি যেন আরও ছড়িয়ে পড়ল চক্রধরের সারা মুখে: পাণ্ডাকে যাতে দক্ষিণা না দিতে হয় সেইজন্যই তো ক্রিয়াকর্ম এড়িয়ে চলা। তা কত নিই আমরা? আর নিলেও কিছু কিছু সেবাও তো আমরা করি। পথ দেখিয়ে আনাটা কি সোজা কাজ? তা ছাড়াও ভাবুন তো একবার—আমার কাকা এখানে এই যাত্রীনিবাস যদি তৈরি করে না রাখতেন তবে এই বরফের দেশে এসে থাকতেন কোথায় আপনারা?

অন্য আশ্রয়ও আছে। কিন্তু সে কথা আমার মুখে এল না। হোটেলের আরামে আছি মহাদেবপ্রসাদের যাত্রীনিবাসে যার জন্য একটি পয়সাও দিতে হয় না। ওই চক্রধরের কাছেও কম সাহায্য আমরা পাই নি পথে আসতে

আসতে। সত্যিই ঋণের [illegible] ভারী হয়ে [illegible] [illegible]।
সুতরাং খোঁচা খেয়েও কুন্ঠিতস্বরে বললাম, আমি [illegible] [illegible] ঠাকুর।
সত্যিই তোমরা আমাদের অনেক উপকার করেছ। এ সব কথা চিরদিন
আমার মনে থাকবে।

কিন্তু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম যে, আমার ও কথা শুনে উৎফুল্ল না হয়ে যেন বিমর্ষই হল চক্রধরের মুখ। সেই তার নিজস্ব ভঙ্গিতে মাথাটা দুলিয়ে দুলিয়ে সে বললে, কিন্তু আর চলবে না বাবুজী। যজমানেরা সেকালে মোটা মোটা দক্ষিণা কাকাকে দিত বলেই এমন সব আয়োজন করতে পেরেছিলেন তিনি। সে সবই তো একালে উঠে গেল। এখন সবাই পাণ্ডার পিছনে লেগেছে—যেমন যাত্রীরা, তেমনি গবর্ণমেণ্টও।

অনেক অভিমান ও অভিযোগ জমে আছে চক্রধরের মনে। কারণ আছে বইকি! একটু আগে নিজেই দেখে এসেছি আমি। কেদারনাথের মন্দিরে পাণ্ডা-পুরোহিতের প্রতাপ আর নেই—হাজার বিধি-নিষেধের বেড়া তুলে তাদের কর্তৃত্ব খর্ব করা হয়েছে। পূজার উপকরণের নিম্নতম মূল্য ও দক্ষিণার পরিমাণ আজকাল নির্দিষ্ট। কেদারনাথের উদ্দেশ্যে যাত্রী যা উৎসর্গ করবে তা টাকাপয়সাই হোক আর সোনাদানাই হোক, ফেলতে হবে সীলমোহরকরা বাক্সের মধ্যে। দাবিদাওয়া আজকাল একেবারেই নেই। নিজেরই অভিজ্ঞতা আমার। পুরী, গয়া বা মথুরা-বৃন্দাবনের তুলনায় কেদারনাথ মনে হয় যেন পাণ্ডাবর্জিত তীর্থ।

কেদার-বদরীনাথের মন্দিরে এ সব সংস্কার সাধিত হয়েছে অল্প কিছুদিন পূর্বে—পুনর্গঠিত মন্দির কমিটির চেষ্টায়। কমিটির কালোপযোগী পুনর্গঠন হয়েছে শিক্ষিত জনমতের চাপে। যাত্রীর উপর জোরজুলুম যাতে না হয়, দেবতার ভোগ বা দক্ষিণা যাতে তাঁর মনুষ্যপার্শ্বচরদের পেটে না যেতে পারে, ক্রমবর্ধমান দেবোত্তর সম্পত্তির উদ্বৃত্ত আয় যাতে যাত্রীর কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় হয়, তারই জন্য নানারকম নিয়মকানুন প্রবর্তিত হয়েছে।

কিন্তু কমিটি বোঝে না চক্রধর। সে চেনে কেবল গবর্ণমেণ্টকে। অন্যত্র যেমন, দেবমন্দির পরিচালনার ক্ষেত্রেও তেমনি তার কল্পিত ধর্মজ্ঞানহীন স্বেচ্ছাচারী ও মহাপরাক্রান্ত এক গবর্ণমেণ্টের স্থূল হস্তাবলেপন চোখে পড়ে তার। হাজার রকমের বিধি-নিষেধের বেড়া তুলে সরকার পাণ্ডার অধিকার খর্ব করেছে বলে তীব্র অভিযোগ তার সরকারের বিরুদ্ধে।

[illegible] লড়াই করছি আমরা—[illegible] গর্বের সুরেই আমাকে বললে চক্রধর। [illegible] লড়াই আমাদের। আমরা সরকারকে বললাম, হয় আমাদের সকলকে চাকরি দাও, নয় তো পূর্বপুরুষের বৃত্তি চালাতে দাও আমাদের। শেষে আধাআধি রফা। গবর্ণমেণ্ট মন্দিরের উপর দখল নিয়েছে, আমাদের হাতে রয়েছে 'সুফল' দেবার অধিকার।

পরে কেদার থেকে বিদায়ের প্রাক্কালে দেখেছিলাম সুফলদানের প্রক্রিয়া। তীর্থের ফল নাকি দেবতার ভাণ্ডারে নেই—তা থাকে তীর্থগুরু পাণ্ডার এক্তিয়ারে। পাণ্ডা স্বয়ং সন্তুষ্ট হয়ে মুখ ফুটে না বললে যাত্রী সে ফল পেতে পারে না।

অদ্ভুত সেই সুফলদানের প্রক্রিয়া। ফুল, চন্দন এবং আরও কি কি যেন থালায় সাজিয়ে নিয়ে এল চক্রধর। তার মধ্যে যা চোখে পড়বার মত তা বেশ মোটা রুদ্রাক্ষের মালা একগাছা। সেই মালা দিয়ে আমার দুহাত জড়িয়ে বেঁধে চিরাচরিত পদ্ধতিতেই পরিচিত ছন্দের মন্ত্র পড়াতে শুরু করেছিল সে—'উত্তরাখণ্ডে কেদারক্ষেত্রে…' ইত্যাদি। কিন্তু খানিকটা এগিয়েই একেবারে থেমে গেল চক্রধর। চলতি গাড়ি অকস্মাৎ ব্রেক কষে থামিয়ে দেওয়া আর কি। ফলে গাড়ির মধ্যে নিশ্চিন্ত আরোহীর যে অবস্থা হয়, আমারও তাই।

মন্ত্রের মোটা অর্থ হল তীর্থগুরু পাণ্ডার কাছে যাত্রীর একটি জিজ্ঞাসা— আমার ক্রিয়াকর্ম সব নির্দোষ হয়েছে তো? সেই সঙ্গে একটি প্রার্থনাও— হে তীর্থগুরু, আমায় তীর্থফল দাও। কিন্তু সেই ফলের জন্যই মূল্য দিতে হয় পাণ্ডাকে—তার দক্ষিণা। সেই দক্ষিণার পরিমাণ যাত্রীকে দিয়ে কবুল করিয়ে নেওয়াই হল ওই বিশিষ্ট প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য।

দুটি হাতই রুদ্রাক্ষের মালা দিয়ে বাঁধা। দক্ষিণার পরিমাণ শুনে সন্তুষ্ট না হলে পাণ্ডা সে বন্ধন খুলে দেবে না—'সুফল' দান তো দূরের কথা। জোর করলে ছিঁড়ে ফেলা যায় না তেমন শক্ত নিশ্চয়ই নয় সেই রুদ্রাক্ষের মালা। কিন্তু ওই বন্ধন পরবার জন্য পাণ্ডার দিকে নিজের হাত দুখানি এগিয়ে দেবার দুর্বলতা যার আছে সে জোর করে ওই মালার বন্ধন ছিন্ন করবার শক্তি কোথায় পাবে? হাত দুখানা বন্ধনমুক্ত হলেও পাণ্ডার কাছে ঋণমুক্তি হবে না অবাধ্য যাত্রীর। আর পাণ্ডা তার নিজমুখে 'সুফল' দান না করলে ব্যর্থ হল যাত্রীর তীর্থযাত্রা।

নিশ্চয়ই যাত্রীর উপর জুলুম হতে পারে ওই [illegible]। দর কষাকষি নিশ্চয়ই হয়। তবে আমাদের বেলায় কিছুই হল না।

হাতবাঁধা অবস্থায় মন্ত্রের গূঢ় অর্থ সম্বন্ধে অকস্মাৎ সচেতন হয়ে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি যে, চক্রধর আমার মুখের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে। ও হাসি বুঝি সংক্রামক। হেসে ফেললাম আমিও। বললাম, বুঝেসুঝে তুমিই বল ঠাকুর—কত দিতে হবে?

হাসি থামিয়ে কেমন যেন করুণকণ্ঠে বললে চক্রধর: বালবাচ্চা নিয়ে ঘর করি বাবুজী। আর কতদূর থেকে হেঁটে এসেছি তাও তো নিজের চোখেই দেখেছেন আপনারা। পাঁচ-পাঁচটি টাকা দিন।

এ হেন অনুনয়কে জুলুম দূরে থাক্, দাবিই বা বলব কোন্ হিসাবে? আমি তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলাম। 'সুফলও' পেলাম সঙ্গে সঙ্গেই। দুজনের কাছে মোট দশটি টাকা পেয়েই চক্রধরের মুখ দেখি খুশীতে ঝলমল করছে।

কিন্তু ওটা তৃতীয় দিনের ঘটনা। আমার কেদার-প্রবাসের প্রথম দিনে সত্যনারায়ণের দোকানে বসে চক্রধর গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে পাণ্ডাসমাজের লড়াই ও শেষ পর্যন্ত আপোস রফার কাহিনী আমাকে শুনিয়ে অবশেষে জিজ্ঞাসা করল, বলুন বাবুজী, আপনিই বলুন—কি দোষ হয়েছে আমাদের? সাত পুরুষের বৃত্তি গেলে কি করে চলবে আমাদের?

ইতিপূর্বে পাণ্ডা-পুরোহিতের পরগাছা প্রকৃতির বিরুদ্ধে আমি নিজেও ক্ষুরধার কত যুক্তিই না প্রয়োগ করেছি। কিন্তু সেদিন চক্রধরের মুখের দিকে তাকিয়ে তার একটিরও পুনরাবৃত্তি করতে পারলাম না আমি। বরং তখনই আমার মনে পড়ে গেল রুটির—মানে জীবিকার জন্য লড়াইয়ের আরও শত শত দৃষ্টান্ত। সে লড়াই তো সকলেই করে আজকাল—কুলি-মজুরের মত তাঁতী-কুমোর এবং কেরাণী-শিক্ষক-সাংবাদিকেরাও। আজকাল কেবল বেতন বৃদ্ধির জন্যই ধর্মঘট ইত্যাদি শাণিত অস্ত্রের প্রয়োগ হয় না, চাকরি বজায় রাখবার জন্যও সরকারী-বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠানেই কুরুক্ষেত্রের সংগ্রাম চলেছে। কাজ না থাকলেও আপিস বা কারখানা চালু রাখতে হবে—এই দাবি নিয়ে কত আন্দোলনকেই তো সার্থক হতে দেখেছি। ঠিক সেই দাবিই চক্রধর ও তার পাণ্ডাসমাজের। এরা পরশ্রমজীবী হলেও দাবি তাদের বেঁচে থাকবার দাবি। তাকে আমি অসঙ্গত বলব কোন্ হিসাবে?

চুপ করেই ছিলাম। তথাপি চক্রধরের উৎসাহে ভাটাই পড়ল দেখলাম।

গবর্ণমেন্টের [illegible] তে উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছিল তার মুখ। কিন্তু এখন দেখি সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তার চোখ দুটিতে—যেন আমাকেও সে তার প্রতিপক্ষ মনে করছে। কিন্তু একটু পরে সে ভাবটাও তার কেটে গেল, বিষণ্ণতার ম্লান ছায়া নেমে এল তার সন্দিগ্ধ চোখে। সে বললে, তবে বাবুজী, গবর্ণমেন্টকে কত আর দুষব। মাঝে মাঝে মনে হয়, বুঝি কেদারনাথজীই বিমুখ হয়েছেন আমাদের প্রতি। যাত্রীরাই ক্রিয়াকর্ম করতে চায় না এখন, 'সুফল' না পেলেও পরোয়া করে না। পথঘাট ভাল হবার পর যাত্রী তো কেদারে আসছে আগের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশী। কিন্তু তাদের অধিকাংশই পাণ্ডাকে কাছেও ঘেঁষতে দেয় না। বলে যে, কেবল দেখতেই এসেছে তারা, পূজা করতে নয়।

একটু থেমে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে সে আবার বললে, পনরো-বিশ বৎসর আগেও এমন ছিল না বাবুজী। তখন কেদারের পাণ্ডাকে কেদারনাথজীর মতই ভক্তি করত যাত্রীরা আর বাঙালীদের ভক্তি ছিল তখন সবচেয়ে বেশী।

উদাহরণ দিল চক্রধর তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে। তার বাল্যকালে সে তার বাবার সঙ্গে প্রায় প্রতি বৎসরই বাংলাদেশে গিয়েছে যাত্রী সংগ্রহ করতে। সেখানে যজমানের বাড়িতে কেবল আতিথ্য নয়, পূজাই পেয়েছেন তার বাবা। স্পষ্ট মনে আছে চক্রধরের যে, সেকালে ভক্তিমতী গৃহিণীরা নিজের হাতে পাণ্ডার চরণ প্রক্ষালন করে ভক্তিভরে পাদোদক পান করতেন।

মনে আছে আমারও। আমার বাল্যকালে আমিও দেখেছি দেবতাজ্ঞানে গুরু-পুরোহিতের পাদোদক পান করার দৃশ্য। সুতরাং চক্রধরের মনের বেদনা বেশ অনুমান করতে পারলাম আমি। পাণ্ডা-পুরোহিতের সম্মান ও সমৃদ্ধির স্বর্ণযুগ প্রত্যক্ষ করেছে সে। সুতরাং বর্তমান লৌহযুগে প্রাচীন পদ্ধতিতে জীবনসংগ্রাম চালাতে গিয়ে পদে পদে পরাজয়ের যে দুঃখ ও গ্লানি তাকে পরিপাক করতে হচ্ছে তাতে অতীতের সেই স্বর্ণযুগের জন্য মাঝে মাঝে সে কি দীর্ঘশ্বাস না ফেলে পারে!

·

মন্দাকিনী কি টানেই যে টেনেছেন আমাকে—কোন বাধাই বাধা মনে হয় না। ১১,৭৫০ ফুট উঁচু এই কেদারক্ষেত্র। যে রোদটুকু উঠেছিল তাও নিভে গেল। স্থানীয় প্রত্যেকটি লোককেই দেখেছি কান-মাথা ঢেকে উনানের

ধারে বসে আগুন পোয়াতে। তবু আমি স[illegible] হাতের কাছের গরম জল পায়ে ঠেলে শ খানেক ফুট নীচে মন্দাকিনীর জলেই স্নান করতে গেলাম।

এখানে মোটেই ভয়ঙ্করী নন মন্দাকিনী। স্রোত থাকলেও তরঙ্গ নেই, গভীরতা থাকলেও তেমন প্রস্থ নেই, গর্জন একটু থাকলেও কুটিল আবর্ত একেবারেই নেই। কিন্তু অত্যন্ত ঠাণ্ডা জল। বরফের মত জল নয়, এ যেন নির্জলা বরফ। কারণ সুস্পষ্ট। অত শীতেও যাত্রীর আশায় ঘাটে যে পুরোহিত বসে ছিল সে অঙ্গুলিসঙ্কেতে আমায় দেখিয়ে দিল যাকে সে বলে মন্দাকিনীর গঙ্গোত্রী—মানে উৎস। তা কেদারক্ষেত্রের উত্তর-পশ্চিম কোণে বরফ-ঢাকা একটি পর্বতশিখর। মনে হয় যে মিনিট পনরো লাগবে সেখানে হেঁটে যেতে। সেই বরফ গলেই ঘাটের এই জল হয়েছে। আঙুল সে জলে ডোবালেই যেন অসাড় হয়ে যায়।

তবু সেই জলেই আমি স্নান করলাম আমার বিশিষ্ট পদ্ধতিতে। অপরিমেয় পরিতৃপ্তি তাতে। সেই সঙ্গে গর্বও বোধ করছি—আর কিছু না হোক, শীতকে জয় করেছি আমি।

কিন্তু পরক্ষণেই দর্পচূর্ণ। স্নানের পর গরম জামাকাপড় যত সঙ্গে ছিল সব গায়ে চাপিয়েও নিস্তার নেই। শীত আর যায় না। ছুটে গিয়ে বসলাম সত্যনারায়ণের উনানের ধারে।

'একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর।' একে তো প্রায় বারো হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের স্বাভাবিক শীত। তার সঙ্গে আবার বৃষ্টি। হাঁটাচলার উপায়ই নেই। সারাটা দিন আমার কাটল সেই উনানের ধারে। রাত্রে দুখানা লেপ গায়ে দিয়েও ঘুমের জন্য সে কি সাধ্য-সাধনা আমাদের।

কিন্তু পরদিন অঢেল ক্ষতিপূরণ।

পুবমুখো ঘর, পুবদিকেই জানলা। ভোরবেলায় সেই জানলা খোলবার পর নিজের চোখ দুটিকেই যেন আর বিশ্বাস হয় না।

বরফ-ঢাকা পাহাড়ের সাদা চূড়াগুলি আজ দেখি লালে লাল। কে যেন রাশিরাশি আবীর মাখিয়ে দিয়েছে প্রত্যেকটি পাহাড়ের মাথায়। স্তূপীকৃত সেই আবীর পাহাড় ও আকাশের মাঝখানের সবটা ফাঁকই ভরে দিয়েছে।

ঘরে বসেই একটু পরে দেখলাম প্রকাণ্ড একখানি সোনার থালার মত সূর্য পাহাড় ডিঙিয়ে লাফিয়ে উঠে এল আমাদের দিকে।

তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এসে দেখি যে কালকের দেখা ভস্মভূষণ কেদারনাথ যেন এইমাত্র সোনার জলে স্নান করে উঠে এসেছেন। সোনালী জল ঝরে ঝরে পড়ছে তার অমলধবল সিক্ত দেহ থেকে।

সোনাঝলমল ঝরঝরে প্রভাত। বিশ্বাসই হয় না যে, কাল বৃষ্টি মাথায় করে এই জায়গাটাতেই এসে উঠেছিলাম অথবা কাল যে অত বৃষ্টি হয়েছিল এখানে। আজ বৃষ্টি তো নেই-ই, এক ফোঁটা মেঘও কোথাও নেই। নেই কুয়াশার সামান্য আভাসও। বারো হাজার ফুট উঁচুতে বায়ুমণ্ডলে ধুলো-বালি তো থাকতেই পারে না। যদিও বা কিছু ছিল তাও কালকের বৃষ্টিতে ধুয়ে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। সুতরাং শরতের সোনার রোদ আজ স্বরূপে ও সগৌরবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ তো বঙ্গদেশ নয়, শ্যামল অঙ্গও নয় কেদার পাহাড়ের। কিন্তু সেই পাহাড়ই নিঃসংশয়ে 'ঝলিছে অমল শোভাতে'। সেই সোনালী রোদে উদ্ভাসিত হয়ে নীল আকাশ হয়েছে আরও নীল, উত্তরে সেই নীলছোঁয়া পর্বতশ্রেণীর শিখরে শুভ্র বরফ যেন আরও বেশী শুভ্র। কেদার পাহাড়ের স্বাভাবিক পিঙ্গলবর্ণও তরুণ সূর্যের সুবর্ণ কিরণসম্পাতে উজ্জ্বলতর হয়েছে।

ঘরের মধ্যে কাঁপছিলাম, কিন্তু প্রাঙ্গণে নেমে আসবার পর তেমন শীত আর লাগে না।

এই লীলাই কেদারনাথজীর,—নিজে উঠে এসে চায়ের গ্লাসটি আমার হাতে দিয়ে বললে সত্যনারায়ণ: বৃষ্টি হল তো বৃষ্টিই, আবার রোদ হল তো বেশ রোদ। তবে আজকের মত এত উজ্জ্বল রোদ বড় একটা দেখা যায় না। আজ বুঝি বিশেষ করে আপনাকেই আশীর্বাদ করছেন কেদারনাথজী। বলতে বলতে আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসল সে।

কিন্তু জিতেন দেখি আজও গম্ভীর। উৎফুল্ল নয়, অস্থির সে। দেখে একটু বিরক্ত হয়েই আমি বললাম, ব্যাপার কি জিতেন? কেদারনাথজী অত টানছিলেন তোমাকে, তবে এখানে এসেও এমন গোমড়ামুখ কেন তোমার? এখন তো আমার মত বুড়োমানুষেরও নাচতে ইচ্ছে হচ্ছে।

শুনে কিন্তু শুকনো মতন একটু হেসে উত্তর দিল জিতেন, আমার মণিদা, আরও একটু বেশী। ওই বরফের চূড়োয় ওঠবার ইচ্ছে আমার।

ইচ্ছে যে আমারও হয় না তা নয়। কিন্তু আমি জানি যে তা অসাধ্য। সুতরাং মুচকি হেসে আমি বললাম, ও সাধটা আগামী জন্মের জন্য তোলা

থাক্। আপাতত: আর একটু বরং নীচেই যাওয়া যাক। [illegible] নীতে স্নান করে আসি।

কিন্তু তাতে রাজী নয় জিতেন। বরফ তাকে টানে, কিন্তু শীতকে তার ভয়। গায়ের জামা খুলতে হবে বলে গতকাল গরম জলেও স্নান করে নি সে। আজও আমার প্রস্তাব সে হেসে উড়িয়ে দিল।

॥ ১৫ ॥

প্রথমে চিনতেই পারি নি। যখন চিনতে পারলাম তখন মনে হয় বুঝি দৃষ্টিবিভ্রম আমার।

কি করে চিনব! কুলির পিঠে কাণ্ডিতে যিনি বসে আছেন তাঁর তো মুখই দেখা যায় না। আর সালোয়ার, কোট ও টুপীপরা বেঁটে মতন যে মানুষটি ঘোড়ার পিঠের উপর থেকে অবলীলাক্রমে অবতরণ করলেন, দূর থেকে কেমন করে আমি বুঝব যে তিনিই গঙ্গোত্রী!

কিন্তু গঙ্গোত্রী ঠিক চিনতে পেরেছেন আমাকে। পুল পার হয়ে আমার কাছে এসে সহাস্য মুখে সরব সম্ভাষণ তাঁর। তারপর উভয় পক্ষেরই সে কি আনন্দ!

সলজ্জ কৈফিয়তের সুর গঙ্গোত্রীর। সে কৈফিয়ত ঘোড়াটিকে জড়িয়ে। কেন না, গঙ্গোত্রীর যে রণসাজের উপর বারবার আমার চোখ গিয়ে পড়ছে, তার প্রয়োজন তো হয়েছে ওই ঘোড়ায় চড়বার জন্যই।

বৃদ্ধার স্বাস্থ্যের জন্যই এত দেরি হয়েছে তাঁদের। একটু তো জর উঠেছিল আমরা গৌরীকুণ্ডে উপস্থিত থাকতেই। এখন পর্যন্ত সে জ্বরের সম্পূর্ণ বিরাম হয় নি। হাঁটবার শক্তি নেই বৃদ্ধার। তাঁকে হাঁটতে দেবার ইচ্ছাও নেই গঙ্গোত্রীর। কিন্তু কেদারের অত কাছে আসবার পর দর্শন না করে ফিরে তো যেতে পারেন না তাঁরা। তাই বাহনের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। দ্রুতগতিতে এসে দ্রুতগতিতেই ফিরে যেতে হবে বলে দুজনেই তাঁরা বাহন নিয়েছেন।

কৈফিয়ত দিতে দিতেই বাহাদুরের সঙ্গে কয়েকবার সহাস্য চোখোচোখি হয়েছে গঙ্গোত্রীর। কৈফিয়ত শেষ করেই আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার হনুমানটি দেখছি আপনার সঙ্গেই রয়েছে। তবে লছমন ভাইয়াকে দেখতে পাচ্ছি নে কেন?

হেসে উত্তর দিলাম আমি, লক্ষ্মণের যেমন স্বভাব। জানকী আমার সঙ্গে নেই বলেই তা কি বদলাতে পারে? আমার লক্ষ্মণভাই কুটির পাহারা দিচ্ছে। সেখানে গেলেই তাকে দেখতে পাবে তুমি।

কিন্তু গঙ্গোত্রীরা আমার পাণ্ডার বাড়িতে বা ধর্মশালায় উঠবেন না। তাঁদের পরিচিত এক ভদ্রলোক আছেন এখানে—সরকারী পোস্ট-অপিসে বেতার-বার্তা বিভাগে কাজ করেন তিনি। তাঁর বাসাতেই গিয়ে উঠবেন তাঁরা।

আমি অগত্যা বাহাদুরকে ওঁদের সঙ্গে [illegible] চিনে আসতে। উদ্দেশ্য—আমি জিতেনকে সঙ্গে নিয়েই সেখানে যাব।

কিন্তু কোথায় জিতেন? সে প্রাঙ্গণে নেই, ঘরে নেই, এ তল্লাটে কোথাও তাকে দেখা গেল না। অগত্যা একাই আমি গেলাম যে বাড়িতে গঙ্গোত্রীরা গিয়ে উঠেছেন।

গঙ্গোত্রী তাঁর জননীকে নিয়ে তখন ঢুকেছেন গিয়ে স্নানের ঘরে। ওটি যাঁর বাসা তিনিই সমাদর করে বসালেন আমাকে। শিক্ষিত ভদ্রলোক তিনি। বয়স বেশী নয়। অমায়িক, মধুর ব্যবহার তাঁর। মাস পাঁচেক যাবৎ এখানে আছেন। অনেক খবর জানেন তিনি। তাঁরই মুখে কিছু কিছু শুনলাম এই কেদারক্ষেত্র ও তার পারিপার্শ্বিকের বিবরণ।

পূর্বদিকে অপেক্ষাকৃত নীচু যে পাহাড়টি তারই গায়ে পাকদণ্ডী পথের রেখা দেখা যায় কেদারক্ষেত্র থেকেও। সেই পথ বেয়ে অভিজ্ঞ লোকেরা অনেক উপরে উঠে যায় শিলাজতুর খোঁজে। পাণ্ডারাও যায় কোথায় নাকি ব্রহ্মকমল নামক এক রকমের যে ফুল ফোটে তাই কেদারেশ্বরের পূজার জন্য আহরণ করতে। ওই পাহাড়ের সঙ্গে সমান্তরালে পশ্চিম দিকে যে অনুরূপ পাহাড় দেখা যায় তাও সহজগম্য। আর উত্তরে ওই যে বরফ-ঢাকা আকাশ-ছোঁওয়া পাহাড়গুলি দেখা যাচ্ছে তাও নাকি অগম্য নয়।

উত্তরের ওই পাহাড়গুলির গায়ে গায়ে বরফের উপর দিয়েই নাকি আসল মহাপ্রস্থানের পথ—স্বর্গারোহিনী স্রোতস্বিনীর গতি-পথের ধারে ধারে তারই উৎসের দিকে। এ অঞ্চলের মানসসরোবর আছে ওই পর্বতশ্রেণীর পিছনে উত্তর-পশ্চিম কোণে বিরাট এলাকা জুড়ে। ফণা-তোলা সাপের মত তরঙ্গবিক্ষুব্ধ হ্রদ বলে 'বাসুকীতাল' তার নাম। উত্তর-পূর্ব কোণ দিয়ে স্বর্গারোহণের পথ। সেই পথেই গিয়েছিলেন পাণ্ডবেরা, গিয়েছিলেন তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরবর্তীকালে অগণিত মহাপ্রস্থানের যাত্রী। মরদেহটিকে জীর্ণবস্ত্রের মত বর্জন করবার উদ্দেশ্যে কেদারনাথের চরণতলে যাঁরা আসেন, বিষয়বিরাগী ব্রহ্মজ্ঞানী সেই সব যাত্রী মন্দিরে দর্শন আলিঙ্গনশেষে কেদারনাথের মন্দির পরিক্রমা সমাপ্ত করে দলে দলে এগিয়ে গিয়েছেন ওই চিরতুষারের দেশে স্বর্গারোহণের পথ ধরে। অত কঠিন পথে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর দেহের পতন তো অনিবার্য। কেউ পা পিছলে পড়ে মরেছেন, কেউ শীতে জমে গিয়ে, কেউ বা তুষার-ঝড়ের আক্রমণে বরফচাপা পড়ে। স্বেচ্ছামৃত্যু সবই, তবু স্তরভেদ আছে তার।

মৃত্যু নি[illegible] এগিয়ে এসে [illegible] করেন নি, তিনি নিজেই গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন মৃত্যুর

শুনলাম যে ওই পথেই আছে ভৈরবঝম্প—ওই সব পাহাড়েরই কোন একটি শিখর। তার পাদমূলে ব্রহ্মগুম্ফা না ভৃগুপাত নামক গভীর এক গুহা। স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে দেহত্যাগ করবার অদম্য বাসনায় এই সেদিন পর্যন্তও নাকি অনেক যাত্রী ওই ভৈরবঝম্প শিখরের উপর দাঁড়িয়ে 'শিবোঽহং' শিবোঽহং' বলতে বলতে ভৃগুপাত না ব্রহ্মগুম্ফার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

সরকারী আদেশে কিছুদিন পূর্বে পাথর দিয়ে বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে সাক্ষাৎ কৃতান্তের সেই করাল মুখগহ্বর।

তার মানে রূপকথা নয় এসব কাহিনী। সত্যিই এই সেদিন পর্যন্তও ওই বিশিষ্ট প্রক্রিয়ায় আত্মহত্যা করেছেন এই কেদারতীর্থের কোন কোন যাত্রী।

শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দিয়েছিল আমার। কিন্তু 'আত্মহত্যা' কথাটা মনে উঠতেই আমার চিন্তা ও কল্পনায় ছেদ পড়ল।

আত্মহত্যা, না, মৃত্যুবিজয়? গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়বার মত মোটা মোটা গাছের ডাল বাড়ির কাছেই অত থাকতেও বিশেষ একটি গুহার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য দুর্গম পথে হাজার হাজার মাইল যাঁরা হেঁটে আসতেন তাঁরা কি 'আত্মহত্যা' করতেন ওই মহাপ্রস্থানের পথে?

বেঁচে থাকবার জন্য এত আঁকুপাঁকু আমাদের। বৃদ্ধবয়সে আত্মীয়-পরিজনের চক্ষুশূল হয়েও সংসারকে আমরা আঁকড়ে থাকতে চাই। আর তাঁরা সংসার ছেড়ে এগিয়ে যেতেন সজ্ঞানে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে। সে পদ্ধতিতে জয় কার? মৃত্যুর? না যিনি মরতেন তাঁর?

ও কি উন্মত্ততা! মন তাও মানতে চায় না। মনে পড়ে ইতিহাসের সাক্ষ্য—আমার সংক্ষিপ্ত জীবনকালেই আমারই কত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। যুগে যুগে আমারই মত রক্তমাংসের কত নরনারীই তো সহাস্যমুখে আগুনে ঝাঁপ দিয়েছেন, ঘাতকের খড়্গের নীচে মাথা পেতে দিয়েছেন, ফাঁসির রজ্জুকে চুম্বন করেছেন, বুক পেতে দিয়েছেন গুলির মুখে, হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়েছেন কেউ ধর্মের জন্য, কেউ বা দেশের স্বাধীনতার জন্য। ওগুলিকে যদি আত্মহত্যা না বলি, উন্মত্ততা না বলি, তবে মহাপ্রস্থানের পথে কেদারযাত্রীর মৃত্যুবরণকে ওই ব্যাখ্যা দিয়ে ছোট করব কোন্ হিসাবে?

শাশ্বত ওই আবেগ। [illegible] জীবনেরই [illegible] ওই রোমাঞ্চকর মৃত্যুপ্রীতি। বারবার ভোল বদল [illegible]শে, যুগে যুগে ওই একই উন্মত্ততা জীবনের রঙ্গমঞ্চে অনুপ্রবেশ করে সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করেছে।

বৃথা চেষ্টা অতি-সতর্ক মানুষের। ভৃগুপাত বা ব্রহ্মগুম্ফাকে পাথর দিয়ে বুজিয়ে দিলে কোন লাভ হয় না। মরার আগেও দুবেলাই যারা মরে তেমন মানুষকে কোন দিনই টান দেয় নি ওই গুহা। আর বহু ভাগ্যবলে মহাসিন্ধুর ওপার থেকে ভেসে-আসা মহাজীবনের সঙ্গীত একবারও যার মনের কানে প্রবেশ করে তাঁর মহাপ্রস্থানের পথ পাথরের বেড়া তুলে বন্ধ করা যায় না।

থেকে থেকেই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই আমরা। কেদারের উত্তরে মহাভারতযুগের মহাপ্রস্থানের পথ আজ বন্ধ। কিন্তু বন্ধ হয় নি দেবতাত্মা হিমালয়ের উদাত্ত আহ্বান। আজও এই হিমালয়ের দুর্দম আকর্ষণে দেশ-বিদেশ থেকে ছুটে আসে দুর্ধর্ষ অভিযাত্রীদল। পাগল হয়ে ছুটে যায় তারা এক শিখর থেকে অন্য শিখরে। অনেকেই ফিরে আসে। কিন্তু কেউ কেউ ফিরতে পারে না। তুষারের নীচে বা কোন গভীর গুহার মধ্যে জীবনের অবসান হয় তাদের।

এরাও সেই পঞ্চপাণ্ডবেরই সগোত্র মহাপ্রস্থানের যাত্রী।

এ সব আমার মস্তিষ্কের চিন্তা। কিন্তু চিরন্তন দ্বন্দ্ব রয়েছে মস্তিষ্কের সঙ্গে হৃদয়ের। শুনতে শুনতে বুক কাঁপছিল আমার। একটা দুর্বোধ্য আশঙ্কা আমার মনে—কি প্রেরণা আছে কেদারনাথের ওই ছোট্ট মন্দিরটির মধ্যে যা লাভ করে রক্তমাংসের দুর্বল মানুষই মুহূর্তে মৃত্যুঞ্জয় হতে পারে!

সেইজন্যই গঙ্গোত্রীর শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধা জননীকে মন্দিরে প্রবেশ করতে দেখে ভয় পেয়েছিলাম আমি। কিন্তু তিনি পূজা শেষ করে বেরিয়ে আসবার পর বেশ উৎফুল্ল দেখলাম তাঁর রোগক্লিষ্ট জরালাঞ্ছিত বলিত মুখখানি।

উল্লসিত কণ্ঠেই আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন তিনি, পরম আনন্দ পেলাম ভাই—বড় শান্তি। অভাগিনীকে বুঝি দয়া করেছেন কেদারনাথজী।

গঙ্গোত্রীও দেখি উৎফুল্ল। আমাকে তিনি চুপিচুপি বললেন, আমি বাঁচলাম চাচা। গত পাঁচ বছরের মধ্যে মাকে আমি এত খুশী কোন দিনই দেখি নি।

[illegible] তারা। মন্দিরের কাছেই
পশ্চিম দিকে [illegible]

বোধ করি লছমনঝোলাতেই কার কাছে যেন শুনেছিলাম এই ফলাহারী বাবার কথা। সংসারীর তুলনায় সন্ন্যাসীমাত্রই অসাধারণ। সন্ন্যাসীর মধ্যেও আবার অসাধারণ ওই ফলাহারী বাবা। কিছু আভাস রয়েছে তাঁর নামেই। আগে নাকি ফলমূল ছাড়া আর কিছুই খেতেন না তিনি। তার চেয়েও কঠিন পরিচয় তাঁর বর্তমানের। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী কেদারক্ষেত্রে উপস্থিত হবার পর এ জায়গার স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন। শীতকালে প্রবল বরফপাত হয় এই কেদার পাহাড়ে—এত বেশী যে ঘরবাড়ি সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সেই বরফের নীচে। স্বয়ং কেদারনাথজীও মেনে নিয়েছেন যে, কোন মানুষের পক্ষেই তখন কেদারক্ষেত্রে বাস করা সম্ভব নয়। তাই তিনিও শীতকালে ছুটি দেন তাঁর পাণ্ডা-পুরোহিতকে। মন্দিরের দ্বার বন্ধ করে তাঁরাও তখন কয়েক হাজার ফুট নীচে নেমে যান আত্মরক্ষার জন্য।

যান না কেবল ওই ফলাহারী বাবা। শীতের ছ মাসও নিজের ওই ছোট্ট কুটিরখানিতে একেবারে একাকী বাস করেন তিনি।

গতকাল সকালেই জিতেন একবার দেখে গিয়েছে ফলাহারী বাবাকে। তাঁর নিজের মুখ থেকেই শুনে গিয়েছে তাঁর বিস্ময়কর জীবনযাত্রার কিছু কিছু কাহিনী। তার আবার কিছু কিছু জিতেন রাত্রে বলেছিল আমাকে। কিছু খাদ্য সঞ্চিত থাকে ফলাহারী বাবার কুটিরে—থাকে প্রচুর কাঠ। বরফ পড়া শুরু হলে কুটিরের দ্বার বন্ধ করে ধুনি জেলে তপস্যায় মগ্ন হয়ে যান ফলাহারী বাবা। বাইরে অবিরাম বরফ পড়তে থাকে। পুরু হয়ে জমে সেই বরফ তাঁর কুটিরের চালের উপর, নীচে দোরগোড়ায় তাঁর বহির্গমনের পথ বন্ধ করে হাঁটুসমান, কোমরসমান উঁচু হয়ে। মাঝে মাঝে ফলাহারী বাবা তাঁর ধুনির আগুন প্রয়োগ করে দোরগোড়ার সেই পুঞ্জীভূত বরফ গলিয়ে একটু পথ করে বাইরে বেরিয়ে আসেন, খন্তা-কোদালের সাহায্যে নিজের হাতেই বরফ সরিয়ে পরিষ্কার করে নেন তাঁর কুটিরের সামনে ছোট্ট অঙ্গনটুকু, সরিয়ে দেন চালের উপরকার জমা বরফস্তূপ যাতে বরফের ভারে চালখানি ভেঙে না পড়ে।

একেবারে একা কেন থাকেন বাবা?—জিতেন জিজ্ঞাসা করেছিল তাঁকে।

শুনে নাকি গম্ভীর হবে

দোসর থাকেন কেদারনাথজী

তাহলেও এ সব কাজে আপনাকে সাহায্য করবার জন্য দুএকটি চেলা রাখেন না কেন?

উস্‌সে সাধন-ভজনকা বিঘ্ন হোতা হ্যায়।

সেই ফলাহারী বাবা। আমি ভেবেছিলাম যে, অত্যন্ত কঠোর ও কঠিন হবেন তিনি।

কিন্তু আসলে তা নয়। এখন অবারিত দ্বার তাঁর কুটিরের। সকলের সঙ্গেই কথা বলেন তিনি, জিজ্ঞাসা করলেই প্রশ্নের উত্তর দেন। যা বলেন সবই তত্ত্বকথা। কিন্তু বলেন ঘরোয়া ভাষায়। সে ভাষা হিন্দী। কিন্তু শুনতে শুনতে আমার মনে হল যে, শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের প্রতিধ্বনি শুনছি।

আমরাই তাঁর কুটিরে গিয়ে ঢুকতেই কানে এল আমার যে, একজনকে তিনি বলছেন: বিবেক, বৈরাগ্য, ত্যাগ, ধ্যান, ধারণা—এ ছাড়া আর তো পথ নেই বাবা। আর ও পথে চলতেও হবে তোমার নিজেকেই। আমি কেবল তোমাকে আশীর্বাদ করতে পারি। আসল কাজটা বাপু তোমারই।

শান্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর ফলাহারী বাবার, আর তাঁর মুখখানাও গম্ভীর। যতক্ষণ ওখানে ছিলাম, হাসতে দেখলাম না তাঁকে। তবে ভ্রূকুটিও নেই সে মুখে—করুণাঘন মূর্তি।

অমলধবল বা গৌরকান্তি নয়, কালো রঙ। কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট দেহ। মাথায় জটা ও মুখমণ্ডলে পাতলা দাড়িগোঁফ আছে। অত যে শীত কেদারে তবু তাঁর দেহে ভস্ম ছাড়া অন্য কোন আবরণ নেই। কটিতে কিছু থাকলেও তা কৌপীন জাতের—আসন করে বসেছেন বলে তাও চোখে পড়ে না। তাঁর সামনের নাতিগভীর ধূনিতে কাঠের গুঁড়ি একটির এক মুখে শিখাহীন গনগনে আগুন। খুব ধীরে ধীরে পুড়ে ভস্ম হচ্ছে সেই কাঠ। কাঠের আগুন বলেই একটু ধোঁয়াও আছে ঘরের মধ্যে। খুব স্পষ্ট কিছুই চোখে পড়ে না।

স্বয়ং ফলাহারী বাবাও নন।

হয়তো ইচ্ছা করেই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকেন তিনি। মেঝে থেকে খানিকটা উঁচু বেদীর মত তাঁর আসন কুটিরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। সেই আসনের উপর প্রায় দেয়াল ঘেঁষে তিনি বসেন। তাঁর সামনে ওই প্রকাণ্ড

[illegible] ...কে। ইচ্ছা করলেই ভক্ত পা ছুঁয়ে প্রণাম [illegible] তাঁকে। গঙ্গোত্রীর জননীও পারলেন না।

তাঁর নিষ্প্রভ চোখে ফলাহারী বাবাকে স্পষ্ট দেখতেও পাচ্ছেন না তিনি। কিছুক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টা করবার পর ক্ষুব্ধকণ্ঠে তিনি বললেন, আপকা দর্শন ভী তো নহী মিলতা হ্যায়, মহাত্মাজী।

গম্ভীর স্বরে উত্তর হল: মুঝকো ক্যা দেখোগী, মায়ী। দর্শন করো কেদারনাথজীকো।

মায়ের হয়ে মেয়েই বললেন, কেদারনাথজীকে দর্শন করেই আমরা আপনার কাছে এলাম, বাবা।

বেশ বেশ।—বলে উঠলেন ফলাহারী বাবা: তব্ মজেমে ঘর লৌট জায়ো। উনকা প্রসাদ তো মনমে জরুর মিলা হোগা। অব দুসরেসে ক্যা মাঙনা?

শুনেই গঙ্গোত্রী তাঁর জননীকে জড়িয়ে ধরলেন। ফলাহারী বাবার মুখের কথাটাই যেন লুফে নিয়ে তিনি বললেন, শুনলে তো মা? বাবা তোমাকে বলছেন ঘরে ফিরে যেতে।

হ্যাঁ!—আবার গম্ভীর কণ্ঠ বেজে উঠল ফলাহারী বাবার: ঘরে গিয়ে ভগবানের নাম কর। ভক্তি থাকলে নিজের ঘরে বসেই তাঁকে পাওয়া যায়।

বৃদ্ধারই মনের কথা ওটি। তবু ওই কথা শোনামাত্রই যেন বুকের মধ্যে তাঁর অবরুদ্ধ আবেগ উথলে উঠল। গাঢ়স্বরে তিনি বললেন, কিন্তু আমার সে তো বাবা, বুঝল না ও কথা—আমাকে ছেড়ে, আইবুড়ো মেয়েকে ছেড়ে সংসার ছেড়েই চলে গেল।

কে?—জিজ্ঞাসা করলেন ফলাহারী বাবা। একটু যেন বিহ্বল তাঁর কণ্ঠস্বর।

বৃদ্ধা উত্তরে বললেন, আমার স্বামী।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করলেন গঙ্গোত্রী, না বাবা। আমার মা জানেন না—সত্যি কথা বুঝিয়ে বললেও উনি মানতে চান না তা। আমার বাবা সংসার ছেড়ে যান নি—মারা গিয়েছেন।

ঠিক সেই স্বর—গঙ্গোত্রীর কণ্ঠে যা রামপুর চটিতে আমি শুনেছিলাম ঠিক এই বিষয়েই ওঁর সঙ্গে আলাপ শুরু করবার পর। বিষণ্ণ বিপন্ন, কণ্ঠস্বর। শুনলেই গঙ্গোত্রীর জন্য সমবেদনায় শ্রোতার অন্তর কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে।

হয়তো তাই হয়েছিল সংসার-ত্যাগী ফলাহারী [illegible] ...চট

দিয়ে ছাই ঝেড়ে ধুনির আগুন যথাসম্ভব উজ্জ্বল করে দিলেন। সে আলোকে ক্রমান্বয়ে মা ও মেয়ের মুখ দেখলেন তিনি বারকয়েক এবং তার পরেও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অবশেষে নিজের স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর স্বরে বললেন, দোনো এক হী বাত হ্যায় বেটী। ঔর মায়ী, শোক করনেকী কোই বাতভী নহী। ঈশ্বর নে উনকো বোলা লিয়া। সময় হোনেসে তুমকোভী বোলা লেঙ্গে। তবতক তুম খুশমেজাজসে আপনা কাম করতে রহো।

কথা বেরুল সাধুর মুখ থেকে। কিন্তু যার উদ্দেশ্যে বলা তিনি সংসারী জীব—নারী এবং বৃদ্ধা। ও কথা শুনে কাতর কণ্ঠে তিনি বললেন, আমার যে বাবা, বুক খালি, ঘর খালি। কি কাজ করব আমি!

নাম কর।—ফলাহারী বাবা উত্তরে বললেন: সাধুসন্তের সেবা কর। তা হলেই ঘর-বুক সব ভরে উঠবে।

বলতে বলতে হাতের চিমটে দিয়ে জ্বলন্ত কাঠখানি আর একবার ঝেড়ে দিলেন ফলাহারী বাবা। সঙ্গে সঙ্গেই গনগনে আগুনের উজ্জ্বলতর দীপ্তিতে ঈষৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সাধুর মুখখানি। সে মুখ এতক্ষণ পর মোটামুটি চোখে পড়ে থাকবে বৃদ্ধার; তিনি অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, আপনার চেয়ে বড় সাধু আমি আর কোথায় পাব বাবা। আপনারই সেবা করব আমি। দয়া করে আমার ঘরে চলুন আপনি। না হয় এখানেই আপনার কাছে থাকবার অনুমতি আমায় দিন।

আমি ঠিক ওই মুহূর্তেই একটু যা চঞ্চল দেখলাম ফলাহারী বাবাকে। পিছন দিকে একটু সরে বসলেন তিনি। ধুনির আলোর সাক্ষাৎ গতিপথ থেকে নিজের মুখখানি সরিয়ে নিয়ে যেন আগের চেয়েও গম্ভীর স্বরে তিনি উত্তর দিলেন, দেখছ না মায়ী, কেদারনাথজী তাঁর নিজের দোসর করেছেন আমাকে! তিনিই আমার দেখাশোনা করেন। আর কোন সেবার আমার দরকারই নেই। যে চায় তার সেবা করগে তুমি।

কে সে?—বৃদ্ধার কাতর কণ্ঠে এবার যেন ঔৎসুক্যের রেশ।

ফলাহারী বাবা উত্তর দিলেন, অপনা আঁখে খুলকর্ দেখো—মিল জায়েগা! অব জাও মায়ী। খুশ রহো।

বিরক্তি না হোক, হুকুমের সুর বাবার শেষের কথাটাতে। বুদ্ধিমতী গঙ্গোত্রী আবার বৃদ্ধাকে জড়িয়ে ধরে অনুনয়ের সুরে বললেন, বাবার উপদেশ

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা যায় না ফলাহারী বাবাকে—আগুনের পরিখা রয়েছে তাঁর তিন দিকেই। মাটিতেই মাথা ঠেকিয়ে উদ্দেশে তাঁকে আর একবার প্রণাম করলেন বৃদ্ধা। তারপর মেয়ের হাত ধরে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

দেখাদেখি আমিও প্রণাম করলাম। আর একবার ফলাহারী বাবার মৃদু গম্ভীর কণ্ঠস্বর কানে এল আমার: খুশ রহো।

ইচ্ছা থাকলেও সে দিনটা কেদারক্ষেত্রেই থেকে যাবার উপায় ছিল না তাঁদের। গঙ্গোত্রীর ঘোড়াওয়ালা ক্রমাগত তাঁকে তাড়া দিচ্ছিল। প্রকৃতির তাড়না আরও প্রবল। একেই তো দুর্দান্ত শীত ওখানে—চনচনে রোদে দাঁড়িয়েও বৃদ্ধাকে শীতে কাঁপতে দেখেছিলাম। সেই রোদও নিভে গিয়েছে এখন। দুপুর হতে না হতেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালিয়ে বাঁচতে চান তাঁরা।

বিদায়ের পূর্বে বারবার দুঃখ করলেন গঙ্গোত্রী তাঁর 'ভাইয়া'র সঙ্গে দেখা হল না বলে। আমার মনে ক্ষোভের সঙ্গে একটু বিরক্তিও—জিতেন এখন উপস্থিত থাকলে ওঁদের সঙ্গেই আমরাও রওনা হতে পারতাম।

বিরক্তি আমার উদ্বেগ হয়ে উঠল ওঁদের বিদায় দেবার পর। তাই তো, জিতেন গেল কোথায়!

খোঁজ করতে করতে একটি সূত্র পাওয়া গেল। একজন অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শকের খোঁজ করেছিল জিতেন একাধিক স্থানীয় লোকের কাছে—যাকে সঙ্গে নিয়ে সে উত্তরের ওই চিরতুষারের দেশে যাত্রা করতে পারে।

অসম্ভব নয়। তার ওই ইচ্ছা ইতিপূর্বে একাধিকবার জিতেন নিজেই আমাকে জানিয়েছে। তবু অন্য একজনের মুখে জিতেনের সেই পুরাতন অভিলাষের কথা নতুন করে জানবার পর ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠল। পূর্বে যা আমি জানতাম না, ইতিমধ্যে তা যে আমার জানা হয়ে গিয়েছে! যা ছিল কেবলই পাহাড়, তা যে এখন আমার চোখেও স্বর্গারোহণের পথ—যার সঙ্গে এসে মিলেছে ভৈরবঝম্প, ভৃগুপাত, ব্রহ্মগুম্ফা ইত্যাদি পরলোকের সোজা পথগুলিও।

অতীতে যে দুর্দমনীয় আকর্ষণ [illegible]
মহাপ্রস্থানের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছে, সেই চৌম্বক শক্তি কোন অদৃশ্য পথে জিতেনের মনের উপর কাজ করছে না তো ?

বাহাদুরকে সঙ্গে নিয়ে তখনই উত্তর দিকে রওনা হলাম আমি।

মন্দিরের পিছনে ক্ষেতের আলের মত সরু পায়ে-চলা পথ আছে একটি। একেবেঁকে নীচের দিকে গতি তার। তেমন খাড়া অবশ্য নয়, তবে দুস্তর। স্থানে স্থানে জল জমে রয়েছে, গুল্মের মত যা ওখানে জন্মে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে, তাই পচে গিয়ে ভিন্ন জাতের একরকম কাদা হয়ে জমে আছে ও-পথের সর্বত্রই। অবিরাম বৃষ্টিতে শেওলা জমে পিছল হয়ে আছে প্রত্যেকখানা পাথরই। আর ততক্ষণে টিপটিপ করে বৃষ্টিও শুরু হয়েছে।

অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে চললাম দুজনে।

তবে খুব বেশী দূর পর্যন্ত নয়। খানিকটা চলবার পরেই স্বয়ং মন্দাকিনীই আমাদের গতিরোধ করলেন।

প্রথম দর্শনেই মন্দাকিনী বলে তাকে চেনা যায় না এখানে। ওদিকের তুলনায় চওড়া বেশী, কিন্তু গভীরতা কম। খুব রোদ পেয়ে উপরের বরফ বেশী পরিমাণে গললে অথবা খুব বেশী বৃষ্টি হলে নিশ্চয়ই খুব ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করেন ইনিও। তবে আপাততঃ দেখছি জল খুব কম। বালি এখানে নেই, তবে পরিমাণে বালুকণার মতই অসংখ্য ছোট-বড় শিলা ছড়িয়ে আছে সদ্যজাতা এই মন্দাকিনীর নাতিগভীর দোলনার মধ্যে।

অর্ধবৃত্তের আকারে সারা উত্তর দিকটা জুড়ে আছেন মন্দাকিনী—আর দুধ মধু ক্ষীর ইত্যাদি এসে পড়ছে তাঁর মুখে। অর্থাৎ উত্তরের ওই আকাশচুম্বী পর্বতশ্রেণীর গা বেয়ে বেয়ে শতধারায় জল নেমে এসে মিশছে মন্দাকিনীর জলের সঙ্গে। দুধগঙ্গা মধুগঙ্গা ইত্যাদি নাম সেই সব ছোট বড় স্রোতস্বিনীর।

তবে জল ওখানে দাঁড়াতে পারে না বলেই মোটেই গভীরতা নেই মন্দাকিনীর—চেষ্টা করলে পায়জামা না ভিজিয়েও ওপারে যাওয়া যায়। সেই চেষ্টাই করেছিলাম আমি। কিন্তু পার হবার আর প্রয়োজন হল না। পূর্বদিকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে যে জায়গায় মন্দাকিনীকে দেখলাম—তুলনায়

[illegible] দেখা পেয়ে গেলাম। সে কিন্তু জল পার হয়ে ওপারে চলে গিয়েছে।

উপরে কেদারনাথে মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়েই লক্ষ্য করেছিলাম আমি। উত্তর-পূর্ব কোণে বরফ-ঢাকা দুটি গিরিশৃঙ্গের মাঝখানে আকৃতি ও বিন্যাসের বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। নিকষকালো নিরেট পাথরের খাড়া পাহাড় দু দিকেই। কিন্তু উভয়ের মাঝখানে পিঙ্গলবর্ণ রাশিরাশি ভাঙা টালি যেন বিশৃঙ্খলভাবে স্তূপীকৃত হয়ে আছে। পরে যখন শুনলাম যে উপরের মহাপ্রস্থানের পথে মৃত্যুর হাঁ-করা মুখটাকে সরকারের হুকুমে পাথর দিয়ে বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন ভেবেছিলাম যে, ওই বুঝি দূর থেকে বয়ে আনা সেই সব পাথরের স্তূপ— বুঝি হিমালয়ের কোলে ওই বিচিত্র ব্যতিক্রমটুকুই অতীতের সেই ভৃগুপাত বা ব্রহ্মগুম্ফাকে চিহ্নিত করে রেখেছে। সেই ধারণাই আমার মনে আরও প্রবল হয়ে উঠল যখন দেখলাম যে, ওপারে সেই অংশটুকুরই পাদমূলে দাঁড়িয়ে উপর দিকে চেয়ে আছে জিতেন।

প্রথমে বাহাদুরই দেখতে পেয়েছিল তাকে। সে-ই উল্লাসের স্বরে বলে উঠল, ওই যে ছোটা বাবুজী।

দেখেই আমিও যথাসম্ভব গলা চড়িয়ে ডাকলাম, জিতেন, ও জিতেন।

ভাগ্য ভাল আমার, দু-তিনবার ডাকবার পরেই শুনতে পেল সে।

আরও সৌভাগ্য যে আমার ইশারা বুঝতে পেরে জিতেন তখনই এপারে চলে এল।

আমি তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার পূর্বেই নিজেই সে বললে, দূর থেকে মণিদা, মনে হয়েছিল আমার যে একটা ফাঁকা জায়গায় বুঝি পাশের কোন একটা পাহাড়ের বড় একটা অংশ ভেঙে পড়ে স্তূপ হয়ে আছে। কিন্তু আসলে দেখলাম যে তা নয়। ভিন্ন রঙের একেবারে আলাদা একটি পাহাড় ওটি। দূর থেকে যে পাথরগুলিকে আলগা মনে হয়, তা কাছে গিয়ে দেখি, বড় রুই মাছের আঁশের মত পাহাড়টার গায়েই আটকে রয়েছে।

আমার মনের সব কৌতূহল তখন একটি অস্পষ্ট কিন্তু প্রবল আশঙ্কার নীচে চাপা পড়ে গিয়েছে। জিতেনকে আমি খুলে বলতেও পারি নে সে আশঙ্কার কথা—পাছে আমার কথা শুনেই আরও বেশী ঝোঁক চাপে তার ওই পাহাড়টাকে খুঁচিয়ে দেখবার জন্য। এখন ভালয় ভালয় তাকে ফিরিয়ে নিতে পারলে বাঁচি আমি। তাই ও প্রসঙ্গের উল্লেখমাত্র না করে আমি বললাম,

তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান আমরা। বা[illegible] তো [illegible] নি তুমি। কি করে বুঝব যে এই দিকে এসেছ?

কিন্তু আমার কথা যেন কানেই গেল না তার। সে মুখ ফিরিয়ে আবার ওই পাহাড়টার দিকে চেয়ে বললে, ওপরে উঠবার ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু পথ খুঁজে পেলাম না।

আমি তাড়াতাড়ি তার একখানা হাত চেপে ধরে বললাম, পথ খুঁজে পেলেই কি উঠতে পারব আমরা? আর পারলেও ওঠা উচিত নয়। উপরে তো আর চটি নেই—গেলে থাকব কোথায়?

জিতেন প্রতিবাদ করল না দেখে আশ্বস্ত হয়ে আমি আবার বললাম, চল ফিরে যাই। দেখছ না, বৃষ্টি ক্রমেই বাড়ছে। এমন খোলা জায়গায় আর কিছুক্ষণ ভিজলে আমরাও জমে বরফ হয়ে যাব।

একরকম টেনেই ফিরিয়ে নিয়ে এলাম তাকে।

দুদিন পরে ফেরবার পথে নালাচটিতে আবার ওই প্রসঙ্গ উঠেছিল। স্থানীয় কার সঙ্গে যেন অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করবার পর ঘরে ফিরে এসে বেশ একটু উত্তেজিত স্বরেই জিতেন বললে, শুনেছেন মণিদা, কেদারের পিছনের ওই পাহাড়গুলির মধ্যে কোথায় নাকি একটা গুহা আছে? সেকালে যাত্রীরা তার মধ্যে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করত বলে গবর্ণমেণ্ট নাকি সেটি বুজিয়ে দিয়েছে।

শুনেই ভাবানুষঙ্গে সেদিনের সব কথা মনে পড়ে গেল আমার। হঠাৎ বুকটাও কেঁপে উঠল। জিতেনের মুখের দিকে চেয়ে রুদ্ধনিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলাম, এ খবর আগে জানতে না তুমি? কেদারে গিয়ে শোন নি কারও মুখে?

ঘাড় নেড়ে অস্বীকার করল জিতেন। কিন্তু তার পরেই অল্প একটু হেসে সে বললে, ভাগ্যিস জানা ছিল না। কেদারে গিয়ে যে রকম মনের অবস্থা হয়েছিল আমার তাতে ওই খবর জানা থাকলে আমি নির্ঘাত সে গুহাটিকে খুঁজে বের করতাম।

আর তারপর বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়তে তার মধ্যে?

সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে দিয়ে জিতেন উত্তর দিল, এখন আর কি করে বলি তা। ফাঁড়া থাকলেও তা কেটে গিয়েছে।

একটু থেমে সে আবার বললে, ফাঁড়া সত্যি কেটে গিয়েছে মণিদা। নইলে কি আর জীবনের দেবতা বদরীনারায়ণকে দর্শন করতে ছুটি!

কেদারক্ষেত্রে থাকতে থাকতেই নিজেও লক্ষ্য করেছিলাম আমি। ওই তো কেদারনাথের দক্ষিণদুয়ারী মন্দির।' তার উপরেও জীবন তার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িয়েছে।

শঙ্করাচার্য কেদারনাথ ও তাঁর মন্দিরের সংস্কারসাধন করেছিলেন। কিন্তু শঙ্করের শঙ্করও ইতিমধ্যে পুনরায় রূপান্তরিত হয়েছেন।

সেই রাত্রে শ্রীকেদারেশ্বরের আরতি দেখতে দেখতেই মনে হয়েছিল আমার যে, জীবের কাছে আবার হার মেনেছেন শিব।

ভাবসর্বস্ব কেদার-শিলারই রাজবেশ এখন। যোগীশ্বরেরও শৃঙ্গারবেশ। শঙ্করাচার্যের উপাস্য শিবকেও রাজার বেশে ভোগীর বেশে সাজিয়ে তবে তাঁর আরতি করা হয়। শীর্ষে এখন সোনার মুকুট তাঁর, গায়ে মহামূল্য কিংখাবের মণিমুক্তাখচিত উত্তরীয়। তার উপর আবার থরে থরে মালা। অন্য যে কোন মন্দিরে যেমন, এখানেও তেমনি—ধূপ দীপ ব্যজনী ইত্যাদি দিয়ে পর্যায়ক্রমে আরতি করা হয় রাজরাজেশ্বররূপী কেদারনাথের। গমগম শব্দে কাঁসর-ঘণ্টা বাজে, স্তোত্রগান হয় পূজারী ও ভক্তবৃন্দের সমবেত কণ্ঠে।

নির্বিকল্প সমাধিতে তৃপ্তি হয় না ভক্তের। সুষুপ্তি নয়—স্বপ্নই বুঝি অধিকতর কাম্য তার। চিদানন্দরূপী শিবকে ষড়ৈশ্বর্যময় ভগবানে রূপান্তরিত করেছে সে।

একালে জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা আর নন এই কেদারনাথ; তিনি এখন নবজীবনের প্রেরণা। শঙ্করাচার্য বদরীনাথে দিব্যজ্ঞান লাভ করে জীবনের শেষ পূজা করতে এসেছিলেন কেদারক্ষেত্রে। একালের যাত্রীরা কেদারনাথকে দর্শন করবার পর জীবনের দেবতা বদরীনারায়ণের দেউলের উদ্দেশে যাত্রা করে।

আমরাও তাই করলাম পরদিন। নতুন যাত্রার নতুন মন্ত্র—জয় বদরীবিশালকী।

॥ ১৬ ॥

আগের দিন বৈকালেই দেখেছিলাম যে, অনেক যাত্রীর বেশ বড় একটি দল কেদারক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হল। পরদিন পথে বেরিয়ে দেখি যে দলে দলে আরও যাত্রী আসছেন।

মন্দির বন্ধ হবার তারিখ এগিয়ে আসছে বলেই যাত্রীর ভিড় বাড়ছে। প্রতি বৎসরই এমনই হয়ে থাকে। গোড়ার দিকে যাত্রী আসে বন্যার বেগে, মাঝে থিতিয়ে যায়, শেষের দিকে আবার জোয়ার। সেই জোয়ারেরই আভাস পেলাম আমরা আমাদের ফিরতি-পথে।

কেবল ইঙ্গিত নয়, দীপ্তিও। অনেকগুলি অচেনা মুখ পিছনে ফেলে আসবার পর হঠাৎ দেখি দুটি চেনা মুখ। সেই মৃন্ময়ী ও তাঁর স্বামীর দেখা পেলাম রামোয়াড়ার কাছাকাছি আসবার পর।

মৃন্ময়ীর ঈষৎ পাণ্ডুর মুখখানিও দেখলাম উৎফুল্ল। দল ভাঙাভাঙি, দৈহিক অসামর্থ্য এবং পরে শক্ত জ্বরের মত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করেও তিনি যে শেষ পর্যন্ত শ্রীকেদারনাথের চরণতলে গিয়ে পৌছতে পারছেন সেইজন্যই অত উল্লাস মৃন্ময়ীর।

খানিকটা তার উছলে পড়ল আমাদের সঙ্গে তাঁদের দেখা হতেই। মৃন্ময়ী প্রায় আবদারের সুরেই আমাকে বললেন, একটু ধীরে ধীরে চলবেন রায় মশায়, যাতে আমরাও আপনাদের সাথী হতে পারি। কেদার থেকে আজই আমরা রওনা হয়ে আসব।

কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও ধীরে ধীরে চলতে পারি কই! এখন উপর থেকে নীচের দিকে গতি আমাদের। এ যেন ভাটার টানে তরতর করে এগিয়ে চলা। সেই রামোয়াড়া ও সেই গৌরীকুণ্ড পার হয়ে গেলাম। চেনা জায়গা বলেই আবার সেখানে রাত কাটাতে মন চায় না। নতুন পরিবেশ, অচেনা মানুষের সাহচর্য আস্বাদন করতে চায় নতুনের পিয়াসী মন।

তিন দিন লেগেছিল উজান ঠেলে যে পথটুকু অতিক্রম করতে তার চেয়েও বেশী পথ একদিনেই পার হয়ে এলাম। পাঁচ ঘণ্টায় প্রায় তেরো মাইল পথ হেঁটে এসে থামলাম বদলপুর চটিতে।

পরদিনও ওই রকম। পাঁচ ঘণ্টায় এগারো মাইল পার হয়ে পৌছলাম নালাচটিতে। বেলা তখন প্রায় দুটো। দিনের আলো ও পায়ের জোর,

[illegible]-হর অভাব নেই। তবু [illegible]নেই থামতে হল। কেদার-বদরী পথের এক জংশন ওই নালাচটি—উজান পথে যেমন গুপ্তকাশী। গায়ে জোর থাকলেও মন স্থির করবার এবং পথ ঠিক করবার জন্য সব যাত্রীকেই থামতে হয় ওখানে।

দোটানা নয়, একেবারে তেটানা।

বদরী-কেদারের অতি প্রাচীন পায়দল মার্গ ওই নালাচটি থেকেই চামৌলি পর্যন্ত গিয়েছে উখীমঠ ও তুঙ্গনাথ হয়ে। হাওড়া-দিল্লী রেলপথের গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইনের সামিল ওই পায়ে-চলা পথ। কিন্তু তা কেবল দূরত্বের হিসাবে। একালে তারও প্রায় তেইশ মাইল দূরত্বকে ফাঁকি দেওয়া যায় মাত্র চোদ্দ মাইল পথ সামনে পশ্চিমদিকে হেঁটে ফিরে অগস্ত্যমুনি চটিতে গিয়ে বাস ধরলে। তৃতীয় টান আরও নীচে যার যার ঘরবাড়ির। অগস্ত্যমুনি চটিতে পৌঁছবার পর বাসে চড়লে বদরীনাথ না গিয়ে সোজা ফিরে যাওয়া চলে হরিদ্বারে।

"স্বর্গ হইতে বিদায়" নিয়ে এসেছি। মর্তের টান এখন অনুভব করছি নাড়ীতে নাড়ীতে। তাই বললাম জিতেনকে : ফিরে গেলেও হয়—বদরীনাথ গেলে নতুন আর কি দেখতে পাব?

জিতেন হেসে উত্তর দিল, আমি নিজে সেখানে না গেলে আপনার প্রশ্নের উত্তর কেমন করে দেব? আর আপনিও নিজে সেখানে না গেলে কোন উত্তরেরই সত্যাসত্য যাচাই করবেন কেমন করে?

এ প্রশ্নের উত্তর নেই। মাঝপথ থেকে ফিরে যাবার সপক্ষে যুক্তি নিতান্তই দুর্বল। আর যাওয়াই যদি ঠিক হয় তবে হাঁটা-পথই যে প্রশস্ত সে সম্বন্ধে জিতেনের সঙ্গে আমি একমত।

শেষ অনিশ্চয়তাটুকুরও নিরসন হল রাত্রে জিতেন ভৈরবঝম্প ইত্যাদির তাৎপর্য জেনে আসবার পর।

স্থানীয় প্রাচীনদের সকলেরই জলন্ত বিশ্বাস ও গম্ভীর নির্দেশ : কেদারনাথ দর্শন করবার পর বদরীনারায়ণকে দর্শন না করলে অমঙ্গল হয়।

একই মন্দাকিনীর এপার আর ওপার। এপারে নালাচটি, ওপারে উখীমঠ। তথাপি দূরত্ব আড়াই মাইল। উত্তর-দক্ষিণে হিমালয় পর্বতশ্রেণীকে কেটে দু ভাগ করেই তৃপ্তি হয় নি মন্দাকিনীর। শিখরের দুহিতার ঝোঁক কেবলই হিমালয়ের চরণের দিকে। সেই চরণ ছুঁয়েই মন্দাকিনীর গতি এখানে।

সুতরাং নদী পার হবার জন্তই যাত্রীকে [illegible]চটি থেকে [illegible]চের দি[illegible]মতে হবে মাইলখানেক। আবার ওপারের পাহাড়ে উঠতে হবে অতিরিক্ত আরও আধ মাইল উখীমঠ গিয়ে পৌছবার জন্য।

শ্রীকেদারেশ্বরের দ্বিতীয় রাজধানী ওই উখীমঠ। সারাটা শীতকাল ওখানেই কেদারনাথের পূজা-আরতি হয়ে থাকে। সে মরসুম পড়ে নি এখনও। সুতরাং ছাড়াবাড়ির মতই শ্রীহীন এখন উখীমঠের মন্দির-এলাকা। যেটুকু ওখানে জনপদ তা তৃতীয় শ্রেণীর শহর। চারিদিকের উদ্দাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে কেমন যেন বেমানান ঠেকে। চুন-সুরকি আর রঙের জলুস।

ওই জলুস আছে কেদারনাথের প্রধান মোহন্ত রাওয়ল সাহেবের প্রাসাদেও। মহাভারত যুগের বাণ রাজা ও তাঁর কন্যা উষার (যা থেকে উষী বা উখী নাম হয়েছে) রাজপ্রাসাদের ভগ্নস্তূপের উপর প্রতিষ্ঠিত শঙ্কর-শিষ্যদের মঠ বুঝি ক্ষুধিত পাষাণের অপরিমেয় আকাঙ্ক্ষার প্রভাবেই নিজেও কালক্রমে প্রাসাদ হয়ে উঠেছে।

তা খুঁটিয়ে দেখবার ধৈর্য নেই আমাদের, সুতরাং সময়ও নেই। দিনের যাত্রা শুরু করবার পূর্বেই গাইড-বই দেখে লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছি আমরা— বেণিয়াকুণ্ডে গিয়ে রাত্রিবাস করব। উখীমঠ থেকে তার দূরত্ব প্রায় বার মাইল। সুতরাং কেদারনাথের শূন্য মন্দির এবং পাশাপাশি কয়েকটি ভবনে এক একবার উঁকি দিয়েই আবার পা চালিয়ে দিলাম আমরা।

বেণিয়াকুণ্ডের নিজস্ব কোন আকর্ষণ নেই। ওখানে না আছে বেণিয়া, না কুণ্ড। তবু অত যে নামডাক ওই চটির তার কারণ তুঙ্গনাথ পাহাড়ের পাদমূলে ওর অবস্থিতি। কেদারক্ষেত্রের পথে যেমন ত্রিযুগীনারায়ণ, গ্র্যাণ্ডকর্ড লাইনে তেমনি তুঙ্গনাথ পাহাড়। এখানেও অতিরিক্ত তিন মাইল দুর্গম চড়াই। তাই ভাঙবার শক্তি অক্ষুণ্ন রাখবার জন্তই যাত্রীরা আগের দিন বেণিয়াকুণ্ডে উপস্থিত হয়ে অন্ততঃ একটি রাত্রি বিশ্রাম করে সেখানে।

অতিরিক্ত আর একটি কারণে এক দিনে প্রায় পনের মাইল পথ হাঁটতে রাজী হয়েছিলাম আমি। নিজেরই গরজ আমার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের এই পার্বত্য অভিযান শেষ করবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠেছে আমার মনে। দৈনিক মাইল তিনেকও যদি বেশী হাঁটতে পারি তবে চার দিনের পথ তিন দিনে পার হয়ে যাব এবং ওই অনুপাতেই কমে যাবে আমাদের বনবাসের কাল। উদ্দাম প্রকৃতির নিবিড় সাহচর্যে অতি-তৃপ্ত মনের কাছে সে

প্রলো[illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] আমার মনের কোণে আশা ছিল যে, তুঙ্গনাথের নাম করা চড়াইকে বাদ দিলে। এদিকের পথ হয়তো তেমন কঠিন হবে না।

অঙ্কের হিসাবে আমার কোন ভুল হয় নি, কিন্তু আশা মরীচিকা।

চড়াই হলেও বেশ ছিল উখীমঠ পর্যন্ত। কিন্তু জনপদটুকু ছাড়িয়ে যাবার পরেই দেখি যে, পথের চেহারা একেবারে বদলে গেল। তেমন প্রশস্ত আর নয়। সেটা অবশ্য পদযাত্রীর চোখে পড়বার মত কিছু নয়। যাকে উপেক্ষা করা যায় না সেটি সত্যিই মারাত্মক দোষ। সে দোষ আমার চরণ দুটিকে ক্রমাগতই খোঁচা দিচ্ছে, চোখ দুটিকেও তা রেহাই দেয় না। অব্যবস্থত, অবহেলিত, সংস্কার অভাবে জীর্ণ এ দিকের পথ। কোথাও গর্ত, কোথাও দেখি যে পথের উপরেই স্তূপ হয়ে জমে আছে মাটি পাথর ও গাছের ডাল। একাধিক জায়গায় দেখলাম যে যাত্রীসড়ক একেবারেই অব্যবহার্য বলে পরিত্যক্ত হয়েছে, আর লোকজন, জন্তু-জানোয়ারের পায়ের তাগিদে পাশের পাহাড়ের উপর দিয়ে এমন খাঁটি পায়ে-চলা পথের সৃষ্টি হয়েছে যাতে চলতে গিয়ে হাতে অত বড় একটি লাঠি থাকতেও আমার মত যাত্রীকে সার্কাসের কসরত করতে হয়। বেচারা বাহাদুরের অবস্থা স্বভাবতঃই আরও কাহিল। একটু উঁচু অথচ মসৃণ জায়গা না পেলে পিঠের বোঝা সে নামাতেই পারে না। তেমন জায়গা ওই উখীমঠ পর্যন্ত অনেক পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু এ পথে যাত্রী বা কুলির পরিশ্রম লাঘব করবার জন্য মানুষ যেন কিছুই করে নি; আর প্রকৃতি এদিকে মনে হচ্ছে অকরুণ ও কৃপণ।

পাণ্ডার প্রচার-পুস্তিকার পৃষ্ঠায় চটির তালিকায় নাম আছে অনেক। কিন্তু আমার চোখে যেগুলি পড়ছে সেগুলি ওই পথের মতই পরিত্যক্ত মনে হয়, কেবল ভিটাই চোখে পড়ে অনেক। কোন কোন ঘরের চালাখানি মাত্র কোন রকমে খাড়া আছে। কুটিরের আকার মোটামুটি বজায় আছে এমন অনেক চটিতেও চটিওয়ালা উপস্থিত নেই। দু-চারজন যাদের দেখা মিলল তাদের চটিতেও আতিথ্যের তেমন আয়োজন নেই; তাদের আহ্বানে সহৃদয়তার অভাব না থাকলেও উৎসাহের অভাব আছে মনে হয়।

একাদিক্রমে তাদেরই কয়েকজনের মুখে শুনে কারণটা বুঝতে পারলাম। যাত্রীর মরসুম শেষ হয়ে আসছে বলে নয়, এ পথে যাত্রী আজকাল আসেই খুব কম। যেকালে সবটাই হাঁটাপথ ছিল সেকালে কেদার থেকে তুঙ্গনাথ

হয়ে বদরীনাথ যেতেই হাঁটতে হত কম। [illegible] মোটর চলবার ফলে প্রায় বিপরীত অবস্থা। এখন অধিকাংশ যাত্রীই পয়সা খরচ করে মোটরে যায় হাঁটবার পরিশ্রম লাঘব করবার জন্য। কাজেই তুঙ্গনাথের পথে লোক চলাচল আজকাল অনেক কম।

শুনতে শুনতে একবার জিতেন বলে উঠল, তা হলে গঙ্গোত্রীরাও বোধ করি এ পথে না এসে অগস্ত্যমুনি হয়ে মোটরেই গিয়েছেন।

তাঁদের স্মৃতি আমারও মনের কোণে উঁকিঝুঁকি মারছিল; আশা আমারও ছিল যে, এই পথে চলতে চলতে কোন একটি চটিতে আবার দেখা হবে তাঁদের সঙ্গে। জিতেনের মন্তব্য শুনে এখন মনে হল যে সে আশা আমার নাও মিটতে পারে। তবু যথাসম্ভব গঙ্গোত্রীদের বর্ণনা দিয়ে সেই চটিওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

কিন্তু মাথা ঝেঁকে উত্তর দিল লোকটি: না বাবুজী, পুরুষেরাই এ পথে চলে না আজকাল, তা মেয়েরা আসবে এই বনজঙ্গলের হাঁটা-পথে!

বেশ তিক্ত কণ্ঠস্বর তার। তবে যাত্রীর চেয়ে তুঙ্গনাথের বিরুদ্ধেই যেন বেশী অভিযোগ ও অভিমান তার। একই রকম কথা শুনলাম আরও অনেকের মুখে—ঘোর কলিযুগে তুঙ্গনাথের মাহাত্ম্যই কমে গিয়েছে। নইলে কি আর তাঁর যাত্রী ভাঙিয়ে নেবার জন্য এই উত্তরাখণ্ডে মোটরবাস প্রবেশ করতে পারে!

শুনতে শুনতে মনে দোলা লাগে আমার। এও একরকম নিষ্ঠুর নিয়তি। কতদূরে অগস্ত্যমুনি—এখান থেকে মাইল কুড়ি দূর তো হবেই। আর উচ্চতার হিসাবেও অনেক নীচে তার অবস্থান। অথচ ঋষিকেশ থেকে সেই পর্যন্ত যে মোটরবাস আসা-যাওয়া করছে তারই ধাক্কায় এত দূরের যাত্রীসড়ক ও তার দু পাশের চটিগুলিই কেবল নয়, তুঙ্গনাথের মত মহাদেবতার বেদীতেও ফাটল দেখা দিয়েছে।

তবু ফাটা হোক, সরু হোক, বন্ধুর হোক—উখীমঠ ছাড়বার কিছু দূর পর্যন্ত মোটামুটি চলনসই পথ পেয়েছিলাম। আর ঠিক সমতল না হলেও কঠিন চড়াই বা খাড়া উতরাই পাওয়া যাচ্ছিল না। মাঝে মাঝে গ্রাম এবং শস্যক্ষেত্রও চোখে পড়ছিল। একটি বেশ বড় বসতি বা গ্রাম পেলাম—আপাতদৃষ্টিতে সমতল ভূমির গ্রামেরই যেন প্রতিচ্ছবি। একটি ঘরের চাল দেখি নধরকান্তি কুমড়োর ডগা ও বড় বড় সতেজ সবুজ পাতায় প্রায় ঢেকে

[illegible] আর একটু কাছে [illegible] দেখি যে, ছোট-বড় অনেক কুমড়োও ফলে রয়েছে চালের উপর ওই পাতাগুলির ফাঁকে ফাঁকে। এমন দৃশ্য হিমালয়ে প্রবেশ করবার পর আর চোখে পড়ে নি। এখন দেখেই আমার মন তো 'লোভে কম্পমান'। হাঁক-ডাক করে মালিকের সন্ধান পাওয়া গেল। সে মাঝারি আকারের একটি কুমড়োর দাম বললে চার আনা। চার টাকা দামও যদি সে হাঁকত তবু এ রকম জায়গায় তা আমি বেশী মনে করতাম না। সুতরাং তৎক্ষণাৎ চার আনা দিয়ে জিনিসটি কিনে ঝোলাজাত করলাম আমি।

কারণ তো লোভ। আর শাস্ত্রে আছে যে—লোভই পাপ। সেই পাপেরই ফল হবে হয়তো। সেরচারেক ওজনের সেই কুমড়োটি আমি স্বেচ্ছায় নিজের পিঠে তুলে নেবার পরেই দেখি যে পায়ের নীচের পথ ও তার দু পাশের দৃশ্য একেবারে ভিন্ন আকার ও প্রকৃতি ধারণ করেছে।

দোয়েড়া না দুর্গাচটি থেকেই শুরু। আকাশগঙ্গা নামের একটি স্রোতস্বিনী পার হয়েছিলাম পাতালের দিকে অনেকটা নেমে গিয়ে, তারপর কাঠের পুলের উপর দিয়ে। তারপরেই চড়াই। প্রথমে ভেবেছিলাম যে ওপারে যতটা নীচের দিকে নামতে হয়েছিল এপারে মোটামুটি ততটাই উঠতে হবে। কিন্তু একটু পরেই ভুল ভেঙে গেল। এবার আরোহণের দেখি আর শেষ নেই। উঠতি-পথেই চটি পেলাম একটি। জন দুই মাত্র দোকানদার। টিমটিম করে জ্বলছে একটি যেন মাটির প্রদীপ। সেই চটির সঙ্গে সঙ্গে আলোও অদৃশ্য হল।

"পোখীবাসা" সার্থক নাম চটিটির। ঘরবাড়ি কখানা পিছনে ফেলে যেখানে প্রবেশ করলাম, কেবল ডানাওয়ালা পাখিরাই সহজে যেতে পারে সেখানে। যেমন উঁচু, তেমনি দুর্গম।

নিবিড় অরণ্যের ভিতর দিয়ে চড়াই পথ। কেদারের পথে আগাগোড়াই যেমন পেয়েছি তেমন খাড়া চড়াই অবশ্য নয়। পায়ে-চলা সরু পথ খুব ধীরে ধীরে উপরে উঠে গিয়েছে। তেমন হাঁফ ধরে নি বলেই বুঝতে পারি নি এতক্ষণ। হঠাৎ পাথরের ফলকে ৬০০০ ফুট লেখা দেখে বেশ যেন একটা ধাক্কা খেয়ে মন আমার সচেতন হয়ে উঠল। আরও কিছুক্ষণ পর দেখি ৭০০০ ফুট—ও পথে গৌরীকুণ্ডের চেয়েও বেশী উঁচু। উখীমঠের উচ্চতা ছিল ৪০০০ ফুট। মোট ৩০০০ ফুট একদমে উঠে আসবার পরেও

সহজভাবেই যে হাটতে পারছি আর কারণ উচ্চতা [illegible] [illegible],
জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে।

ভিন্ন প্রকৃতি এ দিকের পাহাড়ের। ওপারে অধিকাংশ পথেই একদিকে দেখেছি গভীর খদ ও অপরদিকে আকাশসমান উঁচু পাহাড়। এপারে পথের ধারেই খদ চোখে পড়ে না; অপরদিকে পাহাড়ের বুক বা পিঠও নয়। আসল কথা, পাহাড়ের গা বেয়ে আর চলছি নে আমরা। পাহাড় ডিঙিয়ে চলেছি তার মাথার উপর দিয়ে। তবে চূড়ার আকার নয় এই মাথার। কাছিমের মত আকারের বিশাল একটি মালভূমি এটি। 'ভূমি' কথাটি সার্থক এই পাহাড়টির বর্ণনায়। পাথর নিশ্চয়ই অনেক আছে এখানে—আমাদের পায়ের নীচের পথটাই তো পাথর দিয়ে বাঁধানো। তবে পাথুরে পাহাড় এটি নয়। নিবিড় বন ছড়িয়ে রয়েছে সবটা মালভূমি জুড়েই। সেই বনের ধারে ধারে নয়, মাঝখান দিয়ে আমাদের পথ।

কেবল নিবিড় নয়, অদৃষ্টপূর্ব এই বন। ওপারের বন দেখে ভয় পেয়েছিলাম। এখন সেই কথা স্মরণ করে নিজের কাছেই লজ্জা পাই। আমার অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ মন আজকের এই বন দেখে বিস্ময়ে বিহ্বল। ওপারে যাকে মনে করেছিলাম মহীরুহ, এপারে এই নিবিড় অরণ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে তারই রূপ কল্পনা করে বুঝি যে, তুলনায় তা ছিল সাধারণ একটি গাছই।

বেণিয়াকুণ্ড পর্যন্ত চার মাইল পথের প্রায় সবটাই ওই মহীরুহসঙ্কুল নিবিড় বন। বুঝি হিমালয়েরই সমবয়সী ও-বনের প্রত্যেকটি মহীরুহই। বন অত নিবিড় বলেই বৎসরের বার মাসই বৃষ্টি হয় এদিকে—তখনও বৃষ্টি মাথায় করেই চলছিলাম আমরা। যুগ-যুগান্তর ধরে এমনি অবিরাম বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে লোহার মত কালো হয়ে গিয়েছে অধিকাংশ বৃক্ষেরই গায়ের রঙ। শেওলা যা জমেছে তা এদের কাণ্ড ও শাখায় পুরু প্রলেপ লাগিয়েই নিঃশেষ হয় নি। সমতল ভূমিতে বটগাছের যেমন ঝুরি নামে তেমনি ওই সব বৃক্ষের নানা শাখা-প্রশাখা থেকে থরে থরে ঘনীভূত শেওলার ঝুরি নেমে এসেছে প্রায় মাটি পর্যন্ত। থেকে থেকেই ভ্রম হয়, বুঝি জটাজুটধারী সন্ন্যাসীরা সারি সারি ধ্যানে বসেছেন, অথবা অধোবাহু হয়ে ঝুলে ঝুলে কৃচ্ছ্রসাধনা করছেন।

জিতেন এগিয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যার একটু পূর্বে বেণিয়াকুণ্ডের কাছাকাছি এসে দেখি যে, পথের একখানা পাথরের উপর চুপ করে বসে আছে সে।

তখনও টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। কিন্তু আকাশে নিবিড় মেঘ নেই।

আ... [illegible] এখানে শেষ হবে... [illegible] বাঁয়ে ও সামনের দৃশ্যগুলি মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। এখন [illegible] যায় যে বাঁয়ে একটু দূরেই খদ ও তার ওপারে নাতি-উচ্চ পাথুরে পাহাড়ের সারি। সামনে বেণিয়াকুণ্ড চটির ঘর-বাড়িও কয়েকখানা দেখা যাচ্ছে।

আমি তার কাছে আসবার পরেও জিতেন উঠে দাঁড়াল না। দেখে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সুরেই আমি বললাম, হাঁটবার শখ মিটেছে তোমার? বুঝেছ যে তোমার পা-দুখানিও লোহা দিয়ে তৈরি নয়?

কিন্তু বিদ্রূপ গায়ে মাখল না জিতেন। বরং মিষ্টি রকমের একটু হেসেই সে আমাকে বললে, আমার প্রশ্নের জবাব আগে দিন আপনি। সব রকমই দেখা হয়ে গিয়েছে বলে ওপার থেকেই তো আপনি ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। এখন বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, এ দিকে না এলে মস্ত একটা লোকসান হত কি না?

কোন্ মুখে অস্বীকার করব! চড়াই-পথে একটানা পনর মাইল হেঁটে দেহ আমার যতই ক্লান্ত হোক না কেন, মন যে আমার নব নব প্রাপ্তির আনন্দে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে তা অস্বীকার করবার জো নেই। সুতরাং প্রশ্ন শুনে লজ্জিত হাসিমুখে চুপ করে থাকতে হল।

কিন্তু বিজয়গর্বে উৎফুল্ল জিতেনের মুখ। সে সহাস্যকণ্ঠে আবার বললে, ওই দেখুন, আরও একটি নতুন দৃশ্য।—বলতে বলতে সে তার ডান হাতখানা তুলে অঙ্গুলিসঙ্কেতে খদের ওপারে একটি পাহাড় দেখাল আমাকে।

গোধূলির অস্পষ্ট আলোকে দূরের দৃশ্য দেখবার জন্য বিশেষ একটু চেষ্টা করতে হয়েছিল বইকি! কিন্তু দেখবার পর চোখ আর ফিরতে চায় না। নয়নাভিরাম দৃশ্য। গঠনের বৈচিত্র্য পাহাড়ে পাহাড়ে কতই তো দেখেছি ওপারে। সে সবই মনে হয়েছে খামখেয়ালী বিধাতার আকস্মিক সৃষ্টি। কিন্তু এখন সামনে ওই পাথুরে পাহাড়গুলির একটির গায়ে দেখলাম অনবদ্য কারুকার্য—যেন সেই বিধাতাই পাথরের বুকে মন ঢেলে নিজের হাতে রূপ-সৃষ্টি করেছেন

খদের ওপারে পাটকিলে রঙের একটি পাথুরে পাহাড়। কি কারণ কে জানে—তার শিখর থেকে মেখলা পর্যন্ত অনেকটা অংশ ভেঙে গিয়েছে। অবশিষ্ট পাহাড়টুকু এপার থেকে মনে হচ্ছে যেন প্রাচীর-চিত্রশিল্পের সমৃদ্ধ একটি প্রদর্শনী। উড়িষ্যা থেকে শুরু করে সারা দক্ষিণ-ভারত জুড়ে দেবমন্দিরের

দ্বার ও দেয়ালে যে অতুলনীয় [illegible] কারুকার্য দেখা যায় [illegible] [illegible] সঙ্গেই তুলনা হতে পারে ওর এক একটি চিত্র। [illegible] নটরাজের বামপদের আঘাতে ওই পাহাড়ের একটি অংশ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ভেঙে পড়েছে, তাঁরই দক্ষিণ চরণের নৃত্যছন্দে অবশিষ্ট অংশের খাঁজে খাঁজে নিখুঁত হয়ে ফুটে উঠেছে ঘর-বাড়ি, ফুল-পাতা, জন্তু-জানোয়ার—এমন কি মানুষের ভাববিহ্বল মুখচ্ছবিও।

নূতন দৃশ্য আরও কিছু কিছু দেখা হল বইকি! পঞ্চকেদারের অন্যতম তুঙ্গনাথ। তুঙ্গশিখরে অধিষ্ঠান বলেই বুঝি তুঙ্গনাথ তাঁর নাম। ফুটের মাপে কেদারক্ষেত্রের চেয়েও উঁচুতে তাঁর দেউল। বহু আয়াসসাধ্য তাঁর দর্শন। বৃষ্টি ও কুয়াশার জন্য তা অস্পষ্ট হলেও তুঙ্গনাথ পাহাড়ের সানুদেশে তার অঢেল ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলাম। উপরে দর্শন দিতে পারবেন না বলেই বুঝি তুঙ্গনাথ নীচেই তাঁর বিরাট রূপ ও বিপুল বিভূতি ক্ষণিকের জন্য প্রকাশ করে দেখিয়েছিলেন।

সারারাতই অঝোরে বৃষ্টি হলেও বেশ নির্মল রোদ উঠেছিল সকালে। সেই পরিচ্ছন্ন প্রভাতে বেণিয়াকুণ্ড থেকে যাত্রা করবার অল্প কিছুক্ষণ পরেই একটিবার দেখেছিলাম আমাদের বাঁয়ে ও সামনে তরঙ্গায়িত চিরতুষারের সমুদ্র। সম্পূর্ণ হিমালয় নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু কেদারের তুলনায় অনেক বেশী প্রসার দেখা যায় এখান থেকে; স্তর ও শৃঙ্গের সংখ্যাও গণনায় অনেক বেশী।

তবে ওই যাকে বলে ঝাঁপি-দর্শন! না জানি কোন পাণ্ডার অদৃশ্য হস্ত সামনের আবরণখানি সরিয়েই তৎক্ষণাৎ আবার টেনে দিল তা।

তারপরেই আবার বনবাস।

ভুলোকনা চটি পর্যন্ত চলনসই অবস্থাই ছিল। কিন্তু চলতে চলতে এক-সময়ে নিজের চারিদিকে অস্বাভাবিক অন্ধকারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে মেঘের সন্ধানে উপর দিকে তাকিয়ে আকাশের একটি ফালিও দেখতে পেলাম না। চোখে যা পড়ল তা কেবল গাছের ডাল আর পাতা। উভয়েরই কালো রঙ।

আবার দেখি যে সেই প্রায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের বন শুরু হয়েছে। আমাদের দু দিকেই দৈত্যের মত মহীরুহ সব। পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি যে, যে পথে চলেছি তাকে পথ বলে চেনাই যায় না। পচা পাতার দুর্গন্ধময়

কাদ [illegible] পায়ের গোড়ালি [illegible] যেখানে ডুবে যাচ্ছে না, সেখানে বল্লমের ফলার মত উঁচু হয়ে আছে অযত্নাবন্যস্ত সব পাথর।

উতরাই পথ এটি। এতক্ষণ পরে বুঝতে পারলাম যে, গতকাল চড়াই ভেঙে যে পাহাড়ে উঠেছিলাম আজ উতরাই পথে সেই পর্বতশ্রেণী থেকে অবতরণ করছি। কিন্তু তুলনায় অনেক বেশী খাড়া মনে হয় আজকের এই উতরাই পথ। চলতে আজ কষ্ট হচ্ছে বেশী। কারণ আছে বইকি! বেশ ঢালু পথে নীচের দিকে গতি আমার; সে পথ আবার পিচ্ছল। পা পিছলে পড়ে যাবার ভয়ে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে চলতে হচ্ছে বলেই পায়ের পেশীগুলির সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুর উপরেও খুব চাপ পড়ছে।

অনেকক্ষণ পর পথের ধারে বড় একখানি পাথর চোখে পড়ল। শেওলা কিছু জমে আছে তার উপর, তবে বসবার অনুপযুক্ত নয়। দেখে বাহাদুরকে আমি বললাম ওখানে বসে একটু জিরিয়ে নিতে।

কিন্তু অমন সঙ্গত প্রস্তাবও তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করল বাহাদুর। আর রীতিমত উত্তেজিত প্রত্যাখ্যান তা। অত ভারী বোঝা তার পিঠে থাকতেও আমার প্রস্তাব তার কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে সবেগে তার মাথা ও হাত নেড়ে এত উচ্চৈঃস্বরে তার অস্বীকৃতি আমাকে জানিয়ে দিল যে, আমি তো বিস্ময়ে হতবাক। অথচ তার পরেই বাহাদুর আরও জোরে তার পা চালিয়ে দিল।

অগত্যা আমিও তার অনুসরণ করেছিলাম। কিন্তু আরও খানিকটা এগিয়ে যাবার পর বাধা পড়ল।

একটু দূরে সামনের একটি গাছে দেখি একপাল হনুমান। ঠিক পবননন্দনকে মনে করিয়ে দেবার মত না হলেও দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ ওদের অধিকাংশেরই। কালো মুখ। কিন্তু ঘাড়ে গলায় প্রায় সাদা লম্বা লম্বা লোম। একেবারে চুপ করে বসে নেই ওদের কেউ। কি যেন ওরা খাচ্ছে, আর বোধ করি সেই খাদ্যবস্তুর সন্ধানেই মাঝে মাঝে লাফিয়ে যাচ্ছে এক ডাল থেকে আর এক ডালে।

যাত্রী-সড়ক থেকে বেশ একটু দূরে আর অনেকটা নীচে দু-তিনটি মাত্র গাছে চলেছে ওই হনুমানদের লীলা। তবু সভয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। কেদারের পথে দু-একটি কুকুর ও মোষ ছাড়া আর কোন জন্তু-জানোয়ারই তো চোখে পড়ে নি। সুতরাং এই নিবিড় নির্জন বনের মধ্যে হঠাৎ অতগুলি হনুমান দেখে একটু ভয় পাব বইকি!

কিন্তু বাহাদুর দোখ [illegible] ভয়ে
বার দুই তাকে ডাকবার পর সে পিছন ফিরে হাসিমুখে হাত [illegible] দিয়ে ডাকল আমাকে।

আমি এক চোখ ওই হনুমানযূথ ও অপর চোখ পথের উপর রেখে পায়ে পায়ে ওই জায়গাটা পার হয়ে গেলাম।

নিরাপদ দূরত্বে চলে যাবার পর বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করলাম আমি: এই হনুমানের ভয়েই বুঝি তুমি ওখানে বসে বিশ্রাম করতে চাও নি?

অস্বীকার করল বাহাদুর: না বাবুজী।

তবে?

মৎ পুছিয়ে।—বলেই আবার দ্রুতবেগে পা চালিয়ে দিল বাহাদুর।

প্রায় তিন মাইল দূরে পাঙ্গরবাসা চটি। চারিদিকে নিবিড় অরণ্যের মধ্যে আট-দশখানা মাত্র চালাঘর। তারও আবার দু-তিনটি মনে হল পরিত্যক্ত। লোভনীয় বিশ্রামস্থান মোটেই নয়। তথাপি ঘড়িতে প্রায় দুটো বেজেছে দেখে ওখানেই সেদিনের মত বাসা বাঁধবার প্রস্তাব করেছিলাম। কিন্তু শুনেই সবেগে মাথা নেড়ে সে প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করল বাহাদুর।

ক্ষুণ্ণ তত নয়, যত বিস্মিত হলাম আমি। অত বাধ্য বাহাদুর এত অবাধ্য কেন আজ! তার প্রত্যাখ্যানের ধরনটাও বিস্ময়কর। কেমন যেন সন্ত্রস্ত ভাব তার। তখন তার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমি, এখানে রাত কাটাতে তোমার ভয় করে নাকি বাহাদুর?

বিব্রতভাবে স্বীকার করল সে: হ্যাঁ বাবুজী।

কেন? বাঘ-ভালুক আছে এখানে?

না বাবুজী।

তবে কি চোর-ডাকাত?

না বাবুজী।

তবে কিসের ভয় তোর?

মৎ পুছিয়ে।—বলেই বাহাদুর তার বোঝার দিকে এগিয়ে গেল সেটি যথানিয়মে তার পিঠে তুলে নেবার জন্য।

নিবিড় বন নিবিড়তর হয়েছে সামনের পথে অপরাহ্ণবেলায় গভীর অরণ্যের অন্ধকারে স্বতঃই গা ছমছম করে। জিতেন আমার কাছাকাছি নেই বলে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে যে, ওই বনের মধ্যে আমি একেবারে একা।

প [illegible] এসে গেল। হঠাৎ মনে হল যে বাহাদুরের ভয়ের কারণটা আমি বুঝতে পেরেছি।

কেদার-তুঙ্গনাথের দেশ—মর্ত আর স্বর্গের সীমান্ত। ওদেশে হাঁটা-পথে চলতে শুরু করলেই যেন মনের অতল থেকে অবোধ শৈশবের রঙিন প্রত্যাশাগুলি উপরতলায় ভেসে উঠতে থাকে। দেব-দেবী, কিন্নর-কিন্নরী, যক্ষ-যক্ষিণী দেখবার আশায় কতবার আমার চোখ দুটিও তো চঞ্চল হয়েছে। সুঠাম গঠন ও ললিত লাবণ্য দেখবার প্রত্যাশা তা। কিন্তু এখন বোধ করি চারিদিকে ওই ভয়ঙ্কর পরিবেশের প্রভাবেই হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল যে, পার্বতীর সখী ও পরিচারিকারা শাস্ত্রমতে যত সুন্দরীই হোক না কেন, ভোলানাথের পার্শ্বচরেরা অধিকাংশই ভূত ও প্রেত। এই তুঙ্গনাথের রাজ্যে তাদের কোন একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার আশঙ্কাতেই বাহাদুর অত সচল ও সতর্ক হয়েছে নাকি!

ওই বনের পথে তখন আর জিজ্ঞাসা করি নি তাকে। কিন্তু রাত্রিবেলায় ভিন্ন পরিবেশ। বেশ খোলামেলা জায়গায় মণ্ডলচটি। পাকা দ্বিতল বাড়ি সেখানে কালী কমলীওয়ালার ধর্মশালায়। সৌভাগ্যক্রমে চটিওয়ালার ভাণ্ডারও সেখানে পেয়েছিলাম সমৃদ্ধ। পরিপাটি ভোজনের পর দুর্গের মত নিরাপদ ঘরের মধ্যে ভূতের গল্প তেমন ভয়ের কারণ হবে না মনে করে সোজাসুজিই জিজ্ঞাসা করলাম বাহাদুরকে।

শুনেই ভয়ে শিউরে উঠেছিল সে। কিন্তু জিতেনও নানাভাবে তাকে আশ্বাস দেবার পর কেবল মুখই নয়, মন খুলেই উত্তর দিল বাহাদুর।

নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করে সে যে, এই কেদার-বদরীর দেশে সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে অশরীরী প্রেতেরা। কেউ সদাশয়, কেউ ভয়ঙ্কর।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কাউকে দেখেছ তুমি?

নহী বাবুজী। কেদারনাথজীকী কৃপাসে—

বলতে বলতে সারা দেহ যেন কেঁপে উঠল বাহাদুরের। আতঙ্কের সুস্পষ্ট চিহ্ন! কিন্তু দুই চোখের দৃষ্টিতে তার কৃতজ্ঞতাও আছে—কেদারনাথজী যে অমন দুর্ভোগ থেকে তাকে রক্ষা করেছেন সেই জন্য কৃতজ্ঞতা। দুই হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে কেদারনাথজীর উদ্দেশ্যে প্রণামও করল সে।

কিন্তু আমার হাসি পাচ্ছে। সকৌতুক কণ্ঠে আমি বললাম, অত ভয় কেন রে? তুই-ই তো বললি যে ভাল ভূতও আছে।

আছে নিশ্চয়ই। [illegible] ...ঘের মনে। যে মানুষকে দয়া করে তাঁরা দর্শন দেন, বুঝতে হবে যে সংসারে তাঁর দিন ফুরিয়ে এসেছে।

আর যারা খারাপ ভূত?

তারা তখনই মেরে ফেলে বাবুজী—আর খুব কষ্ট দিয়ে মারে।

এমন স্বরে কথাটা বললে বাহাদুর যে, আমার মনে হল বুঝি সেই মুহূর্তে সে নিজেই সেই মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছে।

তথাপি কৌতূহলী জিতেন তাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার সামনে তো কোন ভূতই কোনদিন আসে নি। তবে তুমি কেমন করে জানলে?

আমি জানি বাবুজী।—বিষণ্ণ কণ্ঠে উত্তর দিল বাহাদুর: আমারই এক সঙ্গীকে এক বদমাশ ভূত সেবার মেরে ফেলল—ওই জঙ্গলচটির কিছুটা আগে।

পাঙ্গরবাসাকেই জঙ্গলচটি বলে বাহাদুর। শুনেই বুঝলাম আমি যে, আমার প্রকল্প প্রমাণ হয়ে গেল—ভূতের ভয়েই ওই চটিতে রাত্রিবাস করতে রাজী হয় নি সে, পথে কোথাও বসে দু দণ্ড বিশ্রাম করতেও নয়।

বাহাদুরকে জেরা করে করে শোনা গেল গল্পটা। ব্যাপারটা ঘটেছিল ওই অরণ্যের পথেই। চনচনে রোদ ছিল সেদিন যার জন্য ওই নিবিড় বনের ভিতর দিয়ে চলতে চলতেও গলদঘর্ম সকলেই। দারুণ পিপাসায় কাতর হয়ে পথশ্রান্ত একটি কুলি তার পিঠের বোঝা নামিয়ে রেখে নীচের এক ঝরনার জল খেতে গিয়েছিল। লোকটি দুই অঞ্জলি জল পান করতে না করতেই সেই যে অজ্ঞান হয়ে পড়ল তারপর হাসপাতালে নিয়ে অনেক চিকিৎসা করিয়েও তাকে আর বাঁচানো গেল না—ধনুকের মত বেঁকে গিয়ে মৃত্যু হল তার।

বড় বদমাশ একটি নাকি ভূত আছে ওই বনের মধ্যে। বিশেষ ওই ঝরনাটির ধারে বাসা নিয়ে সেটির উপর তার নিজস্ব স্বত্ব কায়েম করে রেখেছে সে। বাহাদুরের বন্ধু কুলিটি অনধিকার প্রবেশ করে সেই ঝরনার জল খেয়েছিল বলে রেগে গিয়ে ভূতটি চপেটাঘাত করেছিল কুলিটির ঘাড়ে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর আরও একটু বুঝিয়ে বললে বাহাদুর। এ দেশের লোক বা যাত্রীদের ভূত যারা এই পথের ধারে ধারে থাকে তারা কারও তেমন অনিষ্ট করে না। ভয়ঙ্কর আর বদমাশ ভূত হয় মরবার পর ওই যাযাবর পশুপালকেরা। ঠাকুরদেবতা মানে না ওরা; তর্পণ, পিণ্ডদান ইত্যাদি অনুষ্ঠানের ধার দিয়েও যায় না ওই বিধর্মীদের বংশধরেরা। সুতরাং মেয়ে হোক, পুরুষ হোক—ওদের কেউ যদি এই উত্তরাখণ্ডে মারা যায় তবে নির্ঘাৎ সেই জায়গাতেই ভূত হয়ে থাকবে সে এবং অজুহাত ও সুযোগ পেলেই পথচারীর সর্বনাশ করবে।

॥ ১৭ ॥

গল্পের ভূতের ধর্মই ওই—মনে গিয়ে বাসা বাঁধবে সে। বাহাছুরের গল্পের বিশেষ ভূতটিকে পরদিন সকালেও মন থেকে তাড়াতে পারি নি। নিজে তো সে সেখানে জেঁকে বসে আছেই, তার উপর আবার কিছু স্মৃতি ও চিন্তাও জাগিয়ে তুলেছে সে।

গত রাত্রে গল্পটি শুনতে শুনতেই প্রচলিত বিশ্বাসের তাৎপর্য আমি বুঝতে পেরেছিলাম। বেচারা যাযাবর পশুপালক। বাড়িঘর নেই, দেশ নেই। ছাগল-ভেড়া-মোষের পাল নিয়ে অনবরত ঘুরে ঘুরে প্রায় পশুর জীবনই যাপন করে সে। তথাপি মরবার পর ভূত সে হবেই। আর তাও ভয়ঙ্কর খুনে ভূত। এ হেন মনোবৃত্তির উৎস নিশ্চয়ই বিজাতি ও বিধর্মীবিদ্বেষ।

কখন যে আমার চিন্তা সমষ্টি ছেড়ে ব্যষ্টিকে, সম্প্রদায় ছেড়ে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে আশ্রয় করেছে তা রাত্রে বুঝতে পারি নি। কিন্তু পরদিন সকালে যাত্রা শুরু করবার পর বুঝতে পারলাম যে, মৈখণ্ডা থেকে রামপুরের পথে আমার ক্ষণিকের পরিচয় যে ভৈশাল পরিবারের সঙ্গে সেই স্বামী-স্ত্রী সমগ্র যাযাবর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হয়ে যেন আমার কাছে সুবিচার প্রার্থনা করছে। স্মৃতির পটে আমি যেন স্পষ্ট দেখলাম সেই হাসি-হাসি-মুখ নূরওয়ালা যুবকটি ও তার সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে। রায় দিতে একটুও দেরি হল না আমার। বসরাই গোলাপ আর শাণিত খড়্গের সম্মিলিত রূপ দেখেছি যে হাস্যমুখী তরুণীর মুখে, সে যে মৃত্যুর পর শাঁকচুন্নী হয়ে গাছের ডালে ওত পেতে বসে থাকবে নিরীহ যাত্রী বা তার কুলির ঘাড় মটকাবার জন্যে তা আমি কোন মতেই মানতে রাজী নই।

মন আমার যতই ওই রায় দেয় ততই যেন আরও স্পষ্ট দেখি সেই যাযাবরীর মুখ। বুঝি সেইজন্যই চলার পথে আর একখানি সুন্দর মুখ অত বেশী চোখে পড়ল আমার।

সেই বয়সেরই মেয়ে এটিও। তবে অত তীক্ষ্ণ নয়। বরং ঢল-ঢলে এ মেয়েটির মুখখানি, আর ঈষৎ ক্লিষ্ট। মাঝারি আকারের একটি ঘাসের বোঝা তার পিঠে। সেই বোঝার ভারে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে ধীরে ধীরে, একটু যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বিপরীত দিক থেকে হেঁটে আসছে মেয়েটি।

থমকে দাঁড়ালাম আমি। লোভ হল [illegible] কথা বলতে। সে আমার কাছাকাছি আসতেই জিজ্ঞাসা করলাম, ক্যা নাম হ্যায় বেটি ?

সঙ্গে সঙ্গেই দেখি যে মেয়েটির গৌরবর্ণ মুখখানি যেন টকটকে লাল হয়ে উঠল, লজ্জায় নুয়ে পড়ল তার চোখের পাতা দুটি, ঈষৎ সঙ্কুচিত হয়ে আমার পাশ কাটিয়ে পিছনে চলে গেল সে।

কিন্তু পরক্ষণেই আমার কানে এল মিষ্টি মিহি সুরের এক.টি মাত্র কথা—সীতা।

এ তো নাম। তা হলে আমাকে এড়িয়ে গিয়েও আমাকে উপেক্ষা করে নি মেয়েটি—একটু দেরিতে হলেও আমারই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে সে।

তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি যে মেয়েটিও থমকে দাঁড়িয়ে আমারই দিকে চেয়ে আছে—প্রসন্ন চোখ দুটিতে তার কৌতূহলী দৃষ্টি।

দুর্নিবার আকর্ষণ সেই চোখমুখের। সেই টানেই আমিও হাসিমুখে তার কাছে গিয়ে বললাম, বাঃ, বেশ নামটি তো! বাড়ি কোথায় তোমার ?

আর তখনই ঘটল এক অঘটন। চোখ দুটি তার আরও বিস্ফারিত করে হঠাৎ অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল সীতা। পড়ে গেল মাটিতে। তারপর কেবল গোঁ গোঁ আওয়াজ তার কণ্ঠে ; মুখে গাঁজলা উঠছে, সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্থির আক্ষেপ।

চিৎকার করে উঠলাম আমিও। মেয়েটির জন্য যত, নিজের জন্য তার চেয়ে অনেক বেশী উদ্বেগ আমার। অপরিচিত বিদেশী লোক আমি। কে যে কি দুরভিসন্ধি বা অসদাচরণ আরোপ করবে আমার উপর কে জানে!

তবে ভাগ্য ভাল আমার। বাহাদুর আর জিতেন সেদিন চটি থেকেই একটু দেরিতে বেরিয়েছিল বলে আমার পিছনে পিছনে আসছিল তারা। এখন তারা দুজনেই একসঙ্গে ওই জায়গায় এসে উপস্থিত হল। আর সোরগোল শুনে ছুটে এল স্থানীয় কয়েকজন নর-নারীও। সীতার পরিচর্যা করতে করতে তারাই অভয় ও আশ্বাস দিল আমাকে—কোন সন্দেহই করে নি তারা, বিস্মিতও হয় নি। মেয়েটি তাদের চেনা। অমন মূর্ছা প্রায়ই হয় তার যখনই ভূতে পায় তাকে।

ভূত!

[illegible] তাকালাম, তারপর দুজনেই একসঙ্গে বাহাদুরের মুখের দিকে। সে দেখি তার দুই হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়েছে—বোধ করি ভূতনাথ কেদারনাথজীর উদ্দেশ্যে।

কিন্তু নির্বিকার সেই স্থানীয় লোকটি। সে আরও একটু ব্যাখ্যা করে শোনাল আমাকে। সীতার উপর ভর করেছে যার প্রেতাত্মা, সেই ভ্রষ্ট সাধু গড়ুর মহারাজকে সীতার পিতা শম্ভু পাণ্ডা ব্রহ্মশাপে ভস্ম করেছিল।

ঘাবড়াও মৎ বাবুজী।—লোকটি অল্প একটু হেসে আবার আমাকে আশ্বাস দিল: শম্ভুজী খোদহী আ গয়ে।—অঙ্গুলীসঙ্কেতে একজনকে দেখিয়েও দিল সে।

নাম শুনেই আমার মনের অতলে একটি আলোড়ন শুরু হয়েছিল। লোকটিকে দূর থেকে দেখার পর একটি বিস্মৃতপ্রায় অভিজ্ঞতা হঠাৎ যেন স্মৃতির পটে আকার ধরে ফুটে উঠল। তিনি কাছে আসবার পর সব সন্দেহের নিরসন।

ইনিই সেই শম্ভু পাণ্ডা—দেবপ্রয়াগের ঘাটে যিনি তাঁর ভ্রূকুটির একটি কশাঘাতেই তাঁর নিজের অসাধারণত্ব সম্বন্ধে আমাকে সচেতন করে তুলে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাও জাগাতে পেরেছিলেন আমার মনে।

আভাসও তো দিয়েছিলেন তিনি যে, গোপেশ্বরের পথে তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখাও হয়ে যেতে পারে।

ঘটনার আশ্চর্য মিল রয়েছে তাঁর গণনার সঙ্গে। কিন্তু কি শোচনীয় দুর্ঘটনা তার উপলক্ষ! লজ্জায় সঙ্কোচে ভাল করে তাকাতেই পারি নে শম্ভুজীর মুখের দিকে।

ব্যাখ্যাটা মানেন শম্ভুজী। কিন্তু যে কৃতিত্ব তাঁর উপর আরোপ করা হয়েছে তাকে তিনি মনে করেন অভিযোগ। খ্যাতিই হয়েছে তাঁর জীবনের এক বিড়ম্বনা। বিশ্বাস কর বাবু।—শম্ভুজী আমাকে বললেন: অভিশাপ তাকে আমি দিই নি। শুধু বলেছিলাম এই গাঁ ছেড়ে চলে যেতে।

থেমে থেমে সম্পূর্ণ কাহিনীই আমাকে শোনালেন শম্ভুজী। দেবপ্রয়াগে তাঁর যে কথাগুলি আমার মনে হয়েছিল দুর্বোধ্য, সেগুলির অর্থ বুঝলাম এতদিন পর।

চেলা গড়ুরকে প্রায় [illegible] ...টের একখানা কুঁড়েঘরে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল। কিন্তু গাঁয়ের লোকেরা ফেলতে পারে নি তাকে। বছর কুড়ি বয়সের সুঠাম সুদর্শন যুবক সেই গড়ুর গাড়োয়াল জেলারই লোক। সন্ন্যাসের পথে নতুন যাত্রী। মাথায় জটা হবে কি, চুলই মোটে বড় হয় নি। বৈরাগ্যের যা কিছু নিদর্শন তা কেবল তার কটিতে কৌপীন ও অঙ্গের ভস্মরাগে। এ হেন লোকটিকে প্রবল জ্বরে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকেরাই তার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ভার নিয়েছিল। খবর পেয়ে পাশের গ্রাম থেকে এসেছিলেন শম্ভুজীও।

একদিকে দেবপ্রয়াগ ও একদিকে বদরীনাথ। প্রায় দুই সীমান্তের দুই তীর্থে জাত-ব্যবসায়ের তাল সামলিয়েও নিজের সংসার ও পৈতৃক সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাঝে মাঝে গ্রামের বাড়িতে আসতে হয় শম্ভুজীকে। সেবারও তিনি বাড়িতে এসেছিলেন তাঁর নিজের গরজেই। কিন্তু জড়িয়ে পড়লেন গড়ুরের ব্যাপারটির সঙ্গে। পরিত্যক্ত রুগ্ন সাধুর সেবা-পরিচর্যা আরম্ভ করবার পর তাঁর উৎসাহই যেন সবচেয়ে বেশী।

শুধু রোগীর সেবাই নয়, ওটি সাধুসেবাও—গৃহীর পক্ষে মহা পুণ্যের কাজ। খবর পেয়ে অনেক কুলবধূও ছুটে এসেছিল—শম্ভুজীর স্ত্রী যশোদা এবং কন্যা সীতাও।

দায়সারা কাজ নয়, আন্তরিক সেবা। দু-এক দিন নয়, প্রায় এক মাস। রোগ সারবার পরেও রোগী নিশ্চিন্ত আরামে কয়েকদিন ওখানে বিশ্রাম করেছে। ততদিনে গাঁয়ের লোকের সঙ্গে কত কথাবার্তা হয়েছে তার, কত ছোঁয়াছুঁয়ি, কিছু ব্যঙ্গকৌতুকও। তা আবার একদিন হয়েছিল সীতাকে উপলক্ষ করেই।

অল্প বয়সেই একবার মারাত্মক জ্বরে পড়েছিল সীতা। তার পর থেকে একটি পা তার খোঁড়া হয়ে আছে। খোঁড়া পাখানির জন্য অনেকের কাছে অনুকম্পা পেত সীতা, সখীদের কাছে মাঝে মাঝে একটু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও।

একদিন গড়ুরের কুটিরে সীতার ওই খোঁড়া পায়ের প্রসঙ্গ উঠবার পর অনুকম্পা ও বিদ্রূপ মিশে এক হয়ে গেল।

বেশী বয়সের একটি নারী বলেছিল গড়ুরকে: সীতার খোঁড়া পাখানি তুমি সারিয়ে দিতে পার না, সাধুজী?

[illegible] উঠেছিল : সারিয়ে দাও সাধুবাবা—সীতাদিকে ভাল করে দাও তুমি।

শুনে গড়ুর সীতার পায়ের অস্বাভাবিক রকমের সরু জায়গাটাতে হাত বুলিয়ে দেখবার চেষ্টা করতেই কিশোরী সীতা অনেকটা দূরে সরে গিয়ে ভ্রূভঙ্গি করে বলেছিল, নিজের জ্বর যে সারাতে পারে না সে আবার—

শুনে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল ছোটদের সঙ্গে সঙ্গে বেশী বয়সের নারীটিও। গড়ুর হয়েছিল অপ্রতিভ।

অন্য ধরনের কথাও হয়েছে। যশোদা তাঁর কঠোরপ্রকৃতি শাস্ত্রজ্ঞ স্বামীর ধমক উপেক্ষা করেও জেরা করে বের করতে চেষ্টা করেছেন নবীন সন্ন্যাসীর পূর্বাশ্রমের খবর।

এমনি ভাবে ধীরে ধীরে গ্রামের সকলের সঙ্গে বেশ একটু অন্তরঙ্গ সম্বন্ধই গড়ে উঠেছিল গড়ুরের। সুতরাং সেরে উঠবার পর কেদার পর্যন্ত গিয়েও তার দীক্ষাগুরু সন্ন্যাসীকে খুঁজে না পেয়ে গড়ুর যখন বিমর্ষমুখে আবার ওই মণ্ডল চটিতেই ফিরে এল তখন গাঁয়ের লোকে আবার সমাদর করেই গ্রহণ করেছিল তাকে। স্থানীয় মন্দিরে তার বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল তারা।

আর এক দফায় বাড়িতে এসে তাই দেখে শম্ভুজীও খুশী।

মন্দিরের সামনে সদর রাস্তার ধারে দিনের বেলায় আসন পেতে বসত গড়ুর মহারাজ। তবে যাত্রীর চলাচল যেদিন কম থাকত, প্রণামী যেদিন পরিমাণে বেশী পড়ত না তার সামনে, সেদিন সে উপরে বা নীচে কোন গাঁয়ে চলে যেত গৃহস্থদের বাড়িতে বাড়িতে ভিক্ষা করতে। যেত শম্ভুজীর বাড়িতেও।

সেই গড়ুরজী—

বলতে বলতে থেমে গেলেন শম্ভুজী। উত্তেজনায় যেন লাল হয়ে উঠল তাঁর মুখমণ্ডল। দূরের পাহাড়টির দিকে কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে থাকবার পর ফিরে আমার মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, সেই গড়ুর একদিন বেশ বড় একটি ঘাসের বোঝা পিঠে নিয়ে সীতার পিছনে পিছনে আমাদের এই উঠোনে এসে উপস্থিত হল।

কেন?—সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

উত্তরে শম্ভুজী বললেন, সেই প্রশ্ন তো তখন আমারও মনে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম গড়ুরকে। সে হেসে উত্তর দিল যে অত ভারী বোঝা নিয়ে

চড়াই ভেঙে উঠতে সীতার কষ্ট হচ্ছিল বুকে [illegible] সীতার পিঠ থেকে নিজেই টেনে নিয়েছে সে।

দৃশ্যটি মনে মনে কল্পনা করে স্মিতমুখে আমি বললাম, বাঃ! বেশ তো।

বোধ করি এমন একটি উত্তরের প্রত্যাশা ছিল না শম্ভুজীর মনে। তিনি বিব্রতের মত কয়েক সেকেণ্ড আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে গাঢ়স্বরে বললেন, কিন্তু বাবু, সবাই তোমার মত ভাববে কেন? বাজারের চটিওয়ালারা, আমার প্রতিবেশীরা যারা ও দৃশ্য দেখেছিল তাদের সকলের চোখে ভাল লাগে নি ব্যাপারটা। হাসাহাসিও কিছু হয়েছিল ওই কথা নিয়ে।

একটু থেমে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে তিনি আবার বললেন, পরকে কি দোষ দেব বাবু! আমার নিজের স্ত্রীও তো তাই ভেবেছিলেন।

ছিঃ!—সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় গর্জন করে উঠলেন যশোদা। মেয়ের শয্যা ছেড়ে উঠে এসে স্বামীকে ধমক দিলেন তিনি: কি যা-তা তুমি বলছ পরদেশী যাত্রীর কাছে?

তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, আমি, বাবুজী, শুধু বলেছিলাম যে, মায়া যখন একটু পড়েছে দেখা যাচ্ছে, তখন বেশ হত ওই গড্ডুরের সঙ্গে সীতার বিয়ে দিতে পারলে।

আমার কল্পনা তো উদ্দীপ্ত হয়েই ছিল, আমি তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে বললাম: ঠিকই তো। আমিও তো তাই ভাবছিলাম।

সহানুভূতির স্পর্শে যশোদার মনে অবরুদ্ধ আবেগ উদ্বেলিত হয়ে উঠল যেন। আঁচল দিয়ে চোখের কোণ মুছে গাঢ়স্বরে তিনি বললেন, কত সহজে, বাবুজী, তুমি বুঝলে কথাটা। আর উনি? শুনে কি বলেছিলেন, জান?

আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করলেন না তিনি। স্বামীর দিকে একটি জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করবার পর আবার আমার মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, উনি বললেন যে, যে মেয়ের নাম সীতা, সে কেন উর্বশী হবে!

চমকে উঠলাম আমি! একটি মধুর স্বপ্নের মাঝখানে হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু জেগে তো উঠেছি পরিচিত জগতেই! তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল আমার—দেবপ্রয়াগে এই শম্ভুজীর যে কঠোর রূপ দেখবার পর কঠিন পরিচয় পেয়েছিলাম। সচকিতে শম্ভুজীর মুখের দিকে চেয়ে দেখি, পাথরের

মত [illegible] ঘাটে যেমন দেখেছিলাম তাকে আমার দেওয়া দক্ষিণা প্রত্যাখ্যান করবার পর।

আমি তাঁর দিকে চেয়েছি দেখেই তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করে স্ত্রীর অভিযোগ স্বীকার করলেন শম্ভুজী। মুখেও তিনি বললেন, হ্যাঁ বাবু, নিশ্চয়ই বলেছিলাম ও কথা। এখনও তাই বলি আমি।

মৃদু, কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠস্বর তাঁর। দুই চোখে কেমন যেন স্বপ্নের আবেশ—তাঁর দৃষ্টি বুঝি বর্তমান ছেড়ে সুদূর অতীতে চলে গিয়েছে।

কিন্তু পরক্ষণেই সেই চোখ দুটিই ধকধক করে জ্বলে উঠল যেন। দৃপ্তভঙ্গিতে মাথা তুলে ক্রুদ্ধকণ্ঠে তিনি আবার বললেন, আমি জানি বাবু, আমার সীতার কোন দোষ ছিল না। মূল দোষ আমার পুত্রের—কুলাঙ্গার, চণ্ডাল সে।

সে পশ্চাৎ-পটও উদ্‌ঘাটিত হল। থেমে থেমে, কখনও উত্তেজিত, কখনও করুণ স্বরে সে কাহিনীও আমাকে শোনালেন শম্ভুজী।

তাঁর সব আশায় ছাই দিয়েছে পুত্র অযোধ্যানাথ। কি কুক্ষণেই যে তাকে চামৌলির ইংরেজী স্কুলে পড়তে দিয়েছিলেন—কন্যা সীতার একেবারে বিপরীত হয়েছে সে। কি বিদ্যা যে সে অর্জন করছে, তা জানেন না শম্ভুজী। তবে তার অবিদ্যার সম্ভার নিজের চোখেই দেখেছেন তিনি। ব্রাহ্মণোচিত আচার-আচরণ একেবারে নেই অযোধ্যানাথের। দেবদ্বিজে ভক্তি লোপ পেয়েছে তার, ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক পর্যন্ত করে না সে। পিতাকে সে সাফ বলে দিয়েছে যে, যাজনের কাজ সে কিছুতেই করবে না। সংসারের আর কোন কাজেও লাগে না সে। চাষ-আবাদের কাজ করবে কি, ক্ষেত বা গোয়ালের ধার দিয়েও যায় না অযোধ্যানাথ। বোর্ডিং থেকে বাড়িতে যখন সে আসে তখন বিজাতীয় সজ্জায় সেজে চোখে চশমা লাগিয়ে কব্জিতে হাত-ঘড়ি বেঁধে কেবল গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়িয়ে বেড়ায় সে।

সেই অযোধ্যানাথ একদিন গড্ডুরকে ভিক্ষা করতে দেখে তাঁদেরই বাড়ির উঠোনে স্বয়ং শম্ভুজীর চোখের সামনে দাঁড়িয়েই গড্ডুরকে বলেছিল, শরীরটা তো সাধুবাবা, দেখছি খুব শক্তই আছে তোমার। তবে ভিক্ষা কর কেন তুমি? খেটে খেতে পার না?

শম্ভুজীর মত সীতার কানেও গিয়েছিল সে কথা। তোতাপাখীর মত

সীতা আবার সেই কথাসহ [illegible] দের ক্ষেতে কাজ করতে যাবার পথে মন্দিরের সামনে গড়ুড়ের ঠিক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

চরম দুর্ঘটনাটি ঘটে যাবার পরে সীতাকে জেরা করতে করতে তার মুখেই শম্ভুজী শুনেছিলেন তার স্বীকারোক্তি, শুনেছিলেন তখন গড়ুর যে উত্তর দিয়েছিল তাও।

ভাইয়া তো তোমাকে ঠিক কথাই বলেছে, সাধুজী। তুমি ভিক্ষা না করে কাজকর্ম কর না কেন?

কাজ আমাকে দেবে কে?

কেন, আমিই দিতে পারি। চল না আমাদের ক্ষেতে ঘাস কাটতে।

মজুরি কি দেবে?

মজুরি আবার কি! খেতে দেব পেট ভরে।

এমনি আরও সব কথা হয়েছে দুজনের মধ্যে, কথামত কাজও হয়েছে কিছু কিছু। দোষের কিছু নয়, তা শম্ভুজী নিঃসংশয়ে বুঝেছিলেন সীতার মুখের ভাব দেখে। পিতার প্রশ্নের উত্তর দিতে দু-একবার লাল হয়ে উঠেছে সীতার মুখখানি, কিন্তু কালো হয় নি একবারও।

সেদিন তো সীতা হেসে কুটিকুটি। মাঝখানের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানবার পূর্বেই শম্ভুজী যেদিন গড়ুরকে দেখেছিলেন ঘাসের বোঝা পিঠে নিয়ে সীতার পিছনে পিছনে তাঁদেরই বাড়ির প্রাঙ্গণে এসে উঠতে।

নির্মল হাসিই শম্ভুজী দেখেছিলেন গড়ুরের মুখেও, কিন্তু পরে প্রতিবেশীদের মুখে যে হাসি তিনি দেখলেন তার প্রকৃতি স্বতন্ত্র—গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয় তা। আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল মনের বিরক্তি স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করবার পর উত্তরে যশোদার মুখের কথায়।

কঠোরপ্রকৃতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরদিনই গড়ুরকে একান্তে ডেকে নিয়ে কর্তৃত্বের কঠিন কণ্ঠে তাকে আদেশ করেছিলেন অবিলম্বে মণ্ডল চটির এলাকা ছেড়ে যেতে।

বিশ্বাস কর বাবুজী,—শম্ভুজী সনির্বন্ধকণ্ঠে আমাকে বললেন: সেদিন উপবীত আমি স্পর্শও করি নি। শুধু মুখে বলেছিলাম তাকে যে, ত্রিরাত্রি পূর্ণ হবার পূর্বেই সে যদি এ গ্রাম ছেড়ে না যায় তবে ব্রহ্মশাপ লাগবে তার উপর।

তা[illegible] সেই মর্মান্তিক ঘটনাটি।

স্বপ্নের মত মনে পড়ে শম্ভুজীর। আর তখনও স্বপ্নই মনে হয়েছিল তাঁর। অন্ধকার ঘরের মধ্যে বিছানায় শুয়েই শুনেছিলেন তিনি সংক্ষিপ্ত কথাবার্তাটুকু।

তোমার বাবা আমাকে এ এলাকা একেবারে ছেড়ে যেতে বলেছেন।— যেন গড়ুড়ের কণ্ঠস্বর।

উত্তরে যেন সীতা বললে, তবে চলেই যাও তুমি। আমার বাবা যে রকম রাগী মানুষ, হয়তো সত্যিই শাপ দিয়ে বসবেন।

-তবে তুমিও চল আমার সঙ্গে।

না, ছিঃ! বিয়ে না হলে কি সঙ্গে যাওয়া যায়?

তবে চলি আমি—ভোর হয়ে এল।

তারপর ভিজে ঘাসের উপর দিয়ে পায়ে-চলার ছপছপ শব্দ যেন। কিন্তু একটু পরেই ছোট্ট তীক্ষ্ণ আর্তনাদ—ওঃ!

কি হল?—সীতার গলা।

সংক্ষিপ্ত উত্তর গড়ুড়ের ক্লিষ্ট কণ্ঠে: সাপে কাটল বুঝি।

নিদ্রা ও জাগরণের মধ্যবর্তী অবস্থা তখন শম্ভুজীর। গা-মোড়া দিয়েছিলেন তিনি। আর সেই মুহূর্তেই সম্পূর্ণ ঘুম ভেঙে গেল তাঁর।

সাপ, সাপ—

এবার আর অস্ফুট নয়, স্পষ্ট সীতার কণ্ঠস্বর। কথা নয়, আর্তনাদ! শয্যা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন শম্ভুজী। ছুটে গিয়ে উষার অস্পষ্ট আলোকে দেখেন যে, ঘরের পিছন দিকে সবজী-বাগানের আলের উপর পড়ে ছটফট করছে সীতা, গোঁ গোঁ আওয়াজ তার কণ্ঠে, মুখে গাঁজলা উঠছে, প্রতি অঙ্গে আক্ষেপ—সেই দিনই আমরা যেমন দেখেছি, প্রায় তেমনি।

সাপে কেটেছে, সাপে কেটেছে সীতাকে,—চীৎকার করে বলেছিলেন শম্ভুজী। শুনে বাড়ির যশোদা ও প্রতিবেশী যারা ছুটে এল তাদেরও সেই সন্দেহ। সোরগাল, হৈ হৈ, কান্নাকাটি।

কিন্তু না। ঘণ্টাখানেক পরে জ্ঞান ফিরে এল সীতার। তখনও খুব দুর্বল সে। কিন্তু বিষক্রিয়ার কোন লক্ষণই নেই তার দেহে।

সে সব স্পষ্ট দেখা গিয়েছিল সেই দিনই তাঁদের বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে নীচে যাত্রী-সড়কের উপর নবীন সন্ন্যাসী গড়ুর মহারাজের মৃতদেহ।

ঠিক ওই জায়গাটাতেই, [illegible] কাহিনী শেষ করলেন : আজ যেখানে সীতা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল সেখানেই পাওয়া গিয়েছিল গড্ডুরের লাশ। ওই ঘটনার পর থেকেই, বাবু, প্রায়ই এমন মূর্ছা হয় সীতার—আর বেশী করে ঠিক ওই জায়গাটাতেই।

একটু থেমে স্বপ্নাবিষ্টের মত মৃদুস্বরে শম্ভুজী আবার বললেন, কারণ আছে বইকি! আসক্তি তো ছিলই গড্ডুর মহারাজের, তার উপর অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে তার। আত্মার তো সদ্গতি হয় নি। অতৃপ্ত কামনা নিয়ে সেই প্রেতাত্মা এখনও বিচরণ করে—সুযোগ পেলেই ভর করে এসে সীতার উপর।

যন্ত্রচালিতের মতই সবেগে মাথা নেড়ে অস্বীকার করলাম আমি—যুক্তিবাদী মন আমার এমন ব্যাখ্যা মানতে চায় না। যন্ত্রচালিতের মতই আমার চোখ দুটি গিয়ে পড়ল সীতার মুখের উপর। মূর্ছা ভাঙবার পর ঘুমিয়ে পড়েছে সে। হাত-পা সবই কম্বল দিয়ে ঢাকা। কিন্তু সম্পূর্ণ মুখখানিই দেখা যায়। এখন অবসাদে ঈষৎ বিবর্ণ তা। তবু অপূর্ব সুন্দর। একটি যেন প্রস্ফুটিত স্থলপদ্ম—সারাদিন রোদে পুড়ে এলিয়ে পড়েছে।

আমি ফিরে শম্ভুজীর মুখের দিকে চেয়ে বললাম, ওর বিয়ে দেন না কেন ঠাকুরমশায়?

বিয়ে!

এমনভাবে কথাটা বললেন শম্ভুজী যেন প্রচণ্ড একটি ধাক্কা খেয়ে হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছেন তিনি। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি সশব্দে হেসে উঠলেন।

উদ্‌ভ্রান্তের মত হাসতে হাসতে তিনি বললেন, কে ওকে বিয়ে করবে, বাবু? এই পাহাড়ের দেশে শক্ত মেহনত করতে না পারলে মেয়ের আদর হয় না। সীতা আমার খোঁড়া বলেই তো সময়মত ওর বিয়ে হয় নি। তার উপর এল এই কলঙ্ক। আর কি বিয়ে হয় ও মেয়ের!

সেদিন আর এগিয়ে যেতে পারি নি, পিছিয়ে গিয়ে রাত্রিবাস করেছিলাম আবার ওই মণ্ডল চটিতেই। সারা দিনটা কেটেছে শম্ভু পাণ্ডার বাড়িতে।

চরণ দুটি আমার বিশ্রাম পেয়েছে নিশ্চয়ই। সেদিন একবেলাও রাঁধতে হয় নি বলে হাত দুটিও। কিন্তু মন? সে যেন সারাটা দিন ক্রমাগতই দোল খেয়েছে সুখ-দুঃখের নাগরদোলায়। ফুলের মত নিষ্পাপ কুমারী মেয়ে সীতার দৈহিক দুর্ভোগ প্রত্যক্ষ করবার পর তার বাপ-মায়ের মুখে তার ব্যর্থ-জীবনের কাহিনী মোটামুটি শোনবার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া ওটি। এর চেয়ে চড়াই-উতরাই ভাঙাও বুঝি ভাল—তাতে দেহই ক্লান্ত হয়, মন অস্থির হয় না।

বোঝার ওপর বোঝা। ভাবানুষঙ্গে সে কাহিনীও মনে পড়ে যায়—পুরাতন দুঃখও আবার নতুন হয়ে মনে জেগে ওঠে।

সেদিনও দুঃখ পেয়েছিলাম। একদিন কেন, পর পর দুদিন। প্রথমে বরাসু ও পরে রামপুর চটিতে গঙ্গোত্রীর নষ্টনীড় আর দীর্ঘনিঃশ্বাসের কাহিনী শোনবার পর।

গঙ্গোত্রী আর সীতা, সীতা আর গঙ্গোত্রী। রাত্রে শুয়েও পর্যায়ক্রমে দুটি মেয়েকেই ঠিক যেন চোখের সামনে দেখি। দুটি জীবনের একই জাতের ব্যর্থতা এক অদৃশ্য তুলাদণ্ডের দুদিকে চাপিয়ে তুলনা করতে থাকি। ভারী দেখি সীতার দুঃখের দিকটা; আর অনুকম্পায় সেই দিকেই বেশী ঝুঁকে পড়ে আমার মন।

দুঃখিনী গঙ্গোত্রীও। তবু সীতার দুঃখের সঙ্গে তুলনা হয় না তাঁর দুঃখের। শিক্ষিত মনের অসাধারণ শক্তিবলে গঙ্গোত্রী নিজেই তাঁর দুঃখকে জয় করে ইদানীং প্রায় নিরাসক্তভাবে তাকে বিশ্লেষণ করতে পারেন। কিন্তু সীতা গঙ্গোত্রী নয়; সীতার দুঃখের প্রকৃতিও স্বতন্ত্র। ভালবাসার কুঁড়ি তার হৃদয়ে ফুল হয়ে ফোটবার আগেই সাপ হয়ে দংশন করেছে তাকে। নিরক্ষরা সরলা পল্লীবালা এখন বোবা পশুর মত ছটফট করছে সেই বিষের জ্বালায়। কেউ নেই তাকে একটু সাহায্য করবার।

খোঁড়া মেয়ের বিয়ে যদি নাও হয়, চিকিৎসা হতে তো কোন বাধা নেই। কিন্তু তাও হয় নি, হবেও না।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম এক ফাঁকে সীতার জননী যশোদাকে। কিন্তু শুনেই

হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন ওরা। [illegible] তা কি করাবেন উনি! জন্মদাতা পিতা হলে কি হবে—মানুষটির বুকখানা যে ভগবান পাথর দিয়ে গড়ে দিয়েছেন।

দিল্লী-লক্ষ্ণৌ না হয় বহুদূরের দেশ। মাত্র মাইল দশেক দূরেই চামৌলিতে যে সরকারী হাসপাতাল আছে, চিকিৎসার জন্য সীতাকে সেখানেও একবার নিয়ে যান নি শম্ভুজী।

মিথ্যা বলেন নি যশোদা—হৃদয়খানি শম্ভুজীর বোধ করি পাষাণ দিয়েই গড়া! কিন্তু এ কেমন পাষাণ!

বৈকালে চটিতে ফিরে যাবার পূর্বে আমিও একবার শম্ভুজীকে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু উত্তরে বিষণ্ণকণ্ঠে তিনি বললেন, ডাক্তার কি করবে বাবু? স্বকৃতকর্মের দুর্ভোগ থেকে ডাক্তার-বৈদ্য কি কাউকে রক্ষা করতে পারে!

উত্তরে ডাক্তার ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা চলত। কিন্তু সে সব যুক্তি মুখে দূরে থাক, মনেও এল না আমার। বিরক্ত হয়েই আমি বললাম, ওই কচি মেয়ে আপনার কি এমন দোষ করেছে ঠাকুরমশায় যার জন্য এমন দুর্ভোগ তাকে ভুগতে হবে!

শুনে কিন্তু হাসলেন শম্ভুজী। আমার মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, তোমরা এসব কথা মানবে না, কিন্তু আমরা মানি। কোন্ জন্মের কোন্ কৃতকর্মের ফল মানুষ এ জন্মে ভোগ করে তা কি সঠিক জানা যায়? তবে সীতার বেলায় এ জন্মের দোষও একটু আছে বইকি! যে আশা কিছুতেই মেটবার নয়, তেমন আশা করাও একটা দোষ, বাবু। সে দোষ করলেও মানুষকে সাজা পেতে হয়।

এমন যুক্তি মানতে পারি নে আমি। সুতরাং আরও বেশী বিরক্ত হয়ে তিক্তকণ্ঠে আমি বললাম, অভিশাপ দেবার একটা যে অভিযোগ আছে আপনার বিরুদ্ধে তা হলে তা একেবারে মিথ্যা নয়। মনে মনে ওদের দুজনেরই শাস্তি আপনি কামনা করেছিলেন।

আশ্চর্য! এবার ঘাড় কাত করে স্বীকার করলেন শম্ভুজী। কিন্তু তারপর সোজা আমার চোখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, আমার সে কৃতকর্মের ফল আমিও কি ভোগ করছি নে? সেদিন গড়ুরকে কেটেছিল যে সাপ, সে আমাকেও রেহাই দেয় নি। কোন মানুষের চোখ যেখানে

[illegible] ছোবল মেরেছিল সে।
তারপর থেকেই বিষের জ্বালায় আমিও নিরন্তর জ্বলে মরছি।

ভুলতে পারি নি ওই কথাগুলি, ভুলতে পারি নি শম্ভুজীকে।

পরদিন বদরীনাথের পথে আমার সহযাত্রী হতে পারেন নি তিনি—শুধু আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, একদিন পরে যাত্রা করেও আমাদের আগেই বদরীধামে উপস্থিত হয়ে সেখানে যথাসময়ে তিনিই আমাদের তীর্থকৃত্য করাবেন। তথাপি একাকী পথে চলতে চলতে সেদিন সীতার পাশে পাশে শম্ভুজীকেও আমি যেন থেকে থেকেই প্রত্যক্ষ দেখছিলাম।

বিশাল এক মহীরুহ যেন বজ্রাঘাতে দগ্ধ হয়েও খাড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে।

গীতার অর্থে নির্মম ও নিরহঙ্কার ব্রাহ্মণ। তথাপি স্থিতপ্রজ্ঞ হতে পারেন নি তিনি। বিচারক হয়ে মেয়েকে সাজা দেবার পর মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও জ্বলে মরছেন।

অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলছিলাম। হাঁটাপথে এই প্রথম আমার পরিবেশ সম্বন্ধে উদাসীন আমি। এমন কি আগের দিন যে জায়গায় সীতাকে নিয়ে অমন অঘটন ঘটেছিল, সে জায়গাটাও কখন যে পার হয়ে গিয়েছি তা আমার খেয়ালই হয় নি। বুঝি ঘণ্টাখানেক পর প্রথম থমকে দাঁড়ালাম উত্তেজিত ছোট একটি জনতার সম্মুখীন হয়ে।

অর্ধবৃত্তের আকারে চলার পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দাঁড়িয়েছে স্থানীয় কয়েকজন লোক। জনতাব্যূহের অভ্যন্তরে প্রায় কেন্দ্রস্থলে মূর্তিমান বীররসের মত দণ্ডায়মান যে নায়ক, সে দেখি আমাদের জিতেন।

হাতের লাঠির সাহায্যে এইমাত্র একটি সাপকে বধ করেছে সে।

তেমন দীর্ঘ নয় সরীসৃপটি—বড় জোর গজখানেক। তবু নাকি ফণা তুলে ফোঁস করে উঠেছিল সেটি, আর চলার পথে জিতেনের প্রায় পায়ের কাছেই। স্থানীয় যে যুবকটি জিতেনের সঙ্গে সঙ্গেই আসছিল সে সাপটির মারমূর্তি দেখেই সভয়ে ও সরবে জিতেনকে পিছন দিকে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু ততক্ষণে জিতেনের পায়ের রক্তও তার মাথায় উঠে গিয়েছে। সেই যুবকটির মুখেই এখন শুনলাম আমি যে, তার শক্ত মুঠোর ভিতর থেকে নিজের হাতখানি ছাড়িয়ে নিয়ে জিতেন তৎক্ষণাৎ লড়াই শুরু করে দিয়েছিল সাপটির সঙ্গে।

কিন্তু লড়াই শব্দটাতে ঘোরতর আপত্তি জিতেনের—অতটুকু এক সাপের সঙ্গে তার মত লোক লড়াই করবে কি!

ওই একবারই যা ফোঁস করে উঠেছিল সাপটা,—জিতেন আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে : তার পরেই, আমি ওকে কিছু করবার আগেই, ফণা নামিয়ে পালাবার চেষ্টা বেটার। তখন হাতের লাঠি দিয়ে দিলাম দু ঘা বসিয়ে। তৃতীয় বার আঘাত করবার আর দরকারই হল না।

অসম্ভব নয়—যা সরু আর ছোট দেহ সাপটার। সেই জন্যই তাকে আর একবার দেখে নিয়ে আমি ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বললাম, তা হলে মারলে কেন ওকে? তীর্থের পথে—

মুখের কথাটা শেষ করতেও পারলাম না আমি। জিতেন তার হাতের লাঠিখানা সশব্দে মাটিতে ঠুকে প্রায় গর্জন করে বলে উঠল : মারব না? কে জানে এই সাপটাই ছোবল মেরেছিল কি না সেই গড্ডুর না কি মহারাজকে। তা না হলেও ওটা অমনি আরও কাউকে কেটে আর কোন সীতার সর্বনাশ তো করতে পারত।

চমকে উঠলাম আমি—কাল তো এমন উত্তেজিত দেখি নি জিতেনকে! ভাবতেই পারি নি আমি যে কিশোরী সীতার জীবনের নিদারুণ বিড়ম্বনার কাহিনী আমার অগোচরে জিতেনের পৌরুষকে এত বেশী উত্তেজিত করে রেখেছে। এখন নিঃসংশয় হবার পর খুশীও হলাম আমি। দু পা এগিয়ে গিয়ে জিতেনের পিঠ চাপড়ে বললাম, ঠিকই করেছ তুমি—বেশ করেছ।

হাঁ বাবুজী,—ভিড়ের ভিতর থেকে কে যেন সায় দিয়ে বললে : অচ্ছা কিয়া বাবুজীনে। সাপ জরুর বিষৈলা থা।

ওটুকু উত্তেজনায় উপকারই হল আমার। নিজের পরিবেশ সম্বন্ধে আমি সচেতন হয়ে উঠলাম।

দেখি যে খুব খাড়া না হলেও চড়াই ভেঙে উপরে উঠছি।

এও পাহাড়ে চড়া। তবে অন্য একটি পাহাড় এবং তা একেবারে ভিন্ন জাতের। আর একটি অতিকায় কাছিমের পিঠ যেন। কিন্তু তুঙ্গনাথের পথে যে বন পার হয়ে এসেছি তার চিহ্নও নেই এই পাহাড়টির উপর। গাছ যা আছে তা চোখে পড়বার মত নয়। চোখে পড়ে না পাথরও। বরং আমাদের যে দিকে খদ সেই ডান দিকে দেখি অনেক দূর পর্যন্ত ঢালু জমির উপর আমাদের দেশের মতই ক্ষেতখামার। পাকা ধান কেটে কেটে গোছা বেঁধে রাখছে মেয়ে-পুরুষ চাষীরা। ধানক্ষেতের ফাঁকে ফাঁকে লাউ-কুমড়োর ক্ষেত,

আর বুঝি কোন [illegible]। পা দুটিতে চড়াই ভাঙবার ক্লান্তি না থাকলে বোধ করি মনেই হত না যে খাস হিমালয়ের এলাকাতেই আর একটি পাহাড় অতিক্রম করছি আমি।

তবে তা বেশ বোঝা যায় যখন চোখের দৃষ্টি ডান দিকের ক্ষেত-খামার এবং তারপর বালখিল্য গঙ্গার অদৃশ্য ধারা পার হয়ে ওপারে চলে যায়। সেখানে নদীর ধারে ধারে এক সারি পাহাড়, কিন্তু সব কটিই ভাঙা।

নেড়া পাহাড়, লালচে রঙ, ভেঙে গিয়েছে বলেই দেখতে আরও রুক্ষ। বেণিয়াকুণ্ড চটিতে প্রবেশ করবার পূর্বে এমনি একটি পাহাড়ের গায়ে যে স্বাভাবিক দেয়ালচিত্র দেখেছিলাম তার আভাসও নেই এদের কোনটির কোন একখানি প্রস্তরফলকেও। সংহার ও সৃষ্টির বিচিত্র সমন্বয় এখানে নেই। ভূতনাথ নন, কেবল ভূতেরাই বুঝি নিছক ভাঙবার জন্যই ভেঙেছে এই পাহাড়গুলিকে।

বিস্মিত হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলাম বাহাদুরকে। সে নির্বিকার ভাবে উত্তর দিল: প্রবল বৃষ্টিতে ধসে গিয়েছে পাহাড়।

ওই 'ধস' কথাটা শুনেই আমার স্মৃতির অতলে প্রবল এক আলোড়ন শুরু হল। আবার গঙ্গোত্রীকে মনে পড়ে গেল আমার। মনে পড়ল তাঁর মুখে পাহাড়ের ধস নামার যে বর্ণনা আমি শুনেছিলাম তাঁর পিতার অপঘাত মৃত্যুর বিবরণের সঙ্গে। এমনি ভয়ঙ্কর তাহলে সেই ভাঙন!

ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর একটি জিজ্ঞাসাও মনে জেগে উঠল আমার— এমনি ধস নামা যদি তেমন অস্বাভাবিক না হয় এই পাহাড় অঞ্চলে তবে সব জেনেশুনেও গঙ্গোত্রী পাহাড়ে পাহাড়েই অবিরাম ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন? নির্মম নিয়তির অলৌকিক কোন আকর্ষণ কাজ করছে নাকি তাঁর পিতার মত তাঁর নিজের উপরেও? না, তাঁর নিজেরই অবচেতন মনের কোন ইচ্ছার অসহায় ক্রীড়নক সে?

গঙ্গোত্রী যাই হোক না কেন, আমার নিজের তখন প্রায় সম্মোহিত অবস্থা। ওই ভাঙা পাহাড়টির উপর থেকে আমার দৃষ্টি আর যেন সরতে চায় না। চোখের মত চরণ দুটিও আমার অচল হয়ে গিয়েছে যেন।

সম্বিৎ ফিরে এল বাহাদুরের অসহিষ্ণু কণ্ঠের নির্দেশ শুনে: চলিয়ে বাবুজী— ধূপ কড়ী হো রহী।

সচেতন হবার পর ভাল করে তাকিয়ে জিতেনকে আর দেখতে পেলাম

না। নিশ্চয়ই তার অভ্যাসমত এগিয়ে গিয়েছে সে। তবে এখন তাতে ক্ষোভের চেয়ে স্বস্তিই আমার বেশী, কারণ বাহাদুরের তাড়া খেয়েই লজ্জিত হয়েছি আমি—যেন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ার অবস্থা।

ভাল জ্বালা হয়েছে আমার। গঙ্গোত্রী, তাঁর জননী, সীতা, সেই নাম-না-জানা যাযাবরী এবং তেমনি আরও অনেকের কোন না কোন একজন চোখের সামনে উপস্থিত না থাকলেও মনের পথে আনাগোনা করছেই।

আমারও সেই লক্ষ্মণের অবস্থা আর কি।

বনের পথে তিনজন একত্র চলেছেন। সকলের আগে রামচন্দ্র, মাঝখানে সীতা, পশ্চাতে লক্ষ্মণ। মাঝখান থেকে সীতা আড়াল করে রেখেছেন বলে লক্ষ্মণ পূর্ণব্রহ্ম রামকে দর্শন করতে পারছেন না।

ঠাকুরের কথা। রূপক দিয়ে তত্ত্ব বুঝিয়েছেন তিনি। কিন্তু কি আশ্চর্য মিল আমার বর্তমান অবস্থার সঙ্গে।

কেদারনাথের পথে যাত্রা আমার শুরু হতে না হতেই পার্বতীরা এলেন আমার সামনে। একজন অদৃশ্য হতে না হতেই আর একজন আসেন, অথবা চোখের আড়াল হলেও বিচরণ করতে থাকেন আমার মনের আনাচে-কানাচে। কেদারনাথ-বদরীনাথকে স্মরণ করবার সময় বা সুযোগ পাচ্ছি কই।

একটু ঘুরিয়ে এবং রাগ করবার ভান করে বাহাদুরকে বললাম, তুই যা-তা সব ভূতের গল্প শুনিয়েই আমার মনটাকে দুর্বল করে দিয়েছিস। নইলে এমন ভয়-ভয় ভাব হবে কেন!

সরল বাহাদুর মুখ কাঁচুমাচু করে উত্তর দিল: আমার কোন দোষ নেই, বাবুজী; আর মিছে কথাও আমি বলি নি। কেদারনাথজীর রাজ্যে সর্বত্রই ওনারা হাজারে হাজারে বিচরণ করেন। ওপারে বৈকুণ্ঠে একবার পৌঁছলেই দেখবেন যে একটুও ডর লাগবে না।

বদরীনাথ বিষ্ণুরই নাম। অলকনন্দা পার হলেই তাঁর নিজস্ব এলাকা শুরু হবে। বৈষ্ণবেরা তাকে বলে বৈকুণ্ঠ। শোনা কথা বাহাদুর আবৃত্তি করল প্রতিধ্বনির মত।

কিন্তু সেই বৈকুণ্ঠ যে আনন্দলোক তা মানেন না আর একজন। বাহাদুর যাকে মনে করে ভূতপ্রেতের দৌরাত্ম্য তাকেই তিনি বলেন ভেলকি—সেই বিষ্ণু বা বদরীনারায়ণেরই ইন্দ্রজাল যা দিয়ে মানুষকে তিনি সংসারে বেঁধে রেখেছেন।

[illegible]বনের চটিতে গোপেশ্বরের মন্দিরের কাছে তাঁর সঙ্গে দেখা হল।

নামের মধ্যে বৃন্দাবনের আভাস থাকলে কি হবে—গোপেশ্বর এখানে শিব। তাঁর নামেই চটি ও বসতির নামও গোপেশ্বর। এখান থেকেই বেরিয়ে গিয়েছে একেবারে আদি ও অকৃত্রিম পাকদণ্ডী পথ দশ না বার মাইল দূরে পঞ্চকেদারের পঞ্চম রুদ্রেশ্বরের মন্দির পর্যন্ত।

পূর্বেও খুব কম যাত্রীই যেত দুর্গম পথে আরও অতিরিক্ত কুড়ি মাইল হেঁটে রুদ্রেশ্বরকে দর্শন করতে। আজকাল বোধ করি একেবারেই কেউ যায় না। গোঁড়া শৈব চন্দ্রচূড় হয়তো সেই কারণেই ক্ষুব্ধ হয়ে আরও গোঁড়া হয়েছেন।

সন্ন্যাসী তিনি নন। রুদ্রেশ্বরের পাণ্ডাই হয়তো হবেন এই চন্দ্রচূড়। তবে কেবলই পেশাদার লোক বলে মনে হয় না তাঁকে। গোঁড়া হলেও তিনি প্রধানতঃ ভক্ত, যা শম্ভুজী নন। বিশ্বাস তাঁর শিলাময় পাহাড়ের মতই অনড় হলেও তাঁর সেই বিশ্বাসের প্রকাশ বড় মধুর।

আমরা তখনই চামৌলির দিকে যাত্রা করব শুনে চন্দ্রচূড় মুচকি হেসে বললেন, জাল কাটতে পারলে না তাহলে!

মানেই বুঝতে পারি নি তখন। বিহ্বল হয়ে বললাম, কি বলছেন আপনি? কিসের জাল?

উত্তর হল: ইন্দ্রজাল।

আমি নির্বাক। দেখে তিনি মৃদু হাসি তাঁর সারা মুখে ছড়িয়ে দিয়ে আবার বললেন, কি করে পারবে। এই কেদারনাথজীর রাজ্যেও তো ভেলকির জাল পেতে রেখেছে সে যাতে বেঁধে মুমুক্ষু যাত্রীকেও আবার সে তাঁর মায়ার সংসারে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

তথাপি অর্থবোধ হয় না। আবার বিহ্বল স্বরেই জিজ্ঞাসা করলাম, কি বলছেন আপনি? আমরা তো বদরীনারায়ণকে দর্শন করতে চলেছি।

আর আমিও তো তাঁর কথাই বললাম,—উত্তর দিলেন চন্দ্রচূড়: ভেলকি তো সেই বদরীনাথেরই। কেবল মায়াবী নয়, মায়াবীর রাজা সে।

এতক্ষণ পর মোটামুটি বুঝতে পারলাম তাঁর বক্তব্য। এবার আমিও হেসেই বললাম, বদরীনাথ যেতে আমাদের নিষেধ করছেন আপনি?

দৃঢ়স্বরে উত্তর হল: হ্যাঁ। ডান দিকে না গিয়ে বাঁ দিকের পাকদণ্ডী পথ ধর তোমরা। সেই পথের শেষে পঞ্চম কেদার রুদ্রেশ্বরের মন্দির। শান্তি

যদি চাও তবে তাঁরই চরণতলে তা পাবে। কেদারনাথজী-তুঙ্গনাথজীকে দর্শন করবার পর আবার কেন সেই মায়াবীর ফাঁদে গিয়ে পড়বে ?

বিস্ময় লাগে চন্দ্রচূড়ের চোখের দিকে চেয়ে। জ্বলন্ত বিশ্বাসের উত্তাপ তাঁর কণ্ঠস্বরে থাকলেও চোখের দৃষ্টিতে তাঁর বিদ্বেষের লেশমাত্রও নেই। এ আলোচনায় পরিহাস অচল বিবেচনা করেই ঈষৎ কুণ্ঠিতস্বরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বদরীনাথকে বারবার মায়াবী কেন বলছেন আপনি ?

উত্তরে চন্দ্রচূড় বললেন, মায়াবী না বললে তাঁকে তো বলতে হয় শঠ।

শঠ ?

তা বইকি। বৃন্দাবনের গোপীরা কি বলেছিল তাঁকে—'নিঠুর নট, কপট শঠ,—নয় ?

কিছু পাণ্ডিত্যও যে আছে এই চন্দ্রচূড়ের তা বুঝতে পেরে আরও কুণ্ঠিত হয়ে পড়লাম আমি। সত্যিই পাণ্ডিত্যের তর্ক যদি শুরু হয় তবে আমি নির্ঘাত হেরে যাব। তা ছাড়া তর্ক করবার সময়ই বা আমাদের কোথায় !

কিন্তু আমি চুপ করে থাকলেও চন্দ্রচূড়ই আবার বললেন, ওই তো নারায়ণের স্বভাব—সবাইকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিজের সৃষ্টিরক্ষার কাজ হাসিল করে সে। স্বয়ং শিবকেও রেহাই দেয় নি সেই চোট্টা নারায়ণ।

'শঠ' কথাটারই প্রতিশব্দ হলেও এ বিশেষণটি বড় বেশী কানে লাগে। জিতেন একটু বিরক্ত হয়েই বললে, কি বলছেন আপনি ?

চন্দ্রচূড় কিন্তু একটু যেন বিস্মিত হয়েই বললেন, তোমরা জান না তা ? শোন নি, কি করে নারায়ণ বদরীনাথ দখল করেছেন ?

আমরা দুজনেই ঘাড় নেড়ে অস্বীকার করলাম। চন্দ্রচূড় তখন মুচকি হেসে বললেন, শিবকেই নারায়ণের বেশী ভয় কিনা, তাই সকলের আগে তাঁকেই তাড়িয়েছে বদরীনাথ।

সংক্ষেপে সম্পূর্ণ কাহিনীই শোনালেন তিনি।

স্বয়ং কেদারনাথেরই আদি বাড়ি নাকি ছিল ওই এখন যেখানে বদরীনাথের মন্দির আছে সেই উপত্যকায়। দেবাদিদেব মহাদেব তিনি। ভারতবর্ষের সকলের তিনি আরাধ্য দেবতা। বিষ্ণুকে কেউ পরোয়াই করে না। শিবের প্রভাব-প্রতিপত্তিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে তখন বিষ্ণু একদিন তিব্বতে তাঁর নিজস্ব মন্দির পরিত্যাগ করে এসে কেদারনাথের বাড়ির কাছাকাছি এক উপত্যকায় ছোট একটি শিশুর রূপ ধরে কাঁদতে আরম্ভ করলেন।

ওদিকে বাড়িতে কেদারনাথের সঙ্গে পার্বতীর কথাবার্তা হচ্ছিল তখন। অন্নপূর্ণা রোজই যেমন করেন সেদিনও তেমনি জিজ্ঞাসা করলেন স্বামীকে: তোমার রাজ্যে কেউ এখন অভুক্ত বা নিরাশ্রয় নেই তো ?

কেদারনাথ উত্তর দিলেন, না।

কিন্তু ঠিক তখনই শিশুরূপী বদরীনাথের কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন পার্বতী। তাড়াতাড়ি তিনি বাইরে আসতেই তাঁর চোখে পড়ল শিশুটি। স্নেহে ও করুণায় গলে গিয়ে তখনই পার্বতী কোলে তুলে নিলেন তাকে ঘরে এসে স্বামীকে ভৎর্সনা করে বললেন, কি করে অমন কথা বললে তুমি ? এই দুধের বাছা এত শীতে খোলা মাঠে পড়ে পেটের খিদেয় কাঁদছে। ওকে আমাদের ঘরে আমার কাছেই রাখব আমি।

কেদারনাথজী কিন্তু শিশুর দিকে একবার তাকিয়েই সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বললেন, অমন কর্মও করো না, দেবী। এটি শিশু নয়, কপটকুলচূড়ামণি। কোন অভাবই ওর নেই। ওকে তুমি দুঃখী ভেবে ঘরে যদি ঠাঁই দাও তাহলে আসলে খাল কেটে কুমীর ডেকে আনা হবে।

হলও তাই। স্বামীর সতর্কবাণীতে কান দেন নি পার্বতী। স্নেহ ও করুণায় অন্ধ হয়ে নিজের ঘরেই তিনি রেখেছিলেন শিশুটিকে। ফল পেলেন পরদিনই।

শিশুটিকে খালি ঘরে রেখে দুজনে অলকনন্দায় স্নান করতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন যে, সমস্ত ঘরখানাই জুড়ে বসে আছে আগের দিনের সেই অতটুকু শিশু বিরাট এক চতুর্ভুর্জ পুরুষ হয়ে। দুজনেই চিনলেন বিষ্ণুকে, কিন্তু প্রতিবাদ করবার সময়ই পেলেন না তাঁরা। ঘরের ভিতর থেকে বিষ্ণুর গম্ভীর কণ্ঠের আদেশ কানে এল তাঁদের: তোমরা আর কোথাও গিয়ে ঘর বাঁধ গে ; এখানে এখন থেকে আমিই বাস করব।

নিরুপায় হয়ে বিতাড়িত কেদারনাথ তাঁর বর্তমান ধামে আশ্রয় নিয়েছেন।

বদরনীনাথ ও তাঁর মন্দিরের উৎপত্তি সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব বলেই কল্পনা নানা কাহিনী সৃষ্টি করেছে। তাদেরই একটি এই উদ্ভট গল্প। অসংস্কৃত কল্পনার সৃষ্টি নিশ্চয়ই এবং বৌদ্ধ-বিদ্বেষের গন্ধও একটু ওতে আছে। তবে হিন্দুধর্মের মূলধারা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয় ওই কল্পনা। প্রলয়পয়োধিজল অপসারিত করে অনন্তদল সৃষ্টিকমলের আবির্ভাবের তত্ত্বই বুঝি রূপ নিয়েছে এই কষ্ট-কল্পিত স্থূল আখ্যায়িকার মধ্যে।

তবে তত্ত্ব বা তথ্য নিয়ে তেমন মাথাব্যথা নেই চন্দ্রচূড়ের। রসিক পুরুষ তিনি এবং রস নিয়েই বিভোর। গল্প শেষ করবার পর আমার মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, এমন চালবাজ যে বদরীনাথ, রুদ্রেশ্বরকে ছেড়ে তাঁকে দর্শন করতে যাবে তোমরা ?

গোঁড়া ভক্তের এ হেন প্রশ্নের কি উত্তর দেব আমি! লজ্জিত হাসিমুখে চুপ করেই থাকলাম দেখে তিনিও যেন হাল ছেড়ে দিলেন। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিষণ্ণ কণ্ঠে তিনি বললেন, তবে যাও। নতুন কিছু তো নয়! বিষ্ণু তো চিরদিনই তার ভেলকি দেখিয়ে জীবকে মোক্ষের পথ থেকে ভুলিয়ে সংসারে নিয়ে বাঁধছেন। তোমরাও যে ভুলবে তাতে আর আশ্চর্য কি!

আমি আড়চোখে জিতেনের মুখের দিকে চেয়ে দেখি যে, আবার কেমন যেন উন্মনা হয়েছে সে। সেটা আমার পক্ষে ভয়ের কারণ। আর এদিকে চন্দ্রচূড়ের কথাগুলিও আশীর্বাদ বলে মনে হয় নি। আমরা পঞ্চম কেদারকে দর্শন করব না শুনে সত্যিই ক্ষুণ্ণ হয়েছেন তিনি। তাঁর সেই ক্ষোভকে অন্ততঃ আংশিকভাবে দূর করবার উদ্দেশ্যে আমি বললাম, এখানকার গোপেশ্বরও তো শিব। আর তাঁকে দর্শন করবার জন্যই তো, দেখুন, এই মন্দির পর্যন্ত এসেছি আমরা। এখানে পূজো করবার জন্য দয়া করে আমাদের পুরোহিত হবেন আপনি ?

রাজী হলেন না তিনি ; কিন্তু হেসে বললেন, গোপেশ্বরজীর পুরোহিত মন্দিরেই আছেন। যাও—দর্শন-পূজা কর গে তোমরা।

বলেই একটি সরু গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি।

তত্ত্ব থেকে বস্তুর স্তরে নেমে একটু আশ্বস্ত হল আমার মন। মন্দির দেখতে দেখতে ভয়-ভয় ভাবটা একেবারে কেটে গেল।

মণ্ডলচটি থেকে গোপেশ্বর মাইল ছয়েক মোটে দূর। শেষের দিকে খানিকটা চড়াই থাকলেও পথও বেশ ভালই। সুতরাং বেলা নটা বাজবার পূর্বেই ওখানে পৌঁছে গিয়েছিলাম আমরা।

বিরাট এক কাছিমের পিঠের মত পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় গোপেশ্বর চটি। কিন্তু পাহাড় বলে মোটে মনেই হয় না জায়গাটিকে। পরিবেশ চোখে যতটা পড়ে তার সর্বত্রই ক্ষেত। মাঝখানের বসতি বর্ধিষ্ণু হলেও গ্রামই মনে হয়। দোতলা বাড়ির সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়। মন্দিরের

[illegible] তো এদেশে কোথাও চোখে [illegible] নি। গোপেশ্বরের মন্দির তুলনায় আরও ছোট, আরও সাদাসিধে। তবে বহু প্রাচীন মন্দির এটি। এর উপর নির্মম কালের ধ্বংসলীলা মানুষের উপেক্ষার প্রশ্রয় পেয়েছে। মন্দির এখন জীর্ণ, বিগ্রহ উপেক্ষিত। ভিতরে টিমটিম করে একটি প্রদীপ জ্বলছে দেখলাম। ভিতরটা স্যাঁতসেঁতে। দেয়ালে কেবল যে শেওলা জমেছে তাই নয়, যেখানে ফাটল সেখানে ঘাসও গজিয়েছে বুঝি। আমরা ভিতরে গিয়ে ঢুকতেই কয়েকটি চামচিকে ঝটপট পাখার আওয়াজ করে উড়ে গেল।

মন্দিরের পাশেই বাইরে বিরাট একটি ত্রিশূল দেখলাম। তার গায়ে মস্ত বড় একটি কুঠার ঝুলছে। ত্রিশূল মহাদেবের ; কুঠারটি নাকি পরশুরামের।

মন্দির যাত্রী-সড়ক থেকে বেশ একটু দূরে। সড়কের দু ধারে একদিকে ঘন বসতি, মন্দিরে যাবার পথ গিয়েছে বাজারের ভিতর দিয়ে। এ গ্রামের লোকসংখ্যা যে নিতান্ত কম নয় তা অনুমান করলাম জলের কলের কাছে গাড়োয়ালী গৃহিণীদের ভিড় দেখে। যাত্রী-সড়কের ধারে পাঠশালাও একটি আছে।

খালি পড়ে আছে যে চালাঘরগুলি সেগুলি বুঝি চটি। উঁকি দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম—থমকে দাঁড়ালাম হঠাৎ একজনের সঙ্গে চোখাচোখি হওয়াতে। বেশী-বয়সের একজন স্ত্রীলোক ; তার পাশেই হাঁটু মুড়ে বসে আছে আরও বেশী-বয়সের পুরুষ একজন। মেটে মেঝেতে ছেঁড়া কম্বল একখানা বুঝি এইমাত্র পাতা হয়েছে, তার উপর ময়লা কাপড়ের দুটি পুঁটলি। পুরুষটির শীর্ণ ও জীর্ণ দেহে জরা এবং রোগ উভয়েরই যুগপৎ আক্রমণের চিহ্ন স্পষ্ট বোঝা যায়।

চেয়ে দেখবার মত মুখ একখানাও নয়। কিন্তু চেনা চেনা ঠেকছে যে! হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

সেই বেণিয়াকুণ্ড চটিতে সন্ধ্যাবেলায় দোকানে সওদা করতে বসে পিছনে অবিরাম খুক্‌খুক্ কাশির শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখেছিলাম একটি স্ত্রীলোককে নিয়ে জন-চারেক লোকের ছোট একটি দল। সেই দলের একজন পুরুষ তার শীর্ণ হাত বাড়িয়ে আমার কাছ থেকে এক গ্লাস চায়ের দাম ভিক্ষা চেয়ে নিয়েছিল। পরদিন আবার সেই দলটিকে দেখেছিলাম ভুলোকনা ও পাঙ্গরবাসা চটির মাঝামাঝি পথে।

মোটামুটি শক্ত দেহ লক্ষ্য করেছিলাম তাদের মধ্যে একা এই স্ত্রীলোকটির। পুরুষ তিনজনই বৃদ্ধ। তা ছাড়া তখনই মনে হয়েছিল যে, তারা প্রত্যেকেই কোন না কোন দুরারোগ্য রোগে ভুগছে—হয় শ্বাস, নয়তো রাজরোগই। স্পষ্ট উচ্চারণ করে কথাও বলতে পারে না কেউ। বিড়বিড় করে যা বলে তার অর্থ বুঝতে হয় প্রসারিত হাতের তেলোর দিকে চেয়ে।

মনে পড়ল যে, দেখেছিলাম তারা ধুঁকতে ধুঁকতে চলছে—কখনও আগে-পিছে, কখনও একসঙ্গে দল বেঁধে। বাহাদুর তখন বুঝিয়ে বলেছিল আমাকে—বাস ভাড়া দেবার সাধ্য ওদের নেই বলেই হাঁটা-পথে ওরা চলেছে বদরীনাথ দর্শন করতে। নির্ভর সম্পূর্ণ ভিক্ষার উপর।

ভাল করে তাকাতেই সন্দেহ-ভঞ্জন হল। ততক্ষণে আমাদের দুজনকে দেখে স্ত্রীলোকটিও এগিয়ে এসে দোরের কাছে দাঁড়িয়েছে—আর সেই পরিচিত ভঙ্গিতে আমার দিকে হাত বাড়িয়েছে কিছু ভিক্ষার জন্য।

বিনা আয়াসে পকেট থেকে যা উঠল তাই তার হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমি : দলে চারজন ছিলে না তোমরা ?

হ্যাঁ বাবু,—ঘাড় নেড়ে উত্তর দিল স্ত্রীলোকটি : দলের আর দুজন এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ইনি অশক্ত।

তাতে সন্দেহ নেই। বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে বসে বসেও ধুঁকছে সে। পিছনের চড়াই কেমন করে যে পার হয়ে এল এই রুগ্ন বৃদ্ধ তা বুঝতে পারি নি আমি। ওই যে শুনেছি 'পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং'—এ কি তারই উদাহরণ দেখছি আমার চোখের সামনে!

সসম্ভ্রম বিস্ময়ে ভাবছিলাম আমি, কিন্তু তখনই তাল কেটে গেল। করুণ স্বর আবার কানে এল আমার : মোটে এক আনা দিলে বাবু—এক গ্লাস চা-ও তো হবে না এতে।

হাত আবার পকেটে ঢুকে গেল আমার। সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি বুঝি তোমার স্বামী ?

হ্যাঁ বাবু, যেমন কপাল করেছিলাম—

কানে গিয়ে লাগল স্ত্রীলোকটির তিক্ত কণ্ঠস্বর। কিন্তু ততক্ষণে পুরো একটি টাকাই হাতে উঠেছে আমার। আর ইতস্ততঃ না করে তাই ফেলে দিলাম স্ত্রীলোকটির হাতের তেলোতে।

পুকুরে ছোট একটি ঢিল ফেললেও জল নড়ে জানি। কিন্তু এ যে

দেখছি উত্তাল তরঙ্গভঙ্গ।—দাম পেয়েই বড় বেশী যেন চঞ্চল হয়ে উঠল স্ত্রীলোকটি।

তৎক্ষণাৎ এমন ভাবে ঘুরে দাঁড়াল সে যাতে ভিতরের পুরুষটি আমার দৃষ্টির আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। ক্ষিপ্র হস্তে টাকাটি সে বেঁধে ফেলল তার আঁচলের খুঁটে; তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে প্রায় গদগদ স্বরে সে বললে, তুম, বাবু, বহুত অচ্ছা আদমী হো।

তোষামোদে শুনি স্বয়ং ভগবানও তুষ্ট হন। আমি তো কোন্ ছার। ক্ষণিকের বিস্ময়কে হটিয়ে আত্মপ্রসাদ আমার সম্পূর্ণ মন জুড়ে বসল। এবার হেসেই তাকালাম স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে। বললাম, খানা বনায়ো—মজেসে খা লো। বন্দোবস্ত সব ঠিক হ্যায় তো?

তুরন্ত হো জায়েগা।—উল্লসিত কণ্ঠে উত্তর দিল স্ত্রীলোকটি। সঙ্গে সঙ্গেই তার দেহের বিভিন্ন তটে আরও কয়েকটি তরঙ্গ ভেঙে পড়ল যেন। সেও আমার মুখের দিকে চেয়ে আবার বললে, তোমরা এখানে থাকবে বাবু?

থাকবার পরিকল্পনা নেই আমাদের—একটানে পিপুলকুঠি পর্যন্ত যাবার ইচ্ছা নিয়েই মণ্ডলচটি থেকে যাত্রা করেছি আমরা। তথাপি স্ত্রীলোকটির প্রশ্ন শুনে জিজ্ঞাসু চোখে জিতেনের মুখের দিকে তাকালাম আমি।

কিন্তু জিতেন নির্বিকার। সে দৃঢ়স্বরে বললে, না মণিদা, চলুন এগিয়ে যাই।

সুতরাং ফিরে স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে চেয়ে আমি বললাম, নহী ঠহরেঙ্গে। হমলোগোঁকো অভী চলনা হ্যায়।

কয়েক পা এগিয়েও গিয়েছিলাম, কিন্তু হঠাৎ আবার চেনা সুরের ডাক কানে এল—বাবুজী!

ফিরে তাকিয়ে দেখি যে, সেই স্ত্রীলোকটি ঘর থেকে পথে নেমে দাঁড়িয়েছে। আমি থমকে দাঁড়ালাম দেখেই সে দ্রুতপদে আমার দিকে এগিয়ে এল। কাছে এসে আবার বললে, আজ দিনটা এখানে থেকেই যাও না বাবু। কাল সকালে একসঙ্গেই যাওয়া যাবে।

আমি আবার অস্বীকার করলাম, নহী হো সকতা।

পরক্ষণেই চোখের পলকে ঘটে গেল ব্যাপারটা।—বিদ্যুদ্বেগে ছুটে এসে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত উদ্ধত ভঙ্গিতে তার মাথাটাকে পিছনে হেলিয়ে

প্রায় আমার মুখের কাছে মুখ তুলে স্ত্রীলোকটি বললে, [illegible] ক্যা?—বলেই ফিক্ করে হেসেও ফেলল সে।

একটা সাপ যেন হঠাৎ ফোঁস করে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে—তার বিষাক্ত নিশ্বাস আমার গায়ে এসে পড়ল—না, দংশনই করল সে? পা থেকে মাথা পর্যন্ত আমার সিরসির করে উঠল। না, মন? চমকে দু পা পিছনে হটে গেলাম আমি।

বৃদ্ধা না হলেও প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি। অমার্জিত ময়লা রঙ তার রোদে পুড়ে ও জলে ভিজে মৃতের চামড়ার মত বিবর্ণ। হাতের আঙুলগুলি দেখতে পাকানো দড়ির মত। লাবণ্যের সংস্পর্শহীন পাকা মুখখানিতে গঠনের পারিপাট্য একেবারেই নেই। চাপা হাসির আকস্মিক প্রলেপে আরও কুৎসিত হয়েছে সেই মুখ।

নিদারুণ বিরক্তি ও বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নিলাম আমি। কিন্তু কমছে না তো সেই সিরসির ভাবটা!

রক্ষা করল বাহাদুর। পিঠের বোঝা তুলে নিতে স্বতঃই একটু তার দেরি হয়েছিল বলেই আমার পিছনে আসছিল সে। কাছে এসে এখন সে থমকে দাঁড়াল। চোখ দুটি তার যথাসম্ভব উপর দিকে তুলে প্রথমে আমাকে ও পরে স্ত্রীলোকটিকে দেখে নিল সে। তারপর তাকে সে ধমক দিয়ে বললে, ভাগ য়হাঁসে। পুরা এক রূপয়াহী তো তুঝে মিল গয়া। ফির দুখ ক্যঁও দেতী হো?

সঙ্গে সঙ্গেই সে আমাকে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিল তার হাতের ইশারায়।

মিনিট পনর পর আমার কাছাকাছি এসে বাহাদুর আমাকে বললে, অচ্ছা কিয়া বাবুজী কি উস চট্টিমে আপ ঠহরে নহী। মুঝে মালুম হোতা হ্যায় কি ওহ আওরত অচ্ছী নহী থী।

আমি বিব্রত ভাবে বললাম, কি বলছিস তুই? কি করে জানলি?

বাহাদুর উত্তরে বললে, মনে এল তাই আপনাকে বললাম বাবুজী। এই তীর্থের পথে কত লোকই তো আসে। তাদের সবাই কি আর সাধুসন্ত হতে পারে!

তখনও সেই অনুভূতিটা মনে রয়েছে আমার—অজানতে কোন অশুচি বস্তু মাড়ালে দেহ ও মনের যে অবস্থা হয়, কতকটা সেই রকম। বাহাদুরের

কথা শুনেই মনে হল বুঝি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা একটি পেয়ে গিয়েছি আমার ওই অবস্থার—দেবমন্দিরের শুচিতা যেমন মনকে শুচি করে, অশুচি পরিবেশেরও তো শুনি যে তেমনি বিপরীত প্রভাব আছে মানুষের মনের উপর।

কিন্তু ব্যাখ্যাটা আমার মনের মত হলেও তৎক্ষণাৎ চোখ রাঙিয়ে নিজের মনকে শাসন করলাম আমি। ও ব্যাখ্যা যে দুমুখো তরোয়ালের মত। দুপক্ষ নিয়ে যেখানে কারবার, সেখানে নিশ্চয় করে কে বলতে পারে কার অশুচিতা কার মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে!

মনে মনে প্রভু যীশুখ্রীষ্টের আদেশ স্মরণ করলাম—জীবনে একবারও যার পদস্খলন হয় নি, সেই প্রথম ঢিল ছুঁড়ুক ওই পাপিষ্ঠার গায়ে।

॥ ১৯ ॥

কলুষনাশিনী গঙ্গা। হরিদ্বার থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত যতবার গঙ্গায় স্নান করেছি ততবারই মনে পড়েছে ওই বর্ণনা। দেহ ও মনের অতিস্নিগ্ধ অনুভূতির মধ্যে কিছু কিছু প্রমাণও পেয়েছি তার। কিন্তু সে তো স্নান করবার পর। গঙ্গা দর্শন করলেও কিছু কলুষ নাশ হয় নাকি!

বাহাদুর একসময়ে আমাকে বললে, ওই যে বাবুজী, অলকনন্দা।

অনেক উঁচু থেকে দেখা। তবু বেশ ভালই দেখা গেল। বিপুল জলধারা খরস্রোতে বয়ে চলেছে। কিন্তু গঙ্গার অন্য বেশ এখানে। বাহাদুর না বলে দিলেও আমি বুঝতে পারতাম যে ইনি মন্দাকিনী নন। স্ফটিকশুভ্র নয় এর জল। আর দুকুলের পাহাড়েই স্পষ্ট লালের আভা থাকলেও রাঙাও নয় তা। কাদাগোলা রঙের ঘোলা জল অলকনন্দার—বর্ষাকালে কলকাতার ঘাটে মেটে রঙের যে গঙ্গাজল দেখি আমরা, তার চেয়েও যেন কালো। অলকনন্দা এখানে ঠিক কুলুনাদিনী না হলেও মন্দাকিনীর মত গর্জন নেই তাঁর।

অত দূর থেকে দেখেও চোখ জুড়িয়ে গেল যেন। চোখের পথে মনে গিয়েও ছড়িয়ে পড়ল সেই স্নিগ্ধতা। তারপর পায়ের গতি আমার দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

তার একটি কারণ যে উতরাই পথ, তা সঠিক বুঝলাম অলকনন্দার উপরকার পুলের কাছাকাছি উপস্থিত হবার পর। বাঁয়ে উপর দিকে তাকাতে গিয়ে মনে হল যে, আমার ঘাড় বুঝি মট করে ভেঙে যাবে—এতই উঁচু সেদিকের পাহাড়। বিশ্বাসই হয় না যে ওই পাহাড় থেকেই এইমাত্র নদীর ঘাটে নেমে এলাম আমি।

ওপারে চামৌলি। মনোরম পার্বত্য শহর একটি।

পূর্বে নাম ছিল লালসাঙ্গা। অলকনন্দার উপরে যে পুলটি পার হয়ে ওপারে শহরে গিয়ে উঠতে হবে সেটির রঙ তখন আগাগোড়া লাল ছিল বলেই শহরের নামও ছিল লাল "সাঙ্গা"—মানে পুল। পুলের লাল রঙ এখন আর নেই, লাল নামও এখন নেই শহরের। ভালই হয়েছে। আমাদের দেশের "লাল" দলের শাখা এখানেও যদি থেকে থাকে, তবে তা অন্ততঃ টকটকে লাল রঙ বা লাল নামের অতিরিক্ত সমর্থন ও সহযোগিতা পাবে না।

দেবপ্রয়াগের চেয়ে অনেক বড় শহর চামোলি—দোকান-পসার, আপিস, আদালত, ধর্মশালা, হাসপাতাল নিয়ে বেশ জমজমাট। মাঝের থাকে কাটরা অঞ্চলে পণ্যের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য প্রথম দৃষ্টিতেই চোখে ধরা পড়ে।

জিতেনের তর সয় না—তাড়াতাড়ি উপরে গিয়ে বাস ধরবার ইচ্ছা তার। কিন্তু আমার অন্য প্রবৃত্তি—গৃহস্থালির শূন্য ভাণ্ডার আবার পূর্ণ করতে চাই আমি। সুতরাং সবিনয়ে জিতেনকে নিবৃত্ত করবার পর বাজারে খুঁজে খুঁজে লজেন্স, মিছরি, বিস্কুট তো বটেই, নুন, তেল, হলুদ, মসলাও কিনলাম থরে থরে। ফলে বোঝা যে বাড়ছে সেদিকে খেয়ালই নেই আমার।

অতসব জিনিস যে থলেটির মধ্যে রাখা হবে সেটির খোঁজ করতে গিয়েই ধরা পড়ল যে বাহাদুর আমাদের সঙ্গে নেই।

আধ ঘণ্টাখানেক পরে উপরে বাস-সড়কের ধারে গিয়ে দেখা পেলাম তার। টিকেট-ঘরের পাশে আমাদের মোটঘাট গুছিয়ে রেখে কাছেই ছায়ায় বসে আর একটি কুলির সঙ্গে গল্প করছিল সে। একটু ধমক দিলাম তাকে আমাদের না জানিয়ে সোজাসুজি সে উপরে উঠে এসেছে বলে; তারপর খাবারের ঠোঙাটি তার হাতে দিয়ে বললাম চটপট খাওয়া সেরে নিতে।

সে কিন্তু অমন লোভনীয় ঠোঙাটিও এক পাশে সরিয়ে রেখে কুণ্ঠিতস্বরে আমাকে বললে, একটা ঠিকানা লিখে দেবেন, বাবুজী? চিঠি আমি আর একজনকে দিয়ে লিখিয়েছি।—বলতে বলতে তার ডান হাতখানা একটু বাড়িয়ে সে একখানা পোস্টকার্ড দেখাল আমাকে। হিজিবিজি কি যেন লেখা আছে তাতে—কেবল ঠিকানার ঘরটাই খালি।

কার্ডখানা আমি হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম তাকে: কাকে চিঠি লিখছিস?

উত্তরে দেখি কথাই ফোটে না তার। শুধু চোখ দুটিই নয়, মুখখানাও নীচু করে অস্ফুটস্বরে যা সে বললে তার মধ্যে কেবল 'শ্রীনগর' নামটাই ঠিক ঠিক বুঝতে পারলাম আমি।

তবে ওইটুকু শুনেই মনে পড়ে গেল আমার—আসবার পথে ওই শ্রীনগরেই বাহাদুরকে আমরা দেখেছিলাম তার বাক্‌দত্তা বধূ রুক্মিণী এবং তারই মাতাপিতার সঙ্গে স্থানীয় এক বস্তীবাড়ির প্রাঙ্গণে। বাহাদুরের হোঁতকা মুখে নারীসুলভ লজ্জার লালিমার অর্থও সঙ্গে সঙ্গেই বোধগম্য হল আমার। সুতরাং মুচকি হেসে বললাম, রুক্মিণীকে চিঠি লিখছিস নাকি?

প্রশ্ন শুনে স্পষ্টই সে [illegible] বেশী বিরক্ত হয়ে [illegible] [illegible]ার সম্পূর্ণ উত্তরই দিল সে : না, বাবুজী। তার বাপ দলবাহাদুর গুড়ুংকে।

ও একই হল। সুতরাং মনে মনে খুশী হয়েই তার ফরমাশ তামিল করলাম। তবে বেশ সময় লাগল ওইটুকু ঠিকানা লিখতে। বাহাদুরের কোন উচ্চারণই তেমন স্পষ্ট নয়। দু-তিনবার শুনলে তবে এক-একটি শব্দ বোধগম্য হয় আমার। সুতরাং ঠিকানার ভুলে এমন মূল্যবান চিঠিখানাও ডাকঘরেই যাতে পঞ্চত্ব না পায় সেজন্য সম্পূর্ণ ঠিকানাটি হাতের কাছে টুকরো কাগজের অভাবে আমার নোটবইতে প্রথমে টুকে নিয়ে পরে তাই নকল করে বড় বড় অক্ষরে লিখলাম পোস্টকার্ডের পিঠে। তারপর কার্ডখানি বাক্সে ফেলে দেবার জন্য বাহাদুরের হাতে দিয়ে আবার তার মুখের দিকে চেয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করলাম আমি : রুক্মিণীর জন্য তোর মন খুব উতলা হয়েছে নাকি রে?

উত্তর না দিয়েই পালিয়ে গেল বাহাদুর—মানে, ছুটে গেল অদূরে পোস্ট-অপিসের দিকে।

নীচে মুদীর আর মনোহারী দোকানে সওদা শেষ করবার পর বাহাদুরকে কাছে না দেখে বিরক্ত হয়েছিলাম নিশ্চয়ই। কিন্তু তখনই তাকে খুঁজে বের করবার তাগিদের চেয়েও আরও কড়া একটা তাগিদ অনুভব করছিলাম আমি আমার নিজের মধ্যেই। একটানা প্রায় ন মাইল পথ হেঁটে আসবার পর পেটের মধ্যে তখন দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। দুপুরে কোথায় গিয়ে কখন যে রান্না করতে পারব তার ঠিক নেই। সুতরাং ওই চামৌলির বাজারেই তখনই পেটের আগুন নেভাবার চেষ্টা করতে হল।

মিষ্টির দোকানের অভাব নেই ওখানে। পেড়া ও লাড্ডু জাতের মিঠাই থরে থরে সাজানো রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। মালাইসহ গরম দুধ সব দোকানেই পাওয়া যায়। কিন্তু দুধের চেয়ে দইয়ের উপর বেশী অনুরাগ আমার। খুঁজতে খুঁজতে তাও পাওয়া গেল। সেই দোকানে বসেই দুজনে পরিপাটি ভোজন সমাধা করলাম। এখন সিঁড়ির মত পথ বেয়ে উপড়ে যেতে হবে বাস-সড়ক পর্যন্ত।

কিন্তু উঠে দাঁড়াতেই খচ করে উঠল আমার ডান পায়ের গুল্‌ফসন্ধির কোন একটা জায়গায়। যতবার পা ফেলি ততবারই তাই। চলতে চলতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালাম একটু। বুঝলাম যে, স্থির হয়ে দাঁড়ালে কোন

কষ্ট বোধ [illegible] কেবল [illegible] [illegible] [illegible] করে জায়গাটা। আমার পক্ষে যত জোরে চলা স্বাভাবিক তত জোরে চলা এখন দেখছি একেবারে অসম্ভব।

শেষে অবস্থাটা জানালাম জিতেনকে। সে জিজ্ঞাসা করল, পা মচকায় নি তো আপনার?

মনে করতে পারলাম না। চলতে চলতে নিশ্চয়ই পাথরের ফাঁকে অনেকবার পা আটকে গিয়েছে, গোড়ালির সন্ধিস্থলটা বেঁকেও গিয়েছে মাঝে মাঝে। কিন্তু একবারও মনে হয় নি যে, কোথাও আঘাত লাগল তাতে। আর ব্যথা অনুভব করলাম তো এই প্রথম—দোকানঘরের দিব্যি সমতল বারান্দায় বেঞ্চির উপর আরামে পা ঝুলিয়ে বসে পরম পরিতোষ সহকারে ভোজন সমাধা করবার পর।

জুতো-মোজা খুলে ডান পায়ের পাতা ও গুল্‌ফ দুজনেই অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করলাম। দেখা গেল যে একটু ফোলা আছে গোড়ালির ডান দিকে। তবে জিতেনের চোখে তা অস্বাভাবিক ঠেকলেও আমি নিরুদ্বিগ্ন। অনেক বৎসর পূর্বে এক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে গিয়ে কিছুদিন থাকতে হয়েছিল আমাকে দুটি পায়েরই নানা জায়গায় ছেঁড়া চামড়া জোড়া লাগাবার জন্য। কেটে গিয়েছিল ডান পায়ের গুল্‌ফ অঞ্চলের মোটা চামড়াও। ঘা শুকোবার পরেও বিশেষ ওই জায়গাটা একটু ফুলেই রয়ে গিয়েছে। ব্যথা বা অন্য কোন উপসর্গ গত পনর বৎসরের মধ্যে ওখানে একবারও প্রকাশ পায় নি বলে ওই জায়গায় সামান্য স্ফীতিকে মোটেই অস্বাভাবিক মনে করি নি আমি।

তবে এখন যে হাঁটতে গেলেই লাগছে ওই জায়গাটাতে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং ওষুধের ছোট বাক্সটি খুলতে হল। টিংচার আইডিনের শিশি দেখি শূন্য—ছিপির ফাঁক দিয়ে ইতিমধ্যে তরল পদার্থটুকু অদৃশ্য হয়েছে। তবে আয়োডেক্স মলম পাওয়া গেল একটি অক্ষত ডিবাতে। তখনই ব্যথার জায়গায় তাই একটু মালিশ করে গোড়ালির চারিদিকে হালকা একটি ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল জিতেন। তারপর সে আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললে, উপরে গেলেই বাস পাওয়া যাবে, মণিদা। আর সামনের বাস-স্টেশন পিপুলকুঠি পর্যন্তই আজকের প্রোগ্রাম আমাদের। অর্ধেকটা দিন আর পুরো এক রাতের বিশ্রামে আপনার পায়ের ব্যথা সেরে যাবে আশা করি।

সেটা ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। আপাততঃ উপকার [illegible] — একটি উৎস থেকে। ডান পায়ের কাজটা যথাসম্ভব হাতের লাঠিকে দিয়ে করিয়ে উপরে গিয়ে পৌছবার পরেই তখনকার মত ভুলেই গেলাম ব্যথাটাকে—নতুন খোরাক পেয়েছে আমার মন।

উপরে আরও জমজমাট। পথের ধারেই পাশাপাশি কয়েকখানা দোতলা বাড়ি। নতুন সরকারী বিশ্রামভবন যেটি নির্মিত হয়েছে সেখানা তো রাজপ্রাসাদ। সারি সারি বাড়ি ও বাস-সড়কের মাঝখানে ফুটপাতের মত যে দীর্ঘ ও প্রশস্ত জায়গা আছে সেখানে বাস-কোম্পানীর টিকেট ঘর ও প্রতীক্ষালয় ছাড়াও পান-সিগারেটের স্টল, মিষ্টির দোকান ও একটি রীতিমত হোটেল আছে দেখলাম। সড়কের উপর লম্বা এক সারি বাস দাঁড়িয়ে আছে; বাস আসছে ও ছাড়ছেও পাঁচ-দশ মিনিট পরে পরেই। ঠিক গিজগিজ না করলেও লোকজন এখানে অনেক। ব্যস্তসমস্ত ভাব সকলেরই। সব মিলিয়ে হৈ হৈ, রৈ রৈ কাণ্ড।

চাঁদনী-চক থেকে চৌরঙ্গির মোড়ে এসে পড়লাম যেন—অন্যমনস্ক তো হবই। কেবল বিস্মৃতি নয়—নতুন এবং বেশ মূল্যবান এক প্রাপ্তির উপলব্ধি যেন আমার মনে।

যেন জলের মাছ ডাঙায় পড়ে অনেকক্ষণ ছটফট করবার পর আবার জলে এসে পড়েছে।

বাসে উঠে ড্রাইভারের পাশের দুটি আসন দুজনে দখল করে বসেই জিতেনকে আমি বললাম, একটা সিগারেট দাও তো।

জিতেন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, বিড়ি ছেড়ে হঠাৎ সিগারেট যে?

হাসিমুখে উত্তর দিলাম, বর্বরতা থেকে সভ্যতায় ফিরে এসেছি—উৎসব করতে হবে না!

কিন্তু উৎসব বলতে কেবল তো ওই জ্বলন্ত সিগারেটটি ফুঁকে ফুঁকে ধোঁয়াতে পরিণত করা। গাড়ি ছাড়তে দেরি থাকলে কি হবে, পায়ের ব্যথা নিয়ে অকারণে হেঁটে চলে বেড়াবার সাহস হয় না। সুতরাং বাধ্যতামূলক ওই অবসরের ফাঁকটুকুকে আর কোনরকম সক্রিয় উৎসব দিয়ে ভরতে না পেরে গাড়িতে বসেই অলস দৃষ্টিতে লোকজনের চলাফেরা দেখে উৎসব করবার দুধের স্বাদ ঘোলেই মেটাচ্ছিলাম আমি।

সেই বৃ[illegible] মধ্যে [illegible] একজনের মুখের উপর গিয়ে পড়বার পরে একেবারে যেন নিশ্চল হয়ে গেল।

গেরুয়া রঙের আলখাল্লা-পরা বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। শীর্ণ-দেহে জরার চেয়েও রোগের দৌরাত্ম্যের চিহ্ন বেশী দেখা যায়। মাথায় চুল ও মুখমণ্ডলের দাড়ি-গোঁফ গত দু-এক দিনের মধ্যেই নির্মূল করা হয়েছে বলে চোয়ালের উদ্ধত হাড় ও মুখের অসুস্থ পাণ্ডুর বর্ণ এত দূর থেকেও বেশ চোখে পড়ে। কিন্তু তা ছাড়াও অস্পষ্টভাবে আরও কি যেন দেখছি আমি। চেনা-চেনা ঠেকছে সন্ন্যাসীর মুখখানি।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। একটু পরেই মনে হল যে, তিনিও আমাকে দেখছেন। তারপরেই চোখাচোখি দুজনের।

বিব্রতভাবে চোখ ফিরিয়ে নিলাম আমি। কিন্তু মন আমার ক্রমাগতই বলছে যে, ওই সন্ন্যাসীকে কোথায় যেন দেখেছি আমি। চুপিচুপি জিতেনকে বললাম আমার সন্দেহের কথা। তারপর দুজনেই একসঙ্গে তাকালাম তাঁর দিকে। তখনও দেখি যে তিনি চেয়েই আছেন আমাদের দিকে।

কিছুক্ষণ অভিনিবেশ সহকারে তাঁকে লক্ষ্য করবার পর জিতেনও স্বীকার করল যে, চেনা-চেনা মনে হচ্ছে তারও ; কিন্তু কোথায় যে ওই সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল তা ঠিক ঠিক স্মরণ হচ্ছে না তার।

তবে স্মরণ করবার জন্য আর বেশী চেষ্টা করতে হল না। আমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখেই সন্ন্যাসী দ্রুতপদে আমাদের বাসের কাছে এসে নিজেই হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, মুঝকো নহী পহচানতে হো ?

গলার স্বরও চেনা-চেনা। তথাপি ঠিক মনে পড়ছে না তো! সুতরাং কুণ্ঠিত হয়ে বললাম, ঠিক কোথায় যে দেখেছি আপনাকে—

ঋষিকেশমে !—আমার মুখের কথা শেষ হবার পূর্বেই বললেন সন্ন্যাসী : উসসে ভী আগে হরদোয়ারমে।

স্মৃতির দুয়ার আমাদের সশব্দে খুলে গেল। জিতেন উল্লসিত হয়ে বললে, ঠিক—ঠিক মনে পড়েছে এখন। ঋষিকেশে গঙ্গার ঘাটে দেখা হয়েছিল আমাদের। আপনার নাম স্বামী সত্যানন্দ আশ্রম না ?

স্মিতমুখে ঘাড় কাত করলেন সন্ন্যাসী। আর তখন সব কথাই আমারও মনে পড়ে গেল। এই সন্ন্যাসীর নিজের মুখ থেকেই শুনেছিলাম এঁর ব্যর্থ সাধনার করুণ ইতিহাস। সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে এক আশ্রমে গিয়ে

আশ্রয় নিয়েছিলেন [illegible] সাধন-ভজন করবার উদ্দেশ্যে। [illegible] সেখানে তিনি না পেয়েছেন ঈশ্বর, না মানুষ। ভগ্নহৃদয়ে সে আশ্রম থেকে বেরিয়ে এসে পরিব্রাজক হয়েছেন। বলেছিলেন যে তাঁর চেষ্টাও আছে নিজস্ব একটি আশ্রম করবার।

সন্ন্যাসীর ওই ইচ্ছার কথা শুনে জিতেন সেদিন আমার কাছে তাঁকে বিদ্রূপ করেছিল। পাছে এখনও সন্ন্যাসীর মুখের উপরেই আবার তেমনি কোন বেফাঁস কথা বলে ফেলে সে, সেই আশঙ্কায় আমি অলক্ষ্যে জিতেনের গা টিপে সতর্ক করে দিলাম তাকে। তারপর সন্ন্যাসীকে বললাম, আপনি না গোয়ালিয়রে আপনার এক শিষ্যের কাছে যাবেন বলেছিলেন?

শুনে সন্ন্যাসী প্রীত হয়েছেন মনে হল আমার। একটু হেসেই তিনি বললেন, সে কথাও মনে আছে তোমার? কিন্তু বাবা, মনে মনে মথুরা-বৃন্দাবনেই যাওয়া চলে। গোয়ালিয়র যেতে অর্থের প্রয়োজন হয়। একে কপর্দকহীন পরিব্রাজক সন্ন্যাসী আমি, তায় আবার অসুখে পড়েছিলাম। বদরীনাথ থেকে নেমে যোশীমঠ পর্যন্ত আসবার পর একেবারে চলৎশক্তিহীন অবস্থা আমার। সেখানেই পড়ে ছিলাম কয়েকদিন।

শেষের দিকে স্বতঃই বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর। মুখখানাও দেখি যে ম্লান হয়ে গিয়েছে।

আমার ভাব সেইজন্যই কুণ্ঠিত; কিছু-একটা বলবার জন্যই বললাম, তারপর? এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন তো?

না বাবা।

তবে?

আমার ওই প্রশ্ন শুনেই তৎক্ষণাৎ একেবারে যেন বদলে গেলেন সন্ন্যাসী। চোখমুখ তাঁর দেখতে দেখতে আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উৎফুল্লকণ্ঠে তিনি বললেন, সুস্থ না হলেও এখন আর কোন দুর্ভাবনা নেই আমার। ভগবান আমাকে আশ্রয় জুটিয়ে দিয়েছেন—একেবারে অন্নপূর্ণার কোল।

আমি বিহ্বলের মত জিজ্ঞাসা করলাম, তার মানে?

তিনি উত্তরে বললেন, ওই যা বললাম ঠিক তাই। না না বাবা—তার চেয়েও বেশী। একসঙ্গেই অন্নপূর্ণা ও লক্ষ্মী দুজনেই কোল দিয়েছেন আমাকে। এখনও তো মায়ের কোলেই রয়েছি আমি।

বলেন কি সন্ন্যাসী—ইনি প্রকৃতিস্থ আছেন তো!

নিশ্চয়ই আমার মুখের ভাবেও মনের সন্দেহ প্রকাশ হয়ে পড়েছিল এবং সন্ন্যাসীর চোখ এড়ায় নি তা। হাসতে হাসতে তিনি আবার বললেন, না বাবা—আমি রুগ্ন হলেও পাগল হই নি। তোমরা তো তাদের দেখ নি! দেখলে তোমরাও মানবে যে, কৈলাসের অন্নপূর্ণা ও বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী রূপ ধরে এসেছেন আমার কাছে। আমি একসঙ্গেই পেয়েছি মা ও মেয়ে। তাঁরাও সম্পর্কে তাই—জননী আর কন্যা।

চমকে উঠলাম আমি। তাড়াতাড়ি জিতেনের মুখের দিকে চেয়েই বুঝতে পারলাম যে, সেও আমার মতই চমকে উঠেছে। পুনরায় স্বামীজীর মুখের দিকে চেয়ে রুদ্ধনিঃশ্বাসে আমি বললাম, আরও একটু স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলুন তো!

বুঝিয়েই বললেন তিনি, তবে হাসিমুখে আর নয়। গম্ভীর হয়ে গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন, সব কথা কি বুঝিয়ে বলা যায় বাবা? না, নিজেই বুঝতে পারে কেউ? যোশীমঠের এক চটির বারান্দায় চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়েছিলাম আমি। কত যাত্রী ওখান দিয়ে এল গেল—আমার দিকে চেয়েও দেখল না কেউ। কিন্তু পরশু দুপুরের দিকে বদরীনাথ দর্শন করে যোশীমঠে নেমে এলেন সেই মা আর তাঁর মেয়ে। আমার দু-চারটি কথা শোনবার পরেই একেবারে কোল পেতে দিয়েছেন তাঁরা। আমাকে কাণ্ডিতে বসিয়ে এনেছিলেন পিপুল-কুঠি পর্যন্ত। তারপর তো মোটরের পথ। সমাদর করে তাঁদের বাড়িতে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা।—বলতে বলতে সন্ন্যাসীর চোখের কোলে যেন জল দেখা দিল।

কিন্তু শুনতে শুনতে আমার বুকের মধ্যে মনে হল যেন ঝড় উঠেছে। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আবার আমি তাকালাম জিতেনের মুখের দিকে। কিন্তু তার পূর্বেই জিতেনের চঞ্চল চোখ দুটি গিয়ে পড়েছিল বাইরের জনতার উপর। আমি তার দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করবার পূর্বেই উল্লাসে প্রায় চীৎকার করে উঠল সে: আর সন্দেহ নেই, মণিদা—ওই তো মাসীমা।

আর একটু চেষ্টা করতেই আমিও স্পষ্ট দেখলাম—টিকিট-ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে গঙ্গোত্রীর জননী তাঁর দুই চোখের ব্যাকুল দৃষ্টি দিয়ে কি যেন খুঁজছেন।

জিতেন আমাকে একটি ঠেলা দিয়ে আবার বললে, নামুন, মণিদা। অন্ততঃ এ গাড়িতে আমাদের যাওয়া হবে না।

বৃদ্ধা যে চোখে ভাল দেখতে পান না তা অবশ্য আমার অজানা নয়। কিন্তু তাই কি একমাত্র, এমন কি প্রধান কারণও হতে পারে তাঁর ওই আচরণের?

একসঙ্গেই তিনজন আমরা তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি, কিন্তু আমাদের দুজনকে যেন দেখতেই পেলেন না তিনি। আর যে সত্যানন্দ আশ্রমের সঙ্গে মাত্র দুদিনের পরিচয় তাঁর, সোজা তাঁরই দিকে দু-পা এগিয়ে গিয়ে তিনি বললেন, আমাকে বলে আস নি কেন, বাবা? তোমাকে খুঁজে খুঁজে আমি যে এদিকে হয়রান।

সত্যানন্দ কুণ্ঠিত হাসিমুখে উত্তর দিলেন, দূরে কোথাও যাই নি তো আমি। মিছামিছি, মাতাজী, কেন আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছ?

উত্তর হল: খুঁজব না! তোমাকে কি বাবা বিশ্বাস আছে! একবার নিজের ঘর থেকে পালিয়েছ তুমি, দ্বিতীয়বার আশ্রম থেকে। আমার কাছ থেকেও আবার যে তুমি পালিয়ে যাবে না, তা আমি মানি কেমন করে!

আশ্চর্য! সবিস্ময়ে লক্ষ্য করছিলাম আমি। কেদারের পথে কতবার কত কাছে থেকে তো এই মহিলাকে দেখেছি আমি। তাঁর মুখে মিষ্টি কথাও নিশ্চয়ই শুনেছি। তবু তখন অধিকাংশ সময়েই এঁকে আমি দেখতাম যেন বিমর্ষ, না হয় উদাসীন। কিন্তু আজ দেখছি একেবারে ভিন্ন মূর্তি তাঁর। সত্যানন্দের সঙ্গে তিনি কথা বললেন ভর্ৎসনার ভাষায়, কিন্তু কণ্ঠ থেকে তাঁর মধু যেন ঝরে পড়ছে। বৃদ্ধার সাদাটে নিষ্প্রভ চোখ দুটি এখন মনে হয় যেন চকচক করছে।

সেই মুখের দিকে চেয়ে সত্যানন্দ উত্তরে হাসিমুখে বললেন, মাফ কর, মাতাজী। দূরে যাবার ইচ্ছাই ছিল না আমার। ঘর থেকে বাইরে এসে চটির সামনেই দাঁড়িয়েছিলাম আমি। হঠাৎ এই দুজন চেনা লোককে দেখে একটু এগিয়ে গিয়েছিলাম কথা বলতে। গিয়ে শুনি যে এঁরাও তোমাকে চেনেন।

বহুবচন ব্যবহার করলেও স্বামীজী আঙুল দিয়ে জিতেনকেই দেখিয়ে দিয়েছিলেন। আর জিতেনও পরক্ষণেই বৃদ্ধার দিকে দু-পা এগিয়ে গিয়ে সহাস্যকণ্ঠে বললে, কেমন আছেন, মাসীমা? চিনতে পারছেন তো?

বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া ওই সম্ভাষণের।

ভুল করেছিলাম আমি, মনে মনে একটু অবিচারই করেছিলাম বৃদ্ধার

প্রতি। আমাদের তিনি মোটেই উপেক্ষা করেন নি—আসলে দুজনের কারও উপর এতক্ষণ চোখই পড়ে নি তাঁর। এখন প্রথমে জিতেনকে এবং পরে আমাকে চিনতে পেরেই উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন তিনি। বললেন, এই যে তোমরাও এসে গিয়েছ দেখছি! কি ভাগ্য আমার যে, আবার তোমাদের দেখা পেলাম। তা কোন্ দিক থেকে এলে তোমরা? বদরীনাথ দর্শন করে ফিরে এলে নাকি? না সবে চলেছ সে দিকে?

জিতেন তাঁকে বুঝিয়ে বললে আমাদের অবস্থা, এক সপ্তাহ বনবাসের মোটামুটি কাহিনীও। শুনে বৃদ্ধা বললেন, তাই বল। সেইজন্যই তো পথে আর আমাদের দেখা হল না।

মাথাটাকে দুলিয়ে দুলিয়ে, টেনে টেনে কথা বললেন বৃদ্ধা। তারপর একবার আমার ও একবার জিতেনের মুখের দিকে চেয়ে হাসতে থাকলেন পরম আত্মীয়ের মত।

অগত্যা আমিই জিজ্ঞাসা করলাম, গঙ্গোত্রী কোথায়?

শুনে যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠলেন বৃদ্ধা। যেন মস্ত একটা অপরাধ করে ফেলে তার জন্য মার্জনা চাইছেন এমনি ভঙ্গিতে তিনি বললেন, এই দেখ—কি ভোলা মন আমার। আসল কথাটাই ফেলে রেখে আগড়-বাগড় বকে যাচ্ছি। গঙ্গোত্রী যাবে আবার কোথায়—চটির ঘরে বসে আমাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে ঠিক করছে। চল, চল তার কাছে। পথে কতবার যে সে তোমাদের কথা বলেছে!

ফুটপাত থেকে এক ধাপ নীচেই ছোট একটি দোতলা বাড়ির কাছে গিয়ে গলা চড়িয়ে তিনি ডাকলেন: গঙ্গোত্রী, ও গঙ্গোত্রী—আও বেটি। দেখো ফির কিসকা দর্শন মিল গয়া।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল দোতলার বারান্দায় গঙ্গোত্রীর পরিচিত মুখখানি। পরক্ষণেই আমার কানে এল তাঁরও উল্লসিত কণ্ঠস্বর: আঃ হাঃ—চাচাজী আ গয়ে! কিতনা ভাগ্য হ্যায় মেরা। বদরীনাথজীকী কৃপা। নহী তো ফির ভেট ক্যায়সে হোতা। হম তো অভী চলহ রহী থী।

বলতে বলতে তরতর করে নীচে নেমে এলেন তিনি।

জিতেনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই আবার উচ্ছ্বসিত সম্ভাষণ গঙ্গোত্রীর: য়হ দেখিয়ে—লছমন ভাইয়া ভী আজ সাথহীমে হ্যায়, তব হনুমানজী কাঁহা জায়েগা। বহুত ভাগ্য হ্যায় মেরা, ফির সবকা দর্শন মিল গয়া।

নির্মল কৌতুক আর আন্তরিক আনন্দ যেন উপচে পড়ছে গঙ্গোত্রীর চোখ দুটি থেকে ; হাসি তাঁর সারা মুখেই। জিতেনও উৎফুল্ল ; হাসছে আমাদের বাহাদুরও।

'দোতলার ঘরে গিয়ে দেখি যে, তাঁদের জিনিসপত্র পরিপাটি করে গুছিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ। তবু বাস ছাড়তে ঘণ্টাদুয়েক দেরি আছে শুনে মেঝের উপর গোল হয়ে বসলাম আমরা। প্রথমেই গঙ্গোত্রীর মুখে শুনলাম তাঁদের ভ্রমণ-কাহিনী। আমরা যা অনুমান করেছিলাম তাই ঘটেছে—মোটরের পথে চলেছেন বলেই এরই মধ্যে বদরীবিশাল দর্শন করে আবার এই পর্যন্ত ফিরে আসতে পেরেছেন তাঁরা।

গঙ্গোত্রীর জননীর মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমি : বদরীনাথজীকে কেমন দেখলেন ?

শুনেই দুই হাত জোড় করে উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন বৃদ্ধা। আমার প্রশ্নের ওই তাঁর উত্তর। কিন্তু গঙ্গোত্রী হাসতে হাসতে আমাকে বললেন, সে বড় অদ্ভুত ব্যাপার, চাচা। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দর্শন করলেও দুজন যাত্রী এক রকম দেখে না বদরীবিশালকে। মা বলেন যে তিনি বিষ্ণুজী দর্শন করেছেন, স্বামীজী মহারাজ দর্শন করেছেন শিবমূর্তি।

মনে কৌতূহলের চেয়ে কৌতুকই বেশী জাগে এরকম কথা শুনলে। সুতরাং আমি গঙ্গোত্রীর মুখের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললাম, আর তুমি কি দর্শন করলে ?

শুনে শব্দ করেই হেসে উঠলেন গঙ্গোত্রী। আর সেই হাসির ফাঁকে ফাঁকে বললেন, আমার, চাচা, পাপ-চোখ। আমি দেখলাম, কেবল কিরীট-কবচ-কুণ্ডল—সোনাদানা মণিমুক্তার বাহার।

হাসি হাসি মুখে আমাদের আলাপ শুনছিলেন স্বামী সত্যানন্দ। এবার তিনি মন্তব্য করলেন সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে : 'যাদৃশী ভাবনার্যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'।

শুনে হো হো করে হেসে উঠল জিতেন। আমার মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, তা হলে মণিদা সেখানে গেলে দেখবেন যে প্রকাণ্ড একটি কড়াতে আলু-কাঁচকলার ডালনা রাঁধা হচ্ছে।

গঙ্গোত্রী ঈষৎ বিস্মিত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়েছেন দেখে জিতেন

হাসি একটু কমিয়ে তার [illegible] ব্যাখ্যা শুনিয়ে দিল সকলকে : একটুও বাড়িয়ে বলি নি আমি। তীর্থে এলে কি হবে! মণিদা তো দিনরাত কেবল রান্না আর খাওয়ার কথাই ভাবছেন। এই চামৌলিতে ঢুকেই উনি এক ঘণ্টা ধরে প্রায় এক বিয়ের বাজার করলেন ; নতুন এক গন্ধমাদন চাপিয়েছেন বেচারা বাহাদুরের পিঠে। তা ছাড়া মণিদার নিজের ঝোলা খুঁজে দেখুন, দেখবেন যে সেরখানেক কোটা তরকারী আছে তার মধ্যে।

অভিযোগ মিথ্যে নয়। সুতরাং হাসিমুখেই সেটি হজম করে আমি বললাম, ভালনা হোক, ভাল হোক, ভাগ্যে থাকলে তা তো দেখব বদরীনাথের মন্দিরে উপস্থিত হবার পর। আপাততঃ আমার দুর্ভাবনা অন্য কারণে। পায়ে এখন যে রকম ব্যথা বোধ করছি তাতে সামনের ত্রিশ মাইল পাড়ি দিতে পারব কি না, সেই সম্বন্ধেই মনে সন্দেহ আমার।

গঙ্গোত্রীর উদ্বিগ্ন প্রশ্নের উত্তরে বুঝিয়ে বললাম ব্যাপারটা। শুনে অভিজ্ঞ জনের মতই আমাকে পরামর্শ দিলেন তিনি : ঝুঁকি না নিয়ে পিপুলকুঠিতেই একটি ডাণ্ডি বা কাণ্ডি ভাড়া করবেন, চাচা। আমার মা তো জ্বর-গায়েও ওই কাণ্ডির দৌলতেই প্রায় একশো মাইল পাড়ি দিয়ে এলেন। আর এই স্বামীজী—যোশীমঠ থেকে পিপুলকুঠি পর্যন্ত তাঁকে তো কাণ্ডিতেই এনেছি আমরা।

আবার স্বামীজীকে তাকিয়ে দেখলাম আমি ; পরক্ষণেই তাকালাম সোজা গঙ্গোত্রীর চোখের দিকে।

গল্প করতে করতেও কয়েকবার এমনি নীরবে স্বামীজীর সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছি গঙ্গোত্রীকে। এবার বুঝি বুঝতে পারলেন তিনি যে, শুধু ওইটুকু শুনেই কৌতূহল আমার তৃপ্ত হয় নি। না হলে ওই কৌশলটুকু তিনি করতে গেলেন কেন?

নিজের হাত-ঘড়িটির দিকে একবার তাকিয়ে দেখেই হঠাৎ একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, শেষবার আপনার উপর একটু জুলুম করব, চাচা। চলুন আমার সঙ্গে একটা চায়ের দোকানে। দেখি, একটু স্পেশাল চা আপনাকে খাওয়াতে পারি কি না।

খাওয়াটা নেহাতই উপলক্ষ। আমার জানবার ইচ্ছাটা মিটল বাকি সুজনের চোখের আড়ালে যাবার পর।

প্রথমে আমাকেই প্রশ্ন করেছিলেন গঙ্গোত্রী: স্বামীজী মহারাজকে, চাচা, আপনারাও চেনেন নাকি?

ঘাড় নেড়ে স্বীকার করলাম দেখে গঙ্গোত্রী আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় দেখা হয়েছিল আপনাদের?

উত্তর দিলাম, হরিদ্বারে। একটি আশ্রম দেখতে গিয়েছিলাম আমরা। সেখানেই এই স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হল।

কথাবার্তাও হয়েছে নাকি?—আবার জিজ্ঞাসা করলেন গঙ্গোত্রী।

সত্য উত্তরটা তৎক্ষণাৎ মুখে এল না আমার। এঁরা যাঁকে সমাদর করে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন বলে বুঝতে পেরেছি তাঁর সম্বন্ধে গঙ্গোত্রীর মনে কোন বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করতে চাই নে আমি। সুতরাং এবারও গোপনে জিতেনের গা টিপে তাকে সতর্ক করে দিয়ে গঙ্গোত্রীকে আমি বললাম, অতি সামান্য—সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যেমন হয়ে থাকে।

তারপর অল্প একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু তোমরা ওঁকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ যে?

উত্তরে গঙ্গোত্রী যেন লজ্জিত হয়ে বললেন, আমি কেন? ও খেয়াল তো আমার মায়ের।

চমকে উঠলাম আমি। তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল ওই গঙ্গোত্রীর মুখ থেকেই তাঁর জননীর যে অসুস্থ আবেশের বর্ণনা আমি শুনেছিলাম। যে স্বামী তাঁর মৃত, তাঁকেই সন্ন্যাসীর সাজে জীবন্ত ফিরে পাবার অদম্য ও অসংশোধনীয় আকাঙ্ক্ষার কথা। সন্দেহ জাগল আমার মনে—বৃদ্ধার সেই আকাঙ্ক্ষাই তৃপ্ত হয়েছে নাকি এই সত্যানন্দ আশ্রমকে দেখে?

কিন্তু গঙ্গোত্রী দৃঢ়স্বরে অস্বীকার করলেন তা: না চাচাজী। অতটুকু জ্ঞানবুদ্ধি আমার মায়ের এখনও আছে। তবে তাঁর মনের আর একটি দুর্বল দ্বার ধাক্কা দিয়ে ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করেছেন স্বামীজী।

আমার মনের মধ্যে উদগ্র কৌতূহল সত্ত্বেও নির্বাক আমি।

কোন উত্তর না পেয়ে গঙ্গোত্রীই আবার জিজ্ঞাসা করলেন, স্বামীজী মহারাজ তাঁর নিজের কথা আপনাকে কিছু বলেছেন নাকি?

গঙ্গোত্রীর দৃষ্টি এড়িয়ে উত্তর দিলাম আমি, একবার বুঝি শুনেছিলাম যে, নিজস্ব একটি আশ্রম করবার ইচ্ছা আছে স্বামীজীর।

আর কোন কথা? ওঁর পূর্বাশ্রমের কোন সংবাদ?

গঙ্গোত্রীর কণ্ঠে আগ্রহের সুর। কিন্তু আমি নিজে ওই কথাটাই বলতে চাই নে তাঁকে। মিথ্যা কথা মুখে উচ্চারণ করতে না পেরে ঘাড় নেড়ে অস্বীকার করলাম।

বোধ করি সেই জন্যই আরও মন খুলে বললেন গঙ্গোত্রী : আমরা শুনেছি। ভারি অদ্ভুত মানুষ উনি। আপনজন সকলকে ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে ঢুকেছিলেন গিয়ে এক আশ্রমে। কিন্তু সেখানে আর ভাল লাগছে না স্বামীজীর। অথচ নিজের বাড়িতেও ফিরে যাবার মুখ নেই তাঁর।

গঙ্গোত্রীর মনের মধ্যেই বলবার তাগিদ রয়েছে বুঝে আমি চুপ করেই অপেক্ষা করছিলাম। ধৈর্যের পুরস্কার হাতে হাতেই পেয়ে গেলাম। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকবার পর ফিক্ করে হেসে ফেললেন গঙ্গোত্রী ; হাসতে হাসতেই বললেন, উনি কি বললেন, জানেন চাচাজী ? বললেন যে, যে স্ত্রী-সন্তানকে বঞ্চিত করে নিজের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের সব টাকাও উনি আশ্রমে দান করেছেন, এখন আশ্রম থেকে রিক্তহস্তে পালিয়ে এসে আবার সেই স্ত্রী-পুত্রের কাছেই উনি কোন্ মুখে ভরণপোষণ দাবি করবেন ?

বোগাস—

হঠাৎ জিতেনের তিক্ত কণ্ঠস্বর কানে এল আমার। ঋষিকেশেও সমালোচনায় ঠিক এই কথাই ব্যবহার করেছিল জিতেন। আর তেমনি তিক্ত এখনও তার কণ্ঠস্বর। বুঝলাম যে ব্যর্থ হয়েছে আমার সতর্কবাণী—জিতেনের মনের কথা সংযমের অর্গল ভেঙে তার মুখে প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

কিন্তু আশ্চর্য ! ওই সমালোচনারই প্রতিক্রিয়া গঙ্গোত্রীর আচরণ ও কথায় যা প্রকাশ পেল তা সম্পূর্ণ বিপরীত। দেখি যে, নিজের প্রগল্ভতার জন্য নিজেই বুঝি লজ্জিত গঙ্গোত্রী—অনুতাপের সঙ্গে করুণারও উদয় হয়েছে তাঁর মনে। আহতের মত জিতেনের মুখের দিকে চেয়ে প্রতিবাদের ভাষা করুণ সুরে প্রকাশ করলেন তিনি : না ভাইয়া, তা নয়। আমি বলি যে, ট্রাজিক—বড়ই করুণ স্বামীজী মহারাজের ব্যর্থ জীবন।

ও তো আমারই মনের কথা—ঋষিকেশে গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী শোনবার পর ঠিক ওই কথাই মনে হয়েছিল আমার। গঙ্গোত্রীর মুখে আমারই অন্তরের প্রতিধ্বনি শুনে আমি স্মিতমুখে তাঁর দিকে চেয়ে বললাম, তুমি ঠিকই ধরেছ মা, আমারও তাই মনে হয়।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়—গঙ্গোত্রীর ওই গভীর মানবতাবোধের উৎসও

পরক্ষণেই উদ্ঘাটিত হল। সমবেদনায় করুণ মুখখানিতে বিষণ্ণ একটু হাসি ফুটিয়ে গঙ্গোত্রী আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, স্বামীজীকে দেখবার পর থেকেই গুরুদেবের আর একটি রচনা বারবার মনে পড়েছে আমার।

সেই বরাহ্ম চটির কাছে দাঁড়িয়ে যা করেছিলেন গঙ্গোত্রী, এবার আর তা করলেন না তিনি। হিন্দী গদ্যে ভাব প্রকাশ করে বাংলা পদ্যের ভাষা ও ছন্দ খুঁজে বের করতে বললেন না আমাকে। নিজেই তিনি আবৃত্তি করলেন :

"ঘরেও নহে পারেও নহে যে জন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে।"

সেই আর একদিনের মতই ভাঙা ভাঙা উচ্চারণ, সে দিনের মতই কুণ্ঠিত মুখের ভাব গঙ্গোত্রীর। কিন্তু আমি দেখছি যেন মন্ত্রশক্তির প্রভাবে সেই কুণ্ঠিত মুখখানিও দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

বোধ করি আমার চোখের দৃষ্টিতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লক্ষ্য করেই গঙ্গোত্রী বিব্রতভাবে চোখ নামিয়ে নিলেন। লজ্জিত স্বরে তিনি বললেন, কি জানি, ঠিক আবৃত্তি হল কি না। সেই কতকাল আগে পড়েছিলাম আমার এক বাঙালী সখীর কাছে। ইদানীং তো একেবারেই চর্চা নেই—ভুলেই গিয়েছি সব।

উত্তর দেবার সুযোগই পেলাম না আমি। জিতেন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, চর্চা না থাকলেও রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাব ও ভাষা যা আপনি মনে রেখেছেন, আমি বাঙালী হয়েও তা পারি নি। লাইন দুটি তো আমার একেবারেই মনে ছিল না, যদিও আপনার মুখে শোনবার পরেই বুঝতে পেরেছি যে, কোনদিন সম্পূর্ণ কবিতাটিই নিশ্চয়ই পড়েছিলাম আমি।

এ মন্তব্যের উত্তর দিলেন না গঙ্গোত্রী। বরং সলজ্জ আনন্দের যেটুকু রক্তিমা তাঁর মুখের উপর ফুটে উঠেছিল সেটুকু চেষ্টা করেই মুছে ফেলে আগের কথারই সূত্র ধরে তিনি বললেন, সত্যি চাচা, স্বামীজীর মুখের দিকে আমি চাইতে পারি নে। তাকালেই মনে হয়—ওই যে গুরুদেব লিখেছেন : "দিনের আলো যার ফুরলো সাঁজের আলো জ্বলল না"—ইনিই বুঝি সেই।

এও আমারই মনের কথা। একটি উদ্গত দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে রেখে আমি বললাম, বেঁচে থাক, মা। ঘাটের কিনারা থেকে এমন হতভাগ্যকে নিজের ঘরে ডেকে এনে বড় ভাল কাজ করেছ তুমি।

কিন্তু ও-কথার প্রতিবাদ করলেন গঙ্গোত্রী। তবে বড় মধুর সেই প্রতিবাদ। মুখের হাসি লুকবার জন্যই বুঝি খুব জোরে মাথাটা তাঁর ঝেঁকে তিনি বললেন, সে, চাচা, আমি নই,—আমার মা। তিনিই জেদ করলেন স্বামীজীকে সঙ্গে নেবার জন্য।

আমি স্মিতমুখে বললাম, ও একই কথা হল। তবে পরের কথাও একটু ভেবেছ কি? একটি আশ্রম করে দেবে নাকি স্বামীজীকে?

এবার পরিহাসে তরল আমার কণ্ঠস্বর। চেষ্টা করেও শেষের দিকে হাসি চাপতে পারি নি আমি। আমার মুখের দিকে চেয়ে গঙ্গোত্রীও হাসি হাসি মুখে বললেন, সে কথা আমার মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। কিন্তু শুনে মা কি বললেন আপনি অনুমান করতে পারেন তা?

ভাবেই প্রকাশ করলাম যে, পারি নে। তখন গঙ্গোত্রী আবার বললেন, মাকে তখন দেখলে আপনি, চাচা, তাকে চিনতেই পারতেন না। আমিও দেখে একেবারে তাজ্জব বনে গিয়েছিলাম। আমি আশ্রমের কথা বলতেই প্রথমে তো তিনি চটে লাল। কিন্তু তার পরেই একেবারে বদলে গেল মায়ের মুখের ভাব। চোর-চোর খেলতে গিয়ে খেলার সাথীকে জব্দ করবার জন্য কাঁচা বয়সের মেয়েরা চোখমুখের হাসি চেপে যেমন ফিসফিস করে কথা বলে তেমনিভাবে মা আমাকে বললেন—আমাদের বাড়িতে ওঁকে নিয়ে যাচ্ছি দুদিন আটকে রাখবার জন্য। গোপনে ওঁর স্ত্রীকে-ছেলেকে খবর পাঠিয়ে দেব। তারা কি খবর পেলে না এসে থাকতে পারবে!

উত্তর দিতে বেশ একটু দেরি হল আমার। কিন্তু স্নিগ্ধকণ্ঠে বললাম, ওঠ গঙ্গোত্রী। তোমার মাকে প্রণাম করব আমি।

পায়ে হাত দিয়েই প্রণাম করেছিলাম গঙ্গোত্রীর জননীকে। গঙ্গোত্রীর মাথায় হাত দিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করলাম যখন স্বামী সত্যানন্দ আশ্রমকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

গাড়ি ছাড়বার পূর্বে আবার নিমন্ত্রণ করলেন গঙ্গোত্রী কোন এক সুযোগে আলমোড়ায় গিয়ে তাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করতে।

বিদায়ের বেদনা জীবনে এত তীব্রভাবে কমই অনুভব করেছি আমি। শেষের দিকে চুপ করেই ছিলাম। অন্যমনস্ক ভাব আমার। হঠাৎ যে শব্দ

শুনে চমকে উঠ[illegible] তা[illegible] মোটর ইঞ্জিনের কর্কশ গর্জন নয়, গঙ্গোত্রীর কণ্ঠে যেন অলকনন্দার উচ্ছল কলকল্লোল।

জিতেনের মুখের উপর সহাস্য একটি কটাক্ষ নিক্ষেপ করে গঙ্গোত্রী বললেন, সত্যিই কৈলাস যদি দেখতে যান তবে, ভাইয়া, অবশ্যই আলমোড়া হয়ে যাবেন। ওই কঠিন পথের সব খবর আপনাকে লিখে দেব আমি। আর আপনাদের মত সাথী পেলে হয়তো আমারও ঝোঁক চাপবে আর একবার কৈলাস দর্শন করবার।

॥ ২০ ॥

ন মাইল দূরে পিপুলকুঠি। ভারত-তিব্বত সীমান্তে অন্যতম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। তিব্বতের ভোটকম্বল ও চামর, বাঘ-হরিণের চামড়া, শিলাজতু ইত্যাদি পণ্য দিয়ে ঠাসা এক একটি দোকান। বিনিময়ে তিব্বতে যেতে পারে যে-সব ভারতীয় পণ্য, অনেক দোকানেই তাদেরও প্রাচুর্য চোখে পড়বার মত। যাত্রীর প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী এবং সাজসজ্জা তো আছেই। চামৌলির চেয়েও জমজমাট শহর এই পিপুলকুঠি।

কিন্তু সেই শহরেই এ কি অভ্যর্থনা আমাদের! যেমন প্রকৃতির, মানুষেরও তেমনি অপ্রসন্ন মুখ। অতিথির অভ্যর্থনা দূরে থাক, আশ্রয়ই পাই নে কোথাও।

কালীকমলীওয়ালার প্রকাণ্ড ধর্মশালার দীনহীন সাজ দেখে এবং ভিতরে স্থানাভাব আছে শুনে বাস থেকে নেমে আমার ভাঙা পা নিয়েই জিতেনের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে তিন-চারটি চটি পর্যবেক্ষণ করলাম। কিন্তু সর্বত্রই শুনি স্থানাভাব। একজন প্রথমে আশ্বাস দিয়ে কিছুক্ষণ তার বারান্দায় বসিয়ে রাখবার পর শেষ পর্যন্ত বিদায় করে দিল আমাদের দলটিকে। অগত্যা ধর্মশালাই আশ্রয়।

সেই তো বাবারই প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এ কি দুরবস্থা তার! শহর ও পল্লীজীবনের যা যা অবাঞ্ছনীয় কেবল সেইগুলিরই যেন বিশৃঙ্খল একটি স্তূপ। দোতলার সিঁড়ির মুখেই শৌচাগার। সিঁড়ির দুই ধারে সুদীর্ঘ ঢালা বারান্দা থাকলেও তা অতিক্রম করে পায়রার খোপের মত যে-সব প্রকোষ্ঠে গিয়ে প্রবেশ করতে হয় তাদের প্রত্যেকটিরই দ্বার বলতে কেবলই ওই প্রবেশপথ। তাতে চৌকাঠই নেই, তা কবাট থাকবে কোথায়? মাটির মেঝে মনে হয় যেন এই উত্তরাখণ্ডেরই রিলিফ ম্যাপ এক একখানি—এমনি অসমান পাথর ও মাটির বিন্যাস। বাতায়ন দূরে থাক, গবাক্ষও নেই বিপরীত দিকের দেয়ালে। অপরিচ্ছন্ন অন্ধকার ঘরগুলি মনে হয় যেন এক একটি অন্ধকূপ।

অথচ এহেন ধর্মশালাতেও গিজগিজ করছে লোক। পাঁতি পাঁতি করে খুঁজেও কোন ঘরেই জায়গা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত যেখানে আশ্রয় নিলাম আমরা, তাকে চিলে-ঘর বলা যেতে পারে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাঁ দিকের ঢালা বারান্দায় যাবার পথ বই নয়। তবু আয়তন একটু বেশী আছে দেখে

ওখানেই দেয়ালের পাশে তাড়াতাড়ি আমাদের বিছানা ছুটি পেতে অর্ধেকটা পথ অধিকার করলাম আমরা। তারপর ছুটে নেমে গেলাম একটু আলো এবং খোলা হাওয়ার সন্ধানে।

কিন্তু হাওয়ার অভাব না থাকলেও বাইরে খোলা আকাশের নীচেও আলো কোথায়! আকাশ যে ইতিমধ্যে আরও কালো হয়ে গিয়েছে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পেয়েছিলাম পথেই, এখন দেখি যে বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। প্রকৃতির ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছে আমার নিজের দেহটিও। চা খাবার উদ্দেশ্যে পাশের একটি দোকানে যেতে যেতেই বেশ বুঝতে পারলাম যে, আমার ডান পায়ের সেই খচখচ ব্যাথাটা একটুও কমে নি।

চামৌলিতে গঙ্গোত্রীদের বিদায় দেবার পর থেকেই মনটা তো খারাপ হয়েই ছিল। তার ওপর এত সব প্রতিকূল অবস্থার চাপে আরও মুষড়ে পড়ল তা।

অনুকূল নয় কোন অবস্থাই। উপরের ওই মেঘে-ঢাকা আকাশের মতই গোমড়া মুখ দেখি চায়ের দোকানদারদেরও একজনের। অভ্যাসমত স্বতন্ত্র একটু পরিচ্ছন্ন গরম জল চেয়েছিলাম তার কাছে। কারণটা মন দিয়ে শুনলেও পরে কিন্তু সে বিরক্ত হয়েই উত্তর দিল: অত ঝামেলা করতে পারব না বাবু। আমার তৈরি চা অন্য পাঁচজনে যা খাচ্ছে তাই খাও তো খাও, নইলে অন্য দোকান দেখ।

হোটেলের অভ্যর্থনা ও সরবরাহ ওর চেয়ে উন্নত নয়।

ধর্মশালার নীচের তলায় রান্নাঘরে ঢুকতেও প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং জিতেন স্থানীয় একটি হোটেলেই রাত্রে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত হয়েও শুনি যে ভাত তখনও উনানের উপরে চাপানোই হয় নি। আধঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করবার পর অপরিচ্ছন্ন টেবিলের উপর আহার্যহিসাবে যা পাওয়া গেল তা ভোজ্য হলেও খাদ্য নয়। কেদারক্ষেত্রে অপরিপক্ব খিচুড়িও যে সমাদর ও শ্রদ্ধার সংমিশ্রণে দেবভোগ্য পরমান্ন হয়ে উঠেছিল তার বিন্দুমাত্রও নেই এই মহাব্যস্ত পেশাদার ব্যবসায়ীর বাক্য বা আচরণে। নিছক পেটের তাগিদেই কিছু গলাধঃকরণ করতে হল। অমন যে বাহাদুর, তারও অরুচি না থাকলেও অতৃপ্তি প্রায় আমাদেরই মত।

হোটেলের বাইরে অবস্থা আরও প্রতিকূল। ইতিমধ্যে ধারাবর্ষণ শুরু

হয়েছে [illegible]চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। [illegible] দোকানে মিটমিট করে আলো জলছে বলেই অন্যত্র অন্ধকার মনে হয় আরও গভীর। টর্চ জ্বেলে পথ ঠিক করলাম। কিন্তু প্রতি পদক্ষেপেই ভাঙা পায়ে খচখচ ব্যথাটা লাগছেই।

ইতিমধ্যে ধর্মশালায় আমাদের দখল-করা জায়গাটুকুতে যা ঘটেছে তা আমি কেবল যে কল্পনা করতে পারি নি তা নয়, এখন চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না আমার। সঙ্কীর্ণ ওই চিলে-ঘরের মধ্যেই দেখি যে, আরও দুজন লোক এসে অবশিষ্ট জায়গাটুকু দখল করে সটান শুয়ে পড়েছে। পরিপাটি করে পাতা আমাদের শয্যা দুখানিও অন্য একরকম আক্রমণে বেদখল হয় হয় অবস্থা।

দর্শনের পূর্বেই স্পর্শ। বেশ মোটা এক ফোঁটা জল এসে পড়ল আমার প্রায় ব্রহ্মতালুর উপরে। ভয়ের নয়, শীতের শিহরণ অনুভব করলাম আমার সর্ব অঙ্গে; আর সেই জন্যই চোখের দৃষ্টিও আমার অত্যন্ত সতর্ক ও তীক্ষ্ন হয়ে উঠল।

ততক্ষণে বাহাদুর একটি মোমবাতি জ্বালিয়েছে। সেই অল্প আলোতে দেখি যে, টালির ছাদের চার-পাঁচটি ফুটোর ভিতর দিয়ে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টির জল পড়ছে আমাদের শয্যার উপরেও। ইতিমধ্যেই বেশ ভিজেও গিয়েছে লেপ-তোশকের কোন কোন জায়গা।

ঘটনা শোকাবহ হলেও শোক করবার সময় নেই তখন। শাস্ত্রবাক্য— সর্বনাশ উপস্থিত হলে পণ্ডিতেরা অন্ততঃ অর্ধেক রক্ষা করতে চেষ্টা করবেন। আমরাও তাই করলাম। জিতেন ক্ষিপ্রহস্তে দুটি শয্যাই গুটিয়ে ফেলল। ঠিক কোন্ কোন্ জায়গায় যে উপর থেকে বৃষ্টি-জলের ফোঁটা পড়ছে তা মিনিট দশেকের মধ্যেই বুঝে নিল সে। তারপর থালা-ঘটিবাটি যা আমাদের সঙ্গে ছিল তা থেকে এক একটি পাত্র নির্দিষ্ট এক এক স্থানে রেখে জলের নিম্নগতি সাফল্যের সঙ্গেই প্রতিরোধ করল সে। অবশিষ্ট যে নিরাপদ স্থানটুকু পাওয়া গেল সেখানেই অতঃপর সংক্ষিপ্ত শয্যা রচনা হল আমাদের।

কিন্তু সুপ্তি কোথায়? বৃষ্টির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করে সার্থকভাবেই তা প্রয়োগ করেছি আমরা। কিন্তু ধ্বনির আক্রমণ প্রতিরোধ করবার উপায় তো জানা নেই। খাঁটি ধর্মশালা এটি। খোল-করতাল সহযোগে সাড়ম্বর ও সমবেত কণ্ঠের তুমুল কীর্তনধ্বনি ঠিক আমাদের

পাশের ঘর থেকেই [illegible] পড়ছে আমাদের উপর। লেপ দিয়ে আগেই গা ঢেকেছিলাম, এখন কানও ঢাকলাম। তথাপি স্বরব্রহ্মের আক্রমণ থেকে নিস্তার নেই। আর ঘুম আসছে না বলেই দেহের বিভিন্ন স্থানে এত কণ্ডূয়ন নাকি ?

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হানল জিতেন। আমি ক্রমাগতই উসখুস করছি বুঝে একসময়ে সে আমার গায়ে একটি ঠেলা দিয়ে বললে, বর্বরতা থেকে সভ্যতায় ফিরে এসেছেন বলে চামৌলিতে আপনি উৎসব করতে চেয়েছিলেন। এখানে পাশের ঘরে উৎসবই তো হচ্ছে। তাতে এত বিরক্ত হচ্ছেন কেন ?

কেবল কি বিরক্তি! দৈহিক যন্ত্রণাও ততক্ষণে অসহ্য হয়ে উঠেছে। আমি উঠে বসে বললাম, একটা আলো জ্বাল তো জিতেন। দেখি, কিসে এত কামড়াচ্ছে।

টর্চের অল্প আলোতেই যা চোখে পড়ল তা অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্য।

প্রথমে ইঁদুর-ছানা বলেই ভ্রম হয়েছিল—এতবড় আকৃতি এক একটির। চশমা পরে ভাল করে তাকিয়ে দেখি যে, ওরা আসলে ছারপোকাই—হিমালয়ের প্রাণী বলেই বুঝি অনুপাত রক্ষার জন্য প্রকৃতি অতবড় আকার দিয়েছেন ওদের। দুই শয্যারই সর্বত্র পিপীলিকার মত ছড়িয়ে পড়েছে তারা। ইতিমধ্যেই আমাদের রক্ত কিছু কিছু যে তাদের প্রত্যেকেরই পেটে গিয়েছে তারও প্রমাণ পেলাম বিছানার চাদরের অঙ্গেই। আমার অজানতে আমারই কণ্ডূয়নশীল অঙ্গুলির নিষ্পেষণে যে কটি প্রাণী মারা পড়েছে তাদের পেটের ভিতর থেকে বেরিয়ে আমার দেহের তাজা রক্ত আমারই শয্যায় ছড়িয়ে পড়েছে। প্রায় যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা প্রত্যক্ষ করে বিস্ফারিত চোখ আমাদের দুজনেরই।

মোমবাতি জ্বালিয়ে তার উজ্জ্বলতর আলোতে দেখা গেল যে, দেয়ালের গা বেয়ে অগণিত পিপীলিকা-বাহিনীর মত অসংখ্য ধারায় অমনি অতিকায় ছারপোকারা সব নেমে আসছে হয় উপরের ছাদ, নয়তো ওই দেয়ালেরই কোন কোন ফুটো বা ফাটল থেকে। সবকটি বাহিনীরই লক্ষ্য যেন আমাদেরই দুগ্ধফেননিভ শয্যা দুটি, যদিও আরও তিনটি লোক এই ঘরের মেঝেতেই কালো কম্বলের উপর শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছিলাম আমরা। কিন্তু বৃথা চেষ্টা রক্তবাজের

মত ও [illegible] বিন্দু [illegible] ... [illegible] হয় না বটে, তবে আক্ষরিক অর্থেই ওরা যে অসংখ্য। মেরে শেষ করা যাচ্ছে না ওই ছারপোকা-বাহিনীকে। আর গায়ের জোরে ওরা আমাদের সঙ্গে না পারলেও কৌশলের প্রতিযোগিতায় ওদের জুড়ি আমরা নই। আলো দেখলেই পালাতে জানে ওরা, আর টালির ছাদওয়ালা এই ভাঙা বাড়িতে ওদের লুকবার জায়গারও অভাব নেই। আমরা আলো নিভিয়ে শুলেই গোপন গুহা থেকে বেরিয়ে এসে আবার আক্রমণ শুরু করে ওরা।

পুনঃপুনঃ শরশয্যার যন্ত্রণা আর সহ্য করতে না পেরে শেষে আমরাই রণে ভঙ্গ দিয়ে বাইরে বারান্দায় গিয়ে বসলাম।

পাশের ঘরে কীর্তন তখন থেমে গিয়েছে, তথাপি ঘুমবার অনুকূল নয় পরিবেশ। অসহায়ের মত আমি বললাম, তিন সপ্তাহেরও বেশী হিমালয়ে ভ্রমণ করছি আমরা—এত দুর্ভোগ অন্য কোথাও ভুগতে হয় নি। আজ এমন কেন হল তা বলতে পার জিতেন?

উত্তর না দিয়ে আর একটি প্রশ্ন করল সে: আপনার কথাই সত্য হল নাকি, মণিদা? পথে সাপটাকে মেরেছি বলেই এখানে এই দুর্ভোগ নাকি আমাদের?

অন্ধকারে মুখ দেখা গেল না তার, কিন্তু স্পষ্টই আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর। শুনে এত কষ্টের মধ্যেও হাসি পেল আমার। বললাম, একটি সাপ মারবার প্রতিফল যদি এই হয় তাহলে আজ রাত্রে শত শত ছারপোকা মারবার শাস্তি কি হতে পারে তা কল্পনা করতে পার তুমি?

সে চেষ্টা করল না জিতেন। কিন্তু অপ্রসন্ন কণ্ঠেই সে বললে, নালা-চটি থেকে ফিরে গেলেই ভাল ছিল।

আমি এবার তার পিঠের উপর আলগোছে একটি হাত রেখে বললাম, তা যখন করা হয় নি, তখন প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়া ছাড়া আর কি উপায় আছে এখন? যোগীর মত, এস, বসে বসেই একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করা যাক।

শেষ পর্যন্ত ওই সঙ্কীর্ণ বারান্দাতেই ভূমিশয্যায় একটু ঘুমিয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু তাতে কি আর বিশ্রাম হয়। সকালে দেহে রাজ্যের ক্লান্তি আর মনে অবসাদ।

তথাপি সকালে উঠেই বাহাদুরকে যাত্রার জন্য তৈরি হবার হুকুম দিল জিতেন।

তিক্ত কণ্ঠস্বর তার। বুঝলাম যে, আজ সামনের টানের চেয়ে পিছনের ঠেলাই তার দেহ ও মনের উপর বেশী কাজ করছে। গত রাত্রির দুর্ভোগের স্মৃতিই কেবল নয়, বর্তমানের অস্বস্তিও প্রবল। দিনের আলোতে আবার স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে ওই ধর্মশালা ও তার পরিবেশের সমস্ত কদর্যতা। শুরু হয়েছে ছারপোকার বদলে মানুষের উৎপাত। কলরবে মুখর হয়ে উঠেছে সমস্ত বাড়িখানি। আমাদের অধিকৃত চিলে-ঘরখানির ভিতর দিয়ে পায়ে কাদা বা কাঁধে মোট নিয়ে অবিরাম স্রোতে নরনারী যারা যাতায়াত করছে তাদের চোখের দৃষ্টিতে একটুও নিমন্ত্রণ নেই আমাদের জন্য। নিমন্ত্রণ নেই চায়ের কোন দোকানেও; কলতলাতেও ঠেলাঠেলি। সমগ্রভাবে এই পিপুলকুঠি যেন প্রতিমুহূর্তেই ঠেলে বহিষ্কার করতে চায় আমাদের মত দুজন অবাঞ্ছিত অতিথিকে।

কিন্তু সামনে বদরীনাথেরই বা আমন্ত্রণ কোথায়? সামনের পথ অবশ্য এখান থেকে চোখে পড়ে না। তবে প্রকৃতি যে বাধা দিচ্ছেন তাতে 'ঢাক-ঢাক গুড়-গুড়' নেই। তেমন ধারাবর্ষণ এখন না থাকলেও বৃষ্টি পড়ছেই। তার সঙ্গে আজ আবার একটু হাওয়াও আছে। কালো আকাশে প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে মাঝে মাঝে বরং দেখা যায় ভ্রূকুটির হুঁশিয়ারি।

কঠিনতর প্রতিবন্ধকতা রয়েছে আমার নিজেরই ডান পায়ের গুল্ফ-সন্ধিতে।

গত রাত্রে অনেকক্ষণ ধরে সেই ব্যথার জায়গাটাতে আয়োডেক্স মালিশ করো ম, কিন্তু কোন উপকারই হয় নি। চলতে গেলেই খচখচ করছে সেই জায়গাটা।

তিক্ত কবিরাজী পাচনের মত চা খেতে খেতে মনটা আমার যখন আরও তিক্ত হয়ে গিয়েছে তখনই পথের ওপারে ধর্মশালার বারান্দা থেকে জিতেনের অসহিষ্ণু কণ্ঠের ডাক কানে এল আমার: শীগগির আসুন মণিদা, বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে যে!

তাকিয়ে দেখি যে, ইতিমধ্যে নিজেও সে রণসাজে সেজে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে গিয়েই ডান দিকের বারান্দায় চোখে পড়ল

কয়েকটি পরিচিত মুখ। কেদারনাথেই দেখেছিলাম এই দলটিকে। অনেক কুলি সঙ্গে নিয়ে ডাণ্ডি ও কাণ্ডিতে চড়ে এসেছিলেন পাটনার স্ত্রী-পুরুষ চার-পাঁচ জন। প্রৌঢ় বয়স সকলেরই। তাদেরই একজন পুরুষ হাসিমুখে সম্ভাষণ করলেন আমাকে।

আমরা তখনই রওনা হব শুনে দুই চোখ বড় করে তিনি বললেন, অমন কাজও করবেন না বাঙালীবাবু। কাল বিকেল থেকেই যাত্রা আমরা স্থগিত রেখেছি এই দুর্যোগের জন্য। বৃষ্টি থাকলে পাহাড়ের পথে চলতে নেই।

পিপুলকুঠিতে প্রবেশ করবার পর এই প্রথম বন্ধুভাবের সম্ভাষণ শুনলাম; সুরও আন্তরিক মঙ্গলকামনার। নিজেদের ঘরে এসে আমি জিতেনকে বললাম কথাটা।

কিন্তু সতর্কবাণী কানেও তুলল না সে; বললে, এখানে থাকার চেয়ে জাহান্নমে যাওয়াও ভাল।

একটু যা তার উদ্বেগ তা কেবল আমার ভাঙা পাখানির জন্য। আমি যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছি তাই লক্ষ্য করে সে বললে, একটা কাণ্ডি নিলে হয় না?

ম্লান মতন একটু হেসে আমি উত্তর দিলাম, অতিরিক্ত টাকা কি সঙ্গে আছে? নিজের পায়ের উপর নির্ভর করা ছাড়া এখন অন্য উপায় নেই।

একটু থেমে আমি সসঙ্কোচে আবার বললাম, তুমি, জিতেন, আজ আমার একটু কাছে কাছেই থেকো। তাহলেই পায়ে জোর পাব আমি।

হয়তো চেষ্টাও করেছিল জিতেন। কিন্তু ওই যে একবার বলেছি, পায়ে বুঝি পাখা আছে তার। ক্রমশঃ আমাকে ছেড়ে এগিয়ে যেতে যেতে আধ-ঘণ্টাখানেক পর একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

বাহাদুর অবশ্য আমার পিছনে আছে। তবু মনে আমার স্বস্তি নেই। বৃষ্টি মাথায় করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পথ চলছি। মনটা আমার উপরের আকাশের মতই ভার ভার আজ। প্রতি পদক্ষেপেই আমি যে বদরীনারায়ণের মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি তার জন্য একটুও উৎসাহ বোধ হচ্ছে না। বরং মনে আমার বিরক্তির সঙ্গে কেমন যেন একটা উদ্বেগ।

অনুকূল অবস্থা কেবল একটি। পথ ভাল—খুবই ভাল।

পায়দলমাগ নয়, বাস-সড়ক। পিছনে পিপুলকুঠি পর্যন্ত যেমন, এদিকেও তেমনি, যদিও যাত্রী নিয়ে মোটর-বাসগুলির নিয়মিত যাতায়াত এখনও শুরু হয় নি। অন্ততঃ যোশীমঠ পর্যন্ত মোটর চালাবার পরিকল্পনা আছে উত্তর-প্রদেশের সরকারের। তখন বুঝতে পারি নি, কিন্তু এখন ১৯৬০ সালে বেশ বুঝতে পারছি যে, ভারত-তিব্বত সীমান্তের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা দৃঢ়তর করবার জন্যই ওই আয়োজন হয়েছে। কেবল যাত্রীবাহী বাস নয়, সামরিক বিভাগের ভারি ভারি ট্রাক চালাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এই নতুন মোটর-সড়ক। সুতরাং যেমন দৃঢ়, তেমনি প্রশস্ত এই পথ। আর বিস্ময়কর বিন্যাস। এমন ভাবে টেনে টেনে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পথ যে চড়াই-উতরাই প্রায় বোঝাই যায় না।

পথ সুগম বলেই ভাঙা পা ও ভাঙা মন নিয়েও চলতে পারছিলাম আমি। কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই ভেংচি কাটল সেই আমার একমাত্র বন্ধুও। আর তাও অনেকক্ষণ পর একজন মানুষ দেখে মনটা যেই আমার একটু তাজা হয়েছে ঠিক তখনই।

বিপরীত দিক থেকে একা একা আসছিলেন একজন। গৃহস্থের বেশ, কিন্তু সাধু-সাধু রূপ। সৌম্যমূর্তি প্রৌঢ় যাত্রী। কাঁচা-পাকা লম্বা চুল মাথায়, তেমনি লম্বা দাড়ি বুক পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। আমার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে স্মিতমুখে সম্ভাষণ করলেন তিনি: জয় বদরীবিশালকী!

খুশী হয়ে আমিও প্রতি-সম্ভাষণ করলাম। কিন্তু তার পরেই একটি যেন বজ্র হানলেন তিনি—দুঃসংবাদের বজ্র।

বললেন, একটু সাবধান হয়ে পথ চলো বাবু—সামনে ধস নামছে।

ধস! ভদ্রলোকের মুখ থেকে শুনলাম কথাটা, না আমারই বুকের মধ্যে ধপ করে একটা শব্দ হল! বিহ্বলের মত জিজ্ঞাসা করলাম আমি, কি নামছে? কি বললেন আপনি?

সামনে পাহাড় ভাঙছে,—উত্তরে বললেন ভদ্রলোক: পথ কঠিন, তাই সাবধানে চলতে বললাম।

তথাপি মূঢ়ের মত আমি তার মুখের দিকে চেয়ে আছি দেখে একটু হেসে আশ্বাসের সুরেই তিনি আবার বললেন, অত ভাবনা কেন? তেমন কিছু নয়—আমিও তো সেই পথেই এলাম। বদরীবিশালের নাম করতে করতে চলে যাও। তবে সাবধানে পা ফেলো।

মুখ ফিরিয়ে দেখি যে, ভারবাহী বাহাদুর ঠিক আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আমাদের কথাবার্তা শুনছে। অসহিষ্ণু মুখের ভাব তার। শুভানুধ্যায়ী যাত্রীটিকে পথ ছেড়ে দেবার পর আমাকে উদ্দেশ করে সে বললে, চলিয়ে বাবুজী, হমনে পহলেহী শুনা থা।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, তবে আগে বলিস নি কেন?

বাহাদুরও বিরক্ত হয়েই উত্তর দিল: ক্যা হোতা বোলনেসে? ঠহরনেকা মন নহী থা ছোটাবাবুকা।

তরুর মত সহিষ্ণু যে বাহাদুর, তার আজ এত অসহিষ্ণুতা কেন? বিস্মিত হলাম আমি। কিন্তু পিঠের উপর বোঝা রয়েছে তার—প্রায় গরু-মোষের মতই এখন তার আকার। মুখ দেখা যায় না। কি যে সে ভাবছে তা সঠিক বোঝা গেল না।

এদিকে বৃষ্টির বেগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে পথের চেহারা এবং পরিবেশের রূপও। সড়ক এদিকে আর তত প্রশস্ত নয়, দেখতেও কাঁচা সড়কের মত। সেই মোটর-সড়ক হলেও অনুমান করলাম যে, এদিকে নির্মাণকার্য তখনও সম্পূর্ণ হয় নি। আজ উতরাই পথেই বরাবর চলে এসেছি। এখন যেখানে আছি সেটা মনে হল যে পাহাড়ের কোল নয়, চরণের কাছাকাছি। আমরা আরও একটু অগ্রসর হবার পর স্পষ্টই বোঝা গেল তা। সামনেই দেখা গেল ছোট একটি পুল যার মানে এই যে, অবিলম্বেই একটি পাহাড় অতিক্রম করে আর একটি পাহাড়ের গোড়ায় গিয়ে পৌঁছব আমরা। আমাদের বাঁ দিকে অলকনন্দার খদ। ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে এখন মাঝে মাঝে দেখা যায় তাকে।

ওদিকে কেদারের পথের সঙ্গে কতকটা সাদৃশ্য আছে এ পথের। তবে বৈসাদৃশ্যও বেশ প্রকট। ওদিকে দু-এক ফার্লং পরে পরেই রীতিমত চটি না হোক, দু-একটি চায়ের দোকান অবশ্যই পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু পিপুলকুঠি ছাড়বার পর এ পথে তেমন একটিও চোখে পড়ল না।

একমাত্র ভরসা নিজের মনেরই একটা কল্পনার মধ্যে। পাণ্ডার দেওয়া গাইড বইতে দেখেছি যে পিপুলকুঠির পরেই গড়ুরগঙ্গা চটি। সেটি আবার বদরীপথের স্বনামধন্য তীর্থ। পাহাড়ের উপর থেকে নেমে যাত্রীসড়ক কেটে দু ভাগ করে যে পাগলাঝোরা খানিকটা নীচে অলকনন্দার সঙ্গে গিয়ে মিলেছে তারই নাম গড়ুরগঙ্গা। বিষ্ণুর বাহন পক্ষীরাজ গড়ুর নাকি সেই নদীর তীরে

দীর্ঘকাল তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে গড়ুরগঙ্গা নাম হয়েছে তার। সে গঙ্গায় স্নান করলে অসীম পুণ্য লাভ হয়; অতিরিক্ত মহামূল্য একটি পার্থিব লাভও নাকি হয় গড়ুরগঙ্গার গর্ভ থেকে কোন একটি নুড়ি কুড়িয়ে ঘরে নিয়ে যেতে পারলে। গড়ুরের বরেই নাকি সর্পবিষের অব্যর্থ প্রতিষেধক হয়ে আছে গড়ুরগঙ্গা নদীর গর্ভস্থ প্রত্যেকটি নুড়িই।

কিন্তু সে নুড়ি সংগ্রহ করবার জন্য কোন আগ্রহ ছিল না আমার মনে, এমন দুর্যোগের দিনে গড়ুর-গঙ্গায় স্নান করবার ইচ্ছাও নয়। তীর্থ নয়, চটির জন্য আগ্রহ আমার। আশা ছিল যে, অমন একটি নামকরা তীর্থের এলাকায় প্রবেশ করলেই দেখতে পাব যে, কোন একটি দোকানে গরম চা প্রস্তুত করে জিতেন আমার জন্য অপেক্ষা করছে। ভরসাও ছিল যে, তখন তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করাতে পারব আজকের দিনটা সেখানেই থেকে যাবার জন্য।

কিন্তু সে আশাও নির্মূল হল আমার।

সামনের পুলটি পার হয়ে লোকালয়ের আভাস যেখানে পেলাম সে জায়গাটার নাম গড়ুর চটি হলেও প্রসিদ্ধ গড়ুরগঙ্গা তীর্থ তা নয়। এখানে না আছে মন্দির, না ধর্মশালা। চটিও নেই। একটিমাত্র দীনহীন কুটিরে সামান্য কয়েকটি বিবর্ণ আসবাব ও একটি জলন্ত উনান নিয়ে বুড়োমতন যে গাড়োয়ালী দোকানদার ছবির গড়ুরের ভঙ্গিতেই উপবেশন করে একা একা তন্দ্রাসুখ উপভোগ করছিল, তার কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম যে, আমারই মত দীর্ঘদেহ একজন বাঙালী যাত্রী আধঘণ্টাখানেক পূর্বে এই পথ দিয়েই যোশীমঠের দিকে এগিয়ে গিয়েছে।

সুতরাং থাকা চলে না এখানে। আর থাকবার উপযুক্তও নয় জায়গাটা। গড়ুরগঙ্গা চটি এটি নয়। নতুন মোটর-সড়কের ধারে একেবারে নতুন একটি চটির পত্তন হয়েছে মাত্র। এখানে জলের কল নেই, শৌচাগার নেই, দ্বিতীয় আর কোন দোকান নেই, একটিমাত্র দোকানঘরের চারিদিকেই সুদৃঢ় বেড়াও নেই। কাজেই এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ই নেই আমাদের।

এগিয়েই চললাম।

একটি নয়, এক টানে দুটি বাঁক—কতকটা ইংরেজী "S" অক্ষরের মত।

সবটা দূরত্ব এক ফার্লং হবে হয়তো। একটি যেন কিম্ভূতকিমাকার অতিকায় জীবের অনাহারক্লিষ্ট উদর ও অতিস্ফীত বুক। দোকান থেকেই সোজা গিয়ে নামতে হয়েছিল তার জঠরগহ্বরে। সেখানে আর একটি ছোট পুল। সেটি পার হয়ে উঠলাম গিয়ে সেই অতি-স্ফীত বক্ষের উপরে। ইংরেজী "S" অক্ষরের দ্বিতীয় অর্ধবৃত্ত সেটি। অমনি বাঁক সামনে আরও আছে কি না, তাই ভাবতে ভাবতে পায়ের সেই খচখচ ব্যথাটা নিয়ে আজকের পথে এই প্রথম কষ্টসাধ্য একটি চড়াই ভাঙছিলাম। কিন্তু বাঁকের বঙ্কিমত্বটুকু অতিক্রম করতেই সামনে দেখলাম যেন তেপান্তরের মাঠ। পাহাড় ও পথের যে দৃশ্য এইমাত্র পিছনে ফেলে এলাম, সামনে একেবারে তার বিপরীত।

মোটেই তেমন উঁচু নয় আমার ডান দিকের ন্যাড়া পাহাড়টি। সামনে অনেক দূর পর্যন্ত একটানা দৈর্ঘ ও চ্যাপটা গঠন দেখলে মনে হয় যে, ওটি পাহাড় না হয়ে আধুনিক বন্যানিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার একটি 'ড্যাম'ও হতে পারে। বাঁ দিকে অলকনন্দার খদ, কিন্তু তুলনায় অনেক বেশী গভীর এবং খাড়া। তার অপর তীরে ধূসর রেখার মত যে পাহাড়শ্রেণী দেখা যাচ্ছে তা মনে হয় যেন খুবই নীচু। সামনে আমার প্রসারিত দৃষ্টিকে বাধা দেবার জন্য না আছে কোন পাহাড়, না গাছপালা। পায়ের নীচের সড়ক কাঁচা হলেও বেশ প্রশস্ত; আর এ জায়গাটাতে মোটেই তরঙ্গায়িত গঠন নয় তার। হঠাৎ যেন সমতল ভূমিতে নেমে এসেছি বলে ভ্রম হয়। আর সেইজন্যই মনে হল যেন মাঠ।

কিন্তু উল্লাসে নেচে উঠল না আমার মন। বরং সে যেন ভয়ে বিহ্বল। মনে হচ্ছে যেন জনহীন প্রান্তরে পথহারা এক পথিক আমি—সামনে ধুধু করছে তেপান্তরের মাঠ। বৃষ্টির বেগ আগেই তো বৃদ্ধি পেয়েছিল। এখন, এই খোলা জায়গায় আমার দুর্বল দেহের উপর চারিদিক থেকে মুষলধারার আক্রমণ অসহ্য হয়ে উঠল। পায়ে ক্যানভাসের জুতো ও পশমী মোজা আগেই ভিজে গিয়েছিল, এখন গায়ের বর্ষাতিও দেখি যে জল আর প্রতিরোধ করতে পারছে না। বেশ শীত লাগছে এখন। পায়ের সেই খচখচ ব্যথাটার জন্য দ্রুতবেগে চলতে পারছি নে বলে আরও বেশী।

এমনি যখন দেহ ও মনের অবস্থা আমার, তখন হঠাৎ একটা আওয়াজ কানে এল—গুম গুম গুম—

ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়ালাম। পিছনে তাকিয়ে দেখি যে বাহাদুরও থমকে দাঁড়িয়েছে। বিহ্বলের মত জিজ্ঞাসা করলাম তাকে: ও কি রে?

সে বললে, ধস।

আর একবার চমকে উঠলাম। মাথার ছাতাটাকে চোখের সামনে থেকে পিছন দিকে একটু সরিয়ে দুই চোখ বড় করে তাকালাম একবার সামনে ও একবার আমার দক্ষিণের পাহাড়টির ভোঁতা চূড়ার দিকে। দৃষ্টি অতদূর পর্যন্ত তুলতেও হল না। ইতিমধ্যেই প্রত্যক্ষ-দর্শন। হালকা কুয়াশার পাতলা চাদরখানা ছাড়া মাঝে আর কোন আবরণ নেই। একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি আমরা—আমি আর ধস।

॥ ২১ ॥

তাহলে এই সেই ভয়ঙ্কর!

সামনে হাত দশেক দূরেই পথ দেখি যে আর পথ নেই। রাশিরাশি মাটি, কাদা, সমূল ও সপল্লব ছোট ছোট গাছ এবং ছোট মাঝারি বড়—নানা আকারের শিলা স্তূপাকারে এসে পড়েছে পথের উপর। নিশ্চল স্তূপ নয় তা, যেন প্রাণ আছে তার। আছে অঙ্গসঞ্চালন, আছে গতি। অথবা কোন এক অদৃশ্য চুল্লীর আগুনে প্রকাণ্ড একটি কটাহের মধ্যে টগবগ করে ফুটছে কাদামাটি পাথরের ঘনীভূত ক্বাথ—থেকে থেকে উপছে পড়ছে এবং সেই গতির বেগেই বাঁ দিকে প্রশস্ত এই মোটর-সড়কের সীমা অতিক্রম করে সশব্দে গড়িয়ে পড়ছে গিয়ে অলকনন্দার পাতালস্পর্শী গহ্বরে।

আরও ভয়ঙ্কর আমার ডান দিকের পাহাড়ের রূপ। হিমাদ্রি স্থাণু নন এখানে, গতির বেগে চঞ্চল হয়ে উঠেছে তার প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। তবে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ হয়ে আকাশে উড়ে যাবার আবেগ তার নয়, ওদিকে মন্দাকিনী এবং এদিকে অলকনন্দার সঙ্গে মিলনের জন্য যে আবেগ ইতিপূর্বে থেকে থেকেই লক্ষ্য করেছি অবতরণশীলা প্রত্যেকটি নির্ঝরিণীর অবিরাম গতিছন্দে, তেমনি উচ্ছল না হলেও ঠিক সেই আবেগই দেখছি আমার ডাইনে এই পাহাড়টির বিপুল বক্ষের অবিরাম কম্পনের ভয়ঙ্কর গন্ডছন্দেও। বুঝি অলকনন্দার কোলের জন্যই তারও এই ক্রন্দন, তার গতিও নীচের দিকেই। ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে ভেঙে লুটিয়ে পড়ছে পাহাড় পথের উপর এবং সেখান থেকে গড়িয়ে বাঁ দিকে খদের পথে অলকনন্দার কোলের দিকে।

ঝুরঝুর করে ভাঙছে, ফটফট করে শব্দ হচ্ছে পতনোন্মুখ শিলার সঙ্গে অন্যান্য শিলার সংঘর্ষের। গোড়া থেকে শিখর পর্যন্ত যতটুকু চোখে পড়ে, তার সর্বত্রই ওই একই লীলা। যেন একই সুরে বাঁধা হয়েছে বিপুলায়তন একটি যন্ত্র, একই ছন্দে গতি এই পাহাড়টির অগণিত কম্পমান অঙ্গপ্রত্যঙ্গের। সম্মিলিত ঐকতান—গুম গুম গুম।

নটরাজের প্রলয় নাচন মনে করতে পারি নে। জটাজাল আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয় নি, ফুঁ পড়ে নি প্রলয় বিষাণে, তাথৈ তাথৈ পদক্ষেপের আভাসও নেই দৃশ্য বা শব্দের মধ্যে। ঢিমে তাল ও বিলম্বিত লয়ের মৃদুকম্পন শুধু বুঝি

তার [illegible]। তথাপি তারই ছন্দে ছন্দে নিয়তির মত দুর্বার, সর্পের মত ক্রূর ও মৃত্যুর মত নিশ্চিত ধ্বংস ধীরে ধীরে গ্রাস করছে মিশ্রিত শিলা ও মাটির বিপুলায়তন এই অচল পাহাড়টিকে।

অদৃশ্য ক্ষয় ও অনিয়ন্ত্রিত ছন্দ। কিন্তু পতন অবিরাম। তাকালেই বেশ বোঝা যায় যে, চোখে দেখা যাচ্ছে যে কালো কালো পাথরগুলি, তাদের প্রত্যেকটিই যেন এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে কোন এক অদৃশ্য সেনাপতির নির্দেশ পেলেই লাফিয়ে পড়বার জন্য। পড়ছেও থেকে থেকেই। কিন্তু একটিও একা নয়। গড়িয়ে পড়তে পড়তে ডাইনে বাঁয়ে সামনে যাকে যাকে সে ছুঁয়ে যেতে পারছে, তাদেরও সবাইকেই সঙ্গে নিয়ে পড়বে সে। সেই সঙ্গে পথের উপর টেনে নামাবে সে ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি-কাদা এবং অগুনতি পাথরকুচিও।

নামাচ্ছেও তাই। ধস ধস শব্দে পড়ছে বলেই ধস নাম হয়েছে পাহাড়ের এই ধ্বংসলীলার। কিন্তু মাঝে মাঝে অধিকতর তীক্ষ্ণ ধ্বনিও কানে আসে। গতির বেগে এবং অন্যান্য শিলাখণ্ডের সঙ্গে সংঘাতের ফলে প্রকাণ্ড এক একখানি পাথরও মাঝপথেই বোমার মত সশব্দে ফেটে চৌচির হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

পাহাড়ের ভাঙন শুরু হবার পর কখন যে কি আকারের ধস নামবে কে বলতে পারে তা? অন্ততঃ আমার মত অনভিজ্ঞেরা তো নিশ্চয়ই নয়।

বিস্ফারিত চোখ দুটির সন্ত্রস্ত দৃষ্টি দিয়ে কিছুক্ষণ ওই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখবার পর আমি পিছনে বাহাদুরের দিকে চেয়ে অসহায়ের মত বললাম, এই জায়গাটা কেমন করে পার হব বাহাদুর?

নীরসকণ্ঠে উত্তর দিল সে: পার না হয়ে আর উপায় কি? খদের দিকটা ঘেঁষে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে হবে।

তার চেয়ে ফিরে গেলে হয় না?

সো ক্যায়সে হো সকতা বাবুজী? ছোটাবাবুজী তো আগে বাড় গয়ে।

ঠিকই তো। এতক্ষণে স্মরণ হল আমার যে, জিতেন আমাদের সঙ্গে নেই এবং সে একা একাই এগিয়ে গিয়েছে। অসাধারণ মোটেই নয় তার এ হেন ব্যবহার। তবু—

এক নিমেষে সবগুলি দৃষ্টান্তই মনে পড়ে গেল। প্রথমে প্ররোচনা এবং পরে অনেক আশ্বাস দিয়ে যে ব্যক্তি ঘর থেকে আমাকে হিমালয়ের এই দুর্গম

পথে টেনে এনেছে তার কর্তব্যচ্যুতির দৃষ্টান্ত হিসাবে ওদের কোনটিই উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু আজ একেবারে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে সে। চরম অবিবেচনা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার অকাট্য প্রমাণ তার আজকের আচরণ। আমাদের মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে তার নির্মম উপেক্ষারও। এমন একটি ভয়ঙ্কর জায়গাতেও সে যে তার পিছিয়ে-পড়া সাথীটির জন্য অপেক্ষা করবে না, তা ইতিপূর্বের অত সব তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আমি কল্পনা করতে পারি নি। আশা ও আস্থা ছিল বলেই মৃত্যুর ওই ভয়ঙ্কর ফাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে বাহাদুরের তিক্ত কণ্ঠের নির্মম সত্যকথন শোনবার পর রাগের চেয়ে ক্ষোভ ও দুঃখই বেশী আমার মনে। অকস্মাৎ আমার চোখ ফেটে জল এল যেন। অসহায়ের মত আমি বাহাদুরকে বললাম, কি করা যাবে তাহলে?

বাহাদুর আড়চোখে আর একবার তাকিয়ে দেখল তার সামনে ও ডানদিকে সেই অবিরাম ধস নামার দৃশ্য। তারপর আমাকে উৎসাহ দেবার জন্যই সে বললে, কি আর করা যাবে—এগিয়ে চলুন। ছোটবাবুও তো এই পথেই গিয়েছেন।

তাও ঠিক।

জিতেনের অবাঞ্ছিত আচরণের অপর দিক ওটা। অভিমানে অন্ধ হয়ে এতক্ষণ দেখতে পাই নি, এখন সে দিকটাও চোখে পড়ল আমার। দেখে সাহস এবং উৎসাহও একটু পেলাম। যে জায়গাটা কিছুক্ষণ পূর্বেই জিতেন পার হয়ে গিয়েছে, সেটা আমরা পার হতে পারব না কেন? আমার চোখের সামনে যে পাহাড়টা ভাঙছে তার দৈর্ঘ্যও তো খুব বেশী নয়।

আরও একটু উৎসাহ পেলাম অন্য একটি দৃশ্য থেকে। এতক্ষণ পর সেটিও এই প্রথম চোখে পড়ল আমার। গজ দশেক দূরেই অটুট রয়েছে যে পাহাড়গুলি তাদের গোড়ার কাছে এই সড়কের উপরেই তিনজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলাম। তাদের একজন দেখতে একটু বাবুমতন, অপর দুজনের হাতে কোদাল না শাবল কি সব যন্ত্র—যা থেকে অনুমান করা যায় যে, তারা খেটে-খাওয়া মানুষ। তিনজনেই দেখি যে আমাদের দিকে চেয়ে আছে—মনে হল যেন মুচকি মুচকি হাসছেও।

তাতেই নিজে আমি ভয় পেয়েছি বলে একটু লজ্জাও হল আমার। আবার বাহাদুরের দিকে চেয়ে আমি বললাম, তাই হোক তা হলে। আমি এগই—তুমি এস আমার পিছনে পিছনে। জয় বদরীবিশালকী—

বলে সামনের দিকে পাও বাড়িয়েছিলাম আমি। কিন্তু তখনই বাহাদুর খপ করে আমার একটা হাত চেপে ধরল ; মুখে সে ব্যাকুল স্বরে বললে, ঠহরো বাবুজী। ওইসে মত্‌ চলনা।

তারপর একটা কাণ্ড করল সে।

খানিকটা পিছিয়ে গেল বাহাদুর। কিছুক্ষণ বুঝি সে খুঁজল জুতসই একখানা উঁচু পাথর ; কিন্তু তা না পেয়ে অবশেষে কুশলী খেলোয়াড়ের মত পথের উপরেই চিত হয়ে শুয়ে কপালের ফাঁস আলগা করে পিঠের বোঝা মাটিতে ফেলে আবার উঠে দাঁড়াল সে। ফিরে এসে আমার হাত ধরল ; তারপর বললে, অব চলো বাবুজী।

সেই অতিকায় উত্তপ্ত কটাহে ফুটন্ত কাথের মত উত্তাল, কিন্তু বরফের মত শীতল ভগ্নস্তূপের উপর দিয়ে অস্থির চরণে সতর্ক গতি আমার। পাহাড় তখনও ভাঙছেই ; গড়গড় শব্দে ছোট মতন একটি পাথর অনেকখানি মাটি-কাদা সঙ্গে নিয়ে একবার এসে পড়ল প্রায় আমার পায়ের কাছেই। তের দোসর এখন ভয় ; হাত-পা আমার কাঁপছে ওই যাকে বলে বাতাহত বেতলতার মত ; মুখ শুকিয়ে গিয়েছে ; আর প্রতি পদক্ষেপে খচখচ ব্যথা লাগছে ডান পায়ের গুল্‌ফ-সন্ধির কাছে।

তবে জায়গাটা দুজনে নিরাপদেই পার হয়ে এলাম। সেই তিনটি লোকের কাছাকাছি আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে বাহাদুর আবার ওই ভগ্নস্তূপ অতিক্রম করে ফিরে গেল তার মোট—মানে আমাদের মালপত্রের কাছে।

লোক তিনজনের একজন কি যেন আমাকে জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু তখন আমার সম্পূর্ণ মনোযোগ গিয়েছে বাহাদুরের দিকে। দেখলাম যে কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা করবার পর সেই প্রায় দেড়-মণী বোঝাটা পিঠে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে ; যথাসম্ভব চোখ উঁচু করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ডানদিকের সেই ভয়ঙ্কর টলমলে পাহাড়টির দিকে। তারপর চোখ নামিয়ে নিজেও সে ওই পাহাড়টির মতই টলতে টলতে আমার দিকে অগ্রসর হল।

রুদ্ধনিঃশ্বাসে চেয়ে দেখছি আমি—অথবা কিছুই দেখছি নে। হঠাৎ কানে এল আমার—হুঁশিয়ার জওয়ান।

পরমুহূর্তেই কাতর একটি চিৎকারের সঙ্গে বিকট একটি নাদ—ঝপাৎ—ঠং। মাটিতে পড়ে গিয়েছে বাহাদুর। মোটটি তার পিঠ থেকে ছিটকে

পড়েছে। কিন্তু আয়তনে সেই বোটের চেয়েও অনেক বড় মাটি-কাদা পাথরের বিরাট একটি তাল হড়হড় করে নেমে এসে চেপে বসেছে বাহাদুরের পিঠে বা বুকের উপর। সম্পূর্ণ মানুষটিকে আর দেখা যায় না। কেবল একখানা তার হাতই বুঝি দেখলাম কিছু একটা আঁকড়ে ধরবার ব্যর্থ চেষ্টায় ভগ্নস্তূপের উপরে উঠে এসেছে। আর যেন কানে এল আমার তার আর্তকণ্ঠের কাতর আহ্বান—বাবুজী!

কিন্তু এ কি বৈসাদৃশ্য! আরও একটি ধ্বনি কানে এল যেন পৈশাচিক অট্টহাস্য। ওই সঙ্গে দুটি শব্দও—শালা নেপালী!

বিশ্বাসই হয় না যে কানে শুনেছি আমি। তবে চমকে উঠে পাশের দিকে তাকাবার পর আর অবিশ্বাসও করতে পারি নে। দেখলাম যে সেই তিনজন লোক প্রায় আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ভূপতিত বাহাদুরের দিকে চেয়ে দাঁত বের করে হাসছে।

নারকীয় দৃশ্য। কিন্তু ওখানে ও অবস্থায় ওই তিনটি লোকই যে আমার একমাত্র আশ্বাস ও আশ্রয়। তাদেরই উদ্দেশ্যে দুই হাত জোড় করে আমি বললাম, বদরীবিশালকা নামপর—বচাও উস আদমীকো।

উত্তর হল: আদমী আপ কিসকো বলতে হ্যায়? ওহ তো এক বুদ্ধু জানোয়ার। উসকো তো মরণা হী চাহিয়ে।

অবিশ্বাস্য আচরণ মানুষের প্রতি মানুষের। ঘৃণায় বিরক্তিতে রি-রি করছে আমার মন। তথাপি আমার দুই হাতে আমি হাত জড়িয়ে ধরলাম সবচেয়ে কাছের লোকটির; কাতর অনুনয়ের স্বরে বললাম, সব মানছি। তবে এখন নয় ভাইয়া—গালমন্দ যা ইচ্ছা পরে দিও। এখন বাঁচাও ওকে—তুলে নিয়ে এস এই জায়গাটাতে। আমার তো সাধ্য নেই—গায়ে জোরই নেই আমার।

তবে গরজই বা কেন? মরুক না। ও তো কুলি।

তবু মানুষ।

ভস্মে ঘি ঢালা। ও কথা শুনে ভাবান্তর যা হল তা আমার প্রত্যাশার বিপরীত। আবার দেখি যে দাঁত বের করে হাসছে ওরা তিনজনই।

আর মাটি-কাদা-পাথর স্তূপের নীচে পড়ে বাহাদুর ওখানে কাঁদছে—আহত একটি কুকুরের কেঁও কেঁও ক্রন্দনধ্বনি যেন।

মাথাটা আমার কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। তবু তাতে খেলে গেল বুদ্ধিটা। বললাম, আচ্ছা বকশিশ মিলেগা—পহলে বচাও উস কুলিকো।

লোক তিনজন এ কথা শুনে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল কিছুক্ষণ; তারপর তাদের একজন বললে, দু টাকা লাগবে বাবু।

তৎক্ষণাৎ রাজী আমি। ফলও হল তাতে। বাবুমতন দেখতে যে লোকটি, সে মাথার ইশারায় সম্মতি ও হুকুম দিল; যে দুটিকে মনে হয়েছিল মজুর, তারাই এগিয়ে গিয়ে তুলে নিয়ে এল প্রথমে আমার মোটটি ও পরে বাহাদুরকে।

তবে তিনজনেই আবার গালিও দিচ্ছে তাকে। পাহাড়-ভাঙা মাটি-পাথরের চেয়ে কম ভারি ও কম তীক্ষ্ণ নয় বেচারা বাহাদুরের উপর বিরক্তি ও বিদ্বেষের এই অসাধারণ ও অতিরিক্ত বর্ষণ।

কিন্তু বাহাদুরের দিকেই তখনও প্রধান মনোযোগ আমার। নিজের ভাঙা পা নিয়ে যথাসম্ভব দ্রুতবেগে তার কাছে গিয়ে একটি হাত ধরলাম তার। তাকে টেনে তোলবার মত দৈহিক শক্তি আমার নেই, শুধু মুখে বললাম, ওঠ বাহাদুর—উঠে দাঁড়াও তো।

তারপর আবার রুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করছি।

কিন্তু আবার দেখলাম অপ্রত্যাশিত দৃশ্য। এবার আর ভয়ঙ্কর নয়, শোচনীয়। মাটিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার জন্য সে কি প্রাণপণ চেষ্টা বাহাদুরের—একবার এক পায়ের উপর নির্ভর করছে সে, আবার অপরটির উপর। একবার উঠেও দাঁড়াল সে। কিন্তু ভঙ্গি যে দেখছি অষ্টাবক্রের। অদূরের ওই পাহাড়টার মতই থরথর কাঁপছে বাহাদুর—যন্ত্রণায় বিকৃত তার মুখ। পরক্ষণেই একচাপ ধসের মতই আবার সে মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই আমার কানে এল তার আর্তকণ্ঠের কাতর বিলাপ—বাবুজী, হম তো মর গয়া।

চোখে দেখে কিছুই বোঝা যায় না। বাহাদুরের দেহের দু-তিন জায়গায় কেটে গিয়েছে দেখলাম, রক্তপাত কিছু হয়েছে এবং হচ্ছেও। কিন্তু একটি ক্ষতও তেমন গভীর নয়, রক্তপাতের পরিমাণও সামান্য। বাহাদুরের লোহা-পেটা শরীরটিকে কাবু করবার মত উপসর্গ একটিও নয়। তথাপি উঠে যে সে দাঁড়াতে পারছে না তা তো আমার কাছে প্রত্যক্ষ সত্য। সুতরাং অনুমান করছি যে, তার কোমর বা পায়ের কোন অস্থি গুরুতরভাবে জখম হয়েছে।

ফল বাহাদুরের পক্ষে যাই হোক না কেন, আপাতত: আমার পক্ষে

মারাত্মক। ভারবাহী [illegible] আঘাতে অচল আর একটি গুরুভার বোঝাতে পরিণত হয়েছে। সে ভার এখন বইবে কে?

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে আবার সেই তিনটি লোকের দিকে তাকালাম আমি। তাড়াতাড়ি দুটি টাকা বের করে তাদের একজনের হাতে দিয়ে বললাম, তোমরা অনেক উপকার করেছ আমার। তবু আরও একটু করতে হবে ভাই। দয়া করে তোমরা তিনজনে ভাগাভাগি করে আমার এই কুলি আর মোটটাকে সামনের চটিতে পৌঁছিয়ে দাও।

উত্তরে সেই বাবুমতন লোকটি বললে, নহী হো সকতা। সড়ক ঠিক নহী হ্যায়। উসতরফ হম নহী জায়েঙ্গে।

কোন্ দিকে যাবে তাহলে?

আঙুল দিয়ে বিপরীত দিক নির্দেশ করল লোকটি—অর্থাৎ যেদিক থেকে আমরা এসেছি।

সর্বনাশ! এ যে উভয়সঙ্কট আমার। সামনে আরও যে ধস নামছে তা না জেনেই তো জিতেন যোশীমঠের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। পথে সেও পাহাড়-চাপা পড়ল না তো? আমি না পাচ্ছি তার কোন সংবাদ, না তাকে জানাতে পারছি আমাদের দুরবস্থার কথা। তার টাকা-পয়সা এবং বিছানাপত্রও তো রয়েছে আমাদেরই সঙ্গে। সেসব নিয়ে বিপরীত দিকে আমি যাই কেমন করে? আর না গিয়ে এই ঘোর দুর্যোগের দিনে আহত কুলিটিকে নিয়ে এই তেপান্তরের মাঠের মধ্যে আমি থাকবই বা কোন্ হিসাবে? এ দিকের যে পাহাড়টা এখনও অক্ষত আছে দেখছি, তাতেও যদি ভাঙন শুরু হয়!

ভাবতেই ভয়ে আমার বুকের রক্ত জল হয়ে গেল। নিশ্বাসও যেন বন্ধ হয়ে আসছে। কিন্তু পরমুহূর্তে যে ভাব আমার মনে জেগে উঠল তা আত্মরক্ষার আদিম প্রবৃত্তি, জিতেনের বিরুদ্ধে একটা অন্ধ আক্রোশ এবং আমার পায়ের কাছেই রোরুদ্যমান আহত বাহাদুরের প্রতি করুণার একত্র সংমিশ্রণে প্রায় এক বীভৎস রস। সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে মেপে ভাল-মন্দের বিচার করবার শক্তি তখন আর আমার নেই। সময়ও নেই। সুতরাং তৎক্ষণাৎ মনের ভিতর থেকে সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে সেই লোকটির দিকে চেয়ে আমি বললাম, তাহলে উলটো দিকেই নিয়ে চল কুলিটাকে—অন্ততঃ গড়ুরচটি পর্যন্ত।

কিন্তু এবারও অস্বীকার করল লোকটি: সো ভী নহী হো সকতা।

ক্যোঁও?

হমলোগ সরকারকে নৌকর, কুলি নহী হ্যায়।

পুরা বকশিশ দেঙ্গে।

তব ভী ছোটা কাম নহী কর সকতে।

লেকিন য়হ তো ধরমকা কাম হ্যায়।

নহী হো সকৃতা বাবুজী—উপরসে হুকুম নহী হ্যায়।

বলেই তার সঙ্গী দুজনকে সে হুকুম দিল যন্ত্রপাতি সব গুছিয়ে নিয়ে রওনা হবার জন্য। আর সত্যিই আমাদের দুজকে ওখানে ফেলে রেখে গড়ুরচটির দিকে যাত্রাও করল তারা।

বিশ্বাস হয় না আমার। কিন্তু বিশ্বাস না করবার যখন আর কোন উপায় থাকল না তখন আমি প্রায় আর্তনাদ করে বললাম, তব হমলোগোকা ক্যা উপায় হোগা?

দূর থেকে উত্তর এল: কুলি মিলনেসে ভেজ দেগা।

কিন্তু কোথায় কুলি? আধঘণ্টাখানেক পরে গড়ুরচটির দিক থেকে যারা এল তারা তিন-চারটি ছোট ছোট ছেলে। পরনে তাদের হাফ-প্যাণ্ট ও গরম কোট, মাথায় কান-ঢাকা টুপি এবং পিঠে ছোট ছোট ব্যাগ। সামনে যোশীমঠে অবস্থিত এক আবাসিক বিদ্যালয়ের ছাত্র তারা। কি একটা ছুটিতে বাড়িতে এসেছিল, এখন বোর্ডিংএ ফিরে যাচ্ছে। পাহাড়ের ধস-নামা তারা জন্ম থেকেই দেখে আসছে বলেই বুঝি এরকম অবস্থায় সঙ্কট এড়িয়ে চলতে জানে তারা। এলও তাই। পার্বত্য মূষিকের মত দ্রুতবেগে এবং নিরাপদেই তারা পার হয়ে এল ওই ভাঙনের জায়গাটা।

আমাদের দুরবস্থা দেখে তাদের সহানুভূতির অন্ত নেই। কিন্তু কি করতে পারে ওই বালকেরা? আমিই বা কি করতে বলব তাদের? সামনের পথ খারাপ আছে জেনেও তারা সেদিকেই এগিয়ে গেল দেখে আমি শুধু তাদের বললাম, পথে আমার মত কোন বাঙালী-যাত্রীর দেখা পেলে তাকে আমাদের অবস্থা জানিয়ে দিতে।

জিতেনকে ফিরে আসতে বলব, এখন সে প্রবৃত্তিও আমার হয় না।

তবু ওই ছেলে কটি এগিয়ে গিয়ে একটি বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হবার পর আমি আমার মনের কানে ক্রমাগতই আশার গুঞ্জন শুনছি যেন—জিতেন খবর পাবে এবং খবর পেয়েই চলেও আসবে সে। সেই আশাই আমার উদগ্র হয়ে উঠল যখন মিনিট পনর পরেই অস্পষ্ট কুয়াশার ভিতর দিয়ে

ছায়ামূর্তির মত একজনকে দেখলাম যোশীমঠের দিক থেকে আমাদের দিকে আসতে।

তবে মরীচিকা। মূর্তিটি আরও একটু কাছে আসতেই ভুল ভেঙে গেল—সে জিতেন নয়। তবুও আশ্বাস পেয়েছে আমার মন। মানুষ তো আসছে একজন—কিছু সাহায্য পেতে পারি তার কাছে।

কিন্তু আমার কাতর অনুরোধ মন দিয়ে শোনবার পর লোকটি আমার চেয়েও কাতর স্বরে আমাকে বললে যে, আসতে আসতে নিজেই সে পাথরচাপা পড়ে মরতে বসেছিল; এখন সে আস্ত একটি মানুষ দূরে থাক্, পাঁচ-সেরি একটি পুঁটলিও বইতে পারবে না।

আবার ওই তেপান্তরের মাঠে আমি একা—মানে অর্ধ-অচৈতন্য অক্ষম বাহাদুরের পাশে নিজের অক্ষমতার তীব্র সচেতনতা নিয়ে সক্ষম কিন্তু অপদার্থ পুরুষ আমি, নৈরাশ্যের অন্ধকারের মধ্যে ক্রমেই যেন ডুবে যাচ্ছি। ইতিমধ্যে আমার গায়ের বর্ষাতিটি খুলে বাহাদুরের গা-মাথা ঢেকে দিয়েছিলাম। কিন্তু অবিরাম বৃষ্টিপাত থেকে তাকে কতখানি রক্ষা করতে পারে ওই পাতলা বর্ষাতি। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কনকনে হাওয়াও বইছে। বাহাদুরের ভূলুণ্ঠিত দেহের দিকে তাকিয়ে দেখি যে, সে ম্যালেরিয়ার রোগীর মত হিহি করে কাঁপছে আর বিড়বিড় করে কি যেন বলছেও।

আরও একটু আচ্ছাদন তাকে দেবার জন্য আমি ছাতা নিয়ে বসলাম তার মাথার কাছে। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, খুব কষ্ট হচ্ছে নাকি বাহাদুর?

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল সে, এবং কান্নার ফাঁকে ফাঁকে জড়িতস্বরে বললে, হমনে পাপ কিয়া বাবুজী—আচ্ছা হ্যায় কি মুঝে সাজা মিলী। লেকিন আপকী যাত্রাভী তো হমনে বরবাদ কর দী। মুঝকো আপ মার ডালিয়ে বাবুজী—লাথ মারকে খদকা অন্দর গিরা দিজিয়ে।

বলে কি বাহাদুর! আর যা সে বলছে তার উত্তরই বা কি দেব আমি! তার মাথায় আলগোছে হাত বুলোতে বুলোতে পূর্ব প্রসঙ্গেই ফিরে গিয়ে আমি বললাম, তোমার ঠিক কোন্ জায়গাটাতে লেগেছে তাই আমায় বল তো বাহাদুর—দেখি একটু টিপে দিলে যদি তুমি উঠে দাঁড়াতে পার।

শুনে যেন আরও অধীর হয়ে উঠল বাহাদুর। সে তার নিজের দুই হাত

তুলে তার মাথার উপরেই আমার হাতখানি চেপে ধরে আরও অধীর, আরও গাঢ়স্বরে বললে, আপ তো মেরা মাতাপিতা হ্যায় বাবুজী। লেকিন হমনে ক্যা কিয়া? হায় ভগবান, হমনে ক্যা কিয়া!

বলতে বলতে আমার হাত ছেড়ে দিয়ে নিজের মাথা নিজেই চাপড়াতে শুরু করল সে। তাতে আরও বিপন্ন অবস্থা আমার। অনেক কষ্টে নিবৃত্ত করলাম তাকে; তার সক্রিয় হাতখানি নিজে আমি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে ঢুকিয়ে দিলাম বর্ষাতির নীচে। কিন্তু তারপর আবার তার মুখের দিকে চেয়ে দেখি যে গরুর মত ড্যাবডেবে চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে সে। এবার চোখাচোখি হতেই একেবারে ভিন্ন স্বরে, প্রায় ফিসফিস করে সে বললে, মেরে ওয়াস্তে আপ কেঁ্যও জান দেওগে বাবুজী? মুঝকো একেলাহী মরণে দো—য়হাপর মুঝে ছোড়কর আপ গড়ুর চট্টিমে লৌট জায়ো, বাবুজী।

কান্নার চেয়েও দুঃসহ বাহাদুরের এই কাতর আবেদন। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম আমি। একটা ধমক দিলাম বাহাদুরকে: কি যে বলিস তুই! তোকে এখানে ফেলে রেখে আমি যেতে পারি নাকি? মরতে হয় দুজনে একসঙ্গেই মরব।

একটু থেমে তারপর আশ্বাস দিলাম তাকে: অত ঘাবড়াচ্ছিস কেন? উপায় একটা হবেই।

কিন্তু মুখে ওই কথা বললেও নিজের মনে আমি আশ্বাস পাচ্ছি কই? দুটি অসহায় প্রাণী পড়ে আছি তো সেই তেপান্তরের মাঠে। ঘড়ি বের করে দেখি যে বেলা তখন প্রায় একটা। কিন্তু বৃষ্টি ও কুয়াশার জন্য তখনই মনে হয় বুঝি সন্ধ্যা হয়ে এল। কুয়াশা এখন আগের চেয়েও নিবিড় হয়েছে। আকাশ আরও বেশী কালো।

দু চোখ ফেটে জল এল আমার, তবে কি এই তেপান্তরের মাঠে জীবন্ত সমাধিই নির্মম নিয়তি আমার।

অসহায়ের মত চারিদিকে তাকাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি—সেই ছেলেদেরই দলটি না? ঠিক তাই। তবু মনে হয় যে এরা বুঝি তারা নয়। যাবার সময় এদের মুখকটি দেখেছিলাম ফোটা ফুলের মত। কিন্তু এখন দেখছি বিবর্ণ। কেমন যেন সন্ত্রস্ত দৃষ্টি প্রতিজোড়া চোখেই।

আমি কোন প্রশ্ন করবার পূর্বেই ওদের একটি ছেলে কৈফিয়তের সুরে

বললে, বহুত পাত্থর গিড়তে। জা নহী সকেঁ হমলোগ। ইসলিয়ে ওয়াপশ আ গয়ে। অব ঘর লৌট জায়েঙ্গে।

রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনেছিলাম, ওরা গড়ুরচটির দিকে চলতে শুরু করবার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম একটি—শেষ আশাও নির্মূল হল তাহলে। জিতেনকে সংবাদ দেওয়া গেল না।

কোন্ নিষ্ঠুর দেবতা কি খেলাই যে খেলেছেন আমার সঙ্গে—আশা ও নৈরাশ্যের নাগরদোলায় দোল খাওয়ার আর বিরাম নেই। আমার দীর্ঘনিশ্বাস বাতাসে মিলিয়ে যেতে না যেতেই আবার একটি আশ্বাসও কানে এল আমার—কিশোরকণ্ঠের বাঁশীর মত মিহিস্বরের আশ্বাস। ভাঙনের জায়গাটা নিরাপদে পার হয়ে যাবার পর ওই দলেরই একটি ছেলে ওপার থেকে ডেকে বললে আমাকে : পিছেসে ভৈসাল আ রহে, উসসে আপকো মদদ মিল জায়েগা।

সত্যিই তো। বিপরীত দিকে ফিরে চেয়ে দেখি যে ওই আশ্বাসই রূপ ধরে এগিয়ে আসছে যেন। কেবল একপাল মোষ নয়, সঙ্গে ঘোড়া না খচ্চরও আছে কয়েকটি। পশুপালকেরাও সংখ্যায় তিনজন।

কেবল আশ্বাস নয়, আশায় নেচে উঠেছে আমার মন—এতগুলি বাহন যখন একসঙ্গে আসছে তখন কেবল বাহাদুর কেন, আমিও একটা ঘোড়ায় চাপতে পারব।

কিন্তু হরি হরি। মরীচিকা দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল। ওই দলের একটি পশু বা একটি মানুষও থমকে দাঁড়াল না। আমার সকাতর অনুনয় এবং প্রচুর পারিশ্রমিকের প্রলোভনকে সমভাবেই উপেক্ষা করে পশুপালকদের একজন চলতে চলতেই আমাকে বলে গেল যে, এই দুর্যোগের দিনে তাদের ঘোড়া-খচ্চরের পিঠে কোন মোটই তারা চাপাবে না।

আমি রুদ্ধনিশ্বাসে বললাম, তা হলে কি উপায় হবে আমাদের ?

উত্তরও দিল না লোকটি। পশু ও মানুষের অতবড় দলটিও ধীরে ধীরে কুয়াশার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বসে পড়লাম আমি। দাঁড়িয়ে থাকবার মত দৈহিক শক্তিও আর আমার নেই। অনেকক্ষণ যাবৎই ভিজে ঢোল হয়ে আছি। অসহ্য শীত লাগছে এখন। তার উপর নৈরাশ্য প্রকাণ্ড একটি বরফস্তূপের মত আমার বুকের উপর চেপে বসল যেন। হঠাৎ আমার মনে হল যে, আমি অভিশপ্ত, আমি পরিত্যক্ত ; মানুষ তো বটেই, স্বয়ং ভগবানও আমায় পরিত্যাগ করেছেন।

আর তখনই অনু[illegible] আমি আমার দক্ষিণ বাহুতে [illegible] কঠিন নিষ্পেষণ—যেমন দৃঢ়, তেমনি শীতল। এই নাকি তুহিন-শীতল মৃত্যুর গ্রাস। কিন্তু বাহুতে কেন তা? ভীতিবিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখি যে, মৃত্যু নয়, মৃত্যুপথযাত্রী বাহাদুর তার হাত বাড়িয়ে আমার বাহু চেপে ধরেছে। চোখাচোখি হল তার সঙ্গে। বিস্ফারিত তারও চোখ দুটি, কিন্তু দৃষ্টি ভীতিবিহ্বল নয়—স্নেহময়ী জননীর চোখের দৃষ্টির মতই যেন মমতায় কোমল, সমবেদনায় করুণ।

ফিসফিস করে বাহাদুর বললে, অব তো মৈ জাতা হুঁ। মেরা সব কসুর মাফ করনা বাবুজী।

সত্যিই মরছে নাকি বাহাদুর! আর তা ঠায় চেয়ে দেখছি আমি? কথাটা মনে হতেই সমস্ত দেহে আবার একটি শিহরণ অনুভব করলাম। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। বাহাদুরের সেই শীতল স্পর্শ থেকেই একটা যেন উত্তপ্ত বিদ্যুৎপ্রবাহ আমার প্রত্যেকটি শিরা-উপশিরায় সঞ্চারিত হল এবং সঙ্গে সঙ্গেই সঞ্জীবিত হয়ে উঠল আমার অবসন্ন স্নায়ু ও পেশীগুলি। উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

এ কি ক্লৈব্য আমার! বাহাদুরই না হয় আহত ও চলৎশক্তিহীন। কিন্তু আমি তো তা নই। তবুও নারীর মত, শিশুর মত বাহাদুরের পাশে বসে তার সঙ্গে একত্র জীবন্ত সমাধি লাভ করাকেই কেন আমি আমার একমাত্র কর্তব্য মনে করেছি? কেন নিজে আমি সক্রিয় হয়ে চেষ্টা করছি নে তাঁকে বাঁচাবার জন্যে? সামনের পথই না হয় আমার অজানা, কিন্তু পিছনের পথ তো চিনে এসেছি আমি—যে পথে মাইলচারেক মাত্র দূরেই পিপুলকুঠি শহরে একটি কেন—দশটি কুলি আমি পেতে পারি এখান থেকে বাহাদুরকে জীবন্ত তুলে নিয়ে যাবার জন্যে। সেই দিকে ছুটে না গিয়ে কেন এখানে আমি দৈবের মুখ চেয়ে বসে থাকব!

পাছে করুণার ছদ্মবেশে ক্লৈব্য আবার আমাকে নিষ্ঠুর কর্তব্যসাধনের কঠিন পথ থেকে বিচ্যুত করে, সেই আশঙ্কায় বাহাদুরের কাতর মুখচ্ছবি দ্বিতীয়বার চেয়েও দেখলাম না আমি। একটু সরে গিয়ে তাকে উদ্দেশ করে বললাম, তুমি ভাবনা করো না বাহাদুর—তোমাকে আমি মরতে দেব না। তোমার জন্য কাণ্ডি আনতে যাচ্ছি আমি—গড়ুরচটিতে যদি না পাই, পিপুলকুঠি থেকে নিয়ে আসব।

[illegible] আমাদের একটি [illegible] লেপ-তোশক দিয়ে ঢেকে দিলাম বাহাদুরকে। তার ওপর বর্ষাতি চাদরখানি চাপিয়ে দিয়ে নিজে আমি নির্মম হয়ে যাত্রা করলাম পুনরায় পিছনে ফেলে-আসা সেই গড়ুরচটির দিকেই।

আশ্চর্য! আমার নিজেরই একটা পা যে ভাঙা, তা আর তখন মনেই পড়ছে না। খচখচ ব্যথাটাকেও যেন জয় করেছে আমার জাগ্রত পৌরুষ।

পিপুলকুঠি পর্যন্ত যাবার দরকার হল না।

গড়ুরচটি পর্যন্ত গিয়েই দেখি যে, ওই জায়গাটার তেমন লক্ষীছাড়া রূপ আর তখন নেই। এখন সেই ছোট চায়ের দোকানটিতে বৃদ্ধ দোকানী ছাড়াও আরও চারজন লোক উনানের ধারে বসে জটলা করছে দেখলাম। চেনা মুখ চারটিই। ওদের মধ্যে যে লোকটি প্রৌঢ়, সে কিছুক্ষণ পূর্বে যোশীমঠের দিক থেকে আমারই সমুখ দিয়ে এ দিকে এসেছে—আমি তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতেই তখন সে অজুহাত দেখিয়েছিল পাথর চাপা পড়ে তার নিজেরই আহত অবস্থার। এখনও দেখলাম যে, সে উনানের ধারে পা ছড়িয়ে বসে কি যেন তাতে মালিশ করছে।

বাকি তিনজনই সম্পূর্ণ সুস্থ ও শক্ত-সমর্থ যুবক—সেই তিনজন যারা ছোট কাজ করবে না বলে আহত বাহাদুরকে স্পর্শ করতে চায় নি।

ওখানে থাকতেই পরিচয় পেয়েছিলাম তাদের।

সরকারী পূর্ত-বিভাগের ওভারসিয়র ওদের মধ্যে সেই বাবুমতন লোকটি; বাকি দুজন মজুর। যাত্রীসড়কে প্রয়োজনীয় মেরামতি কাজের জন্য নিযুক্ত বাহিনীর ছোট একটি গ্যাং।

অনুনয় করে এদের কাছে কোন সাহায্য যে পাওয়া যাবে না তা পূর্বেই বুঝেছিলাম আমি। সুতরাং এবার একেবারে বিপরীত চাল চাললাম।

ওভারসিয়রটির মুখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললাম, আমার ওই আহত কুলিটিকে অন্ততঃ এই পর্যন্ত এনে দিতে হবে। যদি তা না কর তবে এখনই পিপুলকুঠি গিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে নালিশ করব আমি—পৌড়িতে তোমাদের বড়সাহেব আর লক্ষৌতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তার করব। তিন দিনের মধ্যেই তোমাদের তিনটিকে জেলে পাঠাব ঘানি টানবার জন্যে। জান আমি কে?

মিথ্যা কথা [illegible] কিন্তু তাতেই কাজ হল একেবারে [illegible] মত। দোকানের সবকটি মানুষই তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। ওভারসিয়রটি আমাকে লম্বা একটি সেলাম ঠুকে মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, হুজুর, তখন যদি বলতেন এ কথা—

চুপ রহো।

তখন পাকা অভিনেতাই হয়ে উঠেছি আমি। পুলিসী ভঙ্গিতে হাতের লাঠিখানা মাটিতে ঠুকে আমি ধমক দিয়ে কথা বন্ধ করলাম তার; আগের চেয়েও গরম স্বরে আবার বললাম, আমি কথা চাই নে, কাজ চাই। এক্ষুনি রওনা হয়ে যাও তোমরা। আধঘণ্টার মধ্যে ওই কুলিটাকে এখানে নিয়ে আসা চাই।

শুনে দেখি যে, পাংশুবর্ণ হয়ে গিয়েছে সবকটি মুখ, অথচ গড়িমসি ভাবটা আছেই। সুতরাং দ্বিতীয় একটি অস্ত্রও নিক্ষেপ করলাম আমি; আবার বললাম, আমার হুকুম তামিল না করলে জেল খাটবে নির্ঘাত। তবে কুলিটিকে যদি বয়ে এনে দাও তাহলে শুধু রেহাই নয়, বকশিশও পাবে।

চোখে চোখে কি যেন কথা হল ওদের তিনজনের; তারপর ওভারসিয়রটি আবার হাত জোড় করে আমাকে বললে, ওরা হুজুর গরীব দিন-মজুর—জানতে চাইছে বকশিশের পরিমাণটা। অমন হাতীর মত চেহারা কুলিটার। আর পথ তো হুজুর কম নয়।

কত চাই?

দুজন লোক যাবে—দশ টাকা হুজুর।

রাজী হলাম আমি। কিন্তু চোখমুখের সেই কটমটে ভাবটা বজায় রেখেই বললাম, এক্ষুণি ছুটে যাও তোমরা। কুলিটিকে আগে আনবে—মালপত্র আসুক বা না আসুক।

তারপর রুদ্ধনিশ্বাসে প্রতীক্ষা আমার। এবার ওই দোকানে আমার খাতিরের আর অন্ত নেই। কিন্তু কিছুই ভাল লাগছে না। এমন কি ঝাড়া আড়াই ঘণ্টা তেপান্তরের মাঠে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভেজবার পর অতিবাঞ্ছিত আগুন-তাতও নয়। মন আমার পড়ে আছে বাহাদুরের কাছে, চোখ দুটি পথের উপর—বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে আছে যে পাহাড়টা, সেটা স্বচ্ছ নয় বলেই যেন আরও অসহিষ্ণু তাদের দৃষ্টি।

ঠিক আধঘণ্টা পরে ফিরে এল তারা। কিন্তু এ কি দেখছি আমি! একটি

[illegible] হমনে বয়ে এনেছে। বাহাদুর [illegible] তো! ওদের পিছনে জনশূন্য সড়ক থাঁ থাঁ করছে দেখলাম।

শুষ্ককণ্ঠে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বাহাদুর কোথায়?

উত্তর হল: উসকো হমনে ছোড় দিয়া।

কেঁ্যও?

আপকা সাথী উহাঁপর আ গয়ে।

তার মানে আমাদের জিতেন!

নিজের পাখা থাকলে তখনই উড়ে গিয়ে দেখতাম জিতেন কি করছে ওখানে। কিন্তু পাখা তো নেই-ই, তার উপর দুখানা চরণের একখানা ভাঙা। সুতরাং আবার দুঃসহ প্রতীক্ষা। আধঘণ্টার বেশী নয়, কিন্তু তখন মনে হয়েছিল যেন এক যুগ।

তারপর চোখে পড়ল।

লম্বা লম্বা পা ফেলে আগে আগে এল জিতেন। রাজ্যের বিরক্তি তার মুখের ভাবে। দূর থেকে আমাকে দেখেই সে গলা চড়িয়ে বললে, তাহলে মণিদা, আমাদের বদরীযাত্রা এবারকার মত এখানেই শেষ—কেমন ?

কানেই গেল কথাটা, মন পর্যন্ত নয়। বদরীনাথ নন, অন্য একজনের কথা ভাবছিলাম আমি। শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, বাহাদুর কোথায় ?

ওই তো—বলে তার পিছন দিকে হাতের ইশারা করল জিতেন।

অত ভারি বোঝা পিঠে নিয়ে স্বভাবতঃই পিছিয়ে পড়েছিল বাহকটি। এবার নীচে পুলের উপর দেখা গেল তাকে। পিঠে বোঝা থাকলে যেমন বেঁকে যায় মানুষের শরীরটা, ঠিক তেমনই বেঁকে গিয়েছে। তবুও বোঝা যায় যে, বেশ শক্তসমর্থ পুরুষটি। চায়ের দোকানের মেঝেতে বাহাদুরকে নামিয়ে দিয়ে যখন সোজা হয়ে দাঁড়াল লোকটি তখন এক নজরেই বুঝতে পারলাম যে, বেশ দীর্ঘও তার দেহ। দশাসই চেহারা।

কিন্তু আমার প্রধান মনোযোগ তখন বাহাদুরের দিকে। ঘণ্টাখানেক পূর্বেই যাকে আধমরা দেখে এসেছি, সে এখনও পর্যন্ত বেঁচে আছে কি না, সেই সম্বন্ধেই উদ্বেগ ও সন্দেহ আমার মনে। হাঁটু গেড়ে বসে তার মাথায় জোরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে ডাকলাম—এই বাহাদুর, কেমন আছ তুমি ?

না, আশঙ্কা আমার অমূলক। বেশ বেঁচে আছে সে। তার দেহের থরথর কম্পনের মধ্যে জীবনের এবং হাউহাউ ক্রন্দনধ্বনির মধ্যে তীব্র সচেতনতার অমোঘ প্রমাণ পাওয়া গেল। অমন হাতীর মত জোয়ান লোকটি দুর্বল অসহায় একটি শিশুর মতই চোখের জলে দুই গাল ভাসিয়ে জড়িত স্বরে বলে যাচ্ছে, আপলোগ তো মেরে মাতা-পিতা হ্যায়—লেকিন হমনে ক্যা কিয়া !

চুপ কর্ [illegible] —জিতেন [illegible] যা করবার তা তো করেইছিস। তারপর [illegible] এই কাহুনি কেন?

কিন্তু আমার মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল সে; বললে, কেবল পিতা নয়, মাতা-পিতা দুই-ই হয়ে বসে আছেন দেখছি তো সেই ঋষিকেশ থেকেই। ঠ্যালা সামলান এখন।

বোঝা যায় না জিতেনকে। তার বিরুদ্ধে আমার মনের মধ্যে যত অভিমান ও বিরক্তি পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল তা ফেটে পড়বার মুখেই প্রবল বাধা পেয়েছে। এখনও বাধা পাচ্ছে তার মুখের ওই হাসিতে। জিতেনের কণ্ঠের ভাষা ও গলার আওয়াজের সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না তা, যেমন তার এই ফিরে আসাটা খাপ খায় নি আমাদের পেছনে ফেলে তার ওই ভয়ঙ্কর জায়গাটাও পার হয়ে এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু দুই-ই তো সত্য। সুতরাং তার মন্তব্য শোনবার পর আমি বিব্রত ভাবে বললাম, তাই তো? এখন কি করা যাবে এটাকে নিয়ে?

মুখের হাসিটুকু মোটামুটি বজায় রেখেই উত্তর দিল জিতেন: আপাততঃ একটু সেঁক দিতে হবে। তারও আগে ভিজে জামাকাপড়গুলি ওর গা থেকে খুলে ফেলতে হবে।

কেবল মুখে বলাই নয়, তখনই কাজেও লেগে গেল সে। কতকটা টেনে ও কতকটা ঠেলে বাহাদুরকে সে ফেলল নিয়ে উনানের ধারে; আমাদের উভয়ের ঝোলাঝুলি খুঁজে শুকনো জামাকাপড় যা পাওয়া গেল, তারই কিছু কিছু দিয়ে নিজের হাতে সে সাজিয়েও দিল তাকে, কাজ করতে করতেই দোকানদারকে সে হুকুম দিল বাহাদুরকে খুব কড়া করে এক গ্লাস চা দিতে।

বাহাদুর তখনও হিহি করে কাঁপছে, চলছে তখনও তার সেই শিশুসুলভ কান্নাটাও। কিন্তু আমার অবস্থা তখন কতকটা স্বাভাবিক। মনে মনে আশ্বাস পেয়েছি আমি, অকূল সাগরে ভাসতে ভাসতে পেয়েছি যেন একটি সুদৃঢ় আশ্রয়—তা ওই জিতেন। কেবল আশ্রয় নয়, হারাধন ফিরে পেয়েছি আমি—আমার লক্ষ্মণভাইকে।

তবে আশ্বাসের পিছনে পিছনেই এল অনুসন্ধিৎসা—আমি তো জিতেনকে খবর দিতে পারি নি, তবুও কি সূত্রে ওখানে ফিরে এল সে? এবং—

মুখ ফুটে জিজ্ঞাসাই করলাম তাকে।

উত্তরে জিতেন বললে, খবর আর কোথা থেকে পাব? আরও গোটা দুই

[illegible] চাট পেয়ে সেখানেই রান্নাবান্নার [illegible] আয়োজন শুরু করেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাবনা জাগল আপনারা আসছেন না দেখে। ঘণ্টা দুয়েক পথ চেয়ে বসে থাকবার পর উলটো দিকে ফিরে না এসে আর কি করতে পারি আমি?

তার পর?

ওখানে এসে দেখলাম যা চোখে দেখেও বিশ্বাস করা যায় না—বাহাদুর হাউহাউ করে কাঁদছে আর আপনি যাদের পাঠিয়েছিলেন সেই দুটি কুলি ওর গায়ের উপর থেকে লেপ-বর্ষাতি ইত্যাদি ছিনিয়ে নিতে নিতে মুখে ওর চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করছে।

সে কি কথা! বাহাদুরকে আনবার জন্যই তো দশ টাকা কবুল করে ওদের দুজনকে ওখানে পাঠিয়েছিলাম আমি।

তাই নাকি! কিন্তু ওরা যে বললে—নেপালী কুলিকে কিছুতেই ওরা পিঠে তুলবে না!

দুজনেই আমরা একসঙ্গে ফিরে তাকালাম ওভারসিয়রের সেই মজুর দুটির খোঁজে। চালার নীচেই আছে দুজনে। কিন্তু দেখি যে, বোধ করি ভয় পেয়েই দুটিতে গিয়ে বসেছে তাদের মনিবের পেছনে। ওভারসিয়র নিজে দুটি হাত জোড় করে কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়েছে আমার দিকে—যেন ওদের হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবার জন্যই। তার চোখের সঙ্গে আমার চোখ গিয়ে মিলতেই মুখেও সে বললে, বোঝবার ভুল হয়ে গিয়েছে, বাবুজী। ওরা তখন একটু রঙ্গ করছিল কুলিটার সঙ্গে। আর তাতেই আপনার সাথী রেগে গিয়ে বললেন যে তিনিই ওটাকে বয়ে আনবেন। নইলে—

চুপ রহো।

আমি ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলাম লোকটাকে। প্রবৃত্তিই হয় না ওদের সঙ্গে আর কথা বলবার। আমার প্রত্যাশারই কেবল নয়, এই উত্তরাখণ্ডে আমার ইতিপূর্বের সমস্ত অভিজ্ঞতারও ওরা যেন মূর্তিমান প্রতিবাদ। দেবলোকে বিচরণ করতে করতে অকস্মাৎ যেন তিনটি পিশাচের সম্মুখীন হয়েছি আমি।

জিতেনের মুখের দিকে ফিরে তাকিয়ে তিক্তকণ্ঠে আমি বললাম, কেদারের পথে এমন তো একজনও দেখি নি। সেখানে না ডাকলেও প্রত্যেকটি লোকই এগিয়ে এসেছে আমাদের সাহায্য করবার জন্য। কিন্তু বদরীনাথের পথে কাল থেকেই এ কি অভাবনীয় ব্যতিক্রম দেখছি!

বলে খুব

তো উল্লাস হয়েছিল

বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর তার, তীক্ষ্ণ তার ওষ্ঠপ্রান্তের হাসিটুকুও। এই দ্বিতীয়বার জিতেন আমার উপর প্রতিশোধ নিল মোটর ও মোটর-সড়কের প্রতি আমার পক্ষপাতিত্বের জন্য। কিন্তু তার পরেই একেবারে বিপরীত গতি ও ভিন্ন সুর তার। হাসি থামিয়ে গম্ভীর স্বরে সে বললে, তবে ব্যতিক্রমেরও ব্যতিক্রম আছে। নেপালী কুলিকেও বয়ে আনবার জন্য শেষ পর্যন্ত লোক যে পাওয়া গিয়েছে তা তো আর অস্বীকার করবার জো নেই!

সেই দশাসই চেহারার লোকটিকে দেখিয়ে ও কথাটা বলেছিল জিতেন। আমিও মিনিট পাঁচেক পর আবার দেখলাম তাঁকে। ততক্ষণে তিনিও উনানের ধারে জেঁকে বসেছেন। আলাপও জমিয়ে তুলেছেন তিনি বুড়ো দোকানীর সঙ্গে। আমরা দুজনেই তাঁর দিকে তাকিয়েছি বুঝে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু হাসলেন তিনি।

প্রথমেই যাঁকে অভ্যর্থনা করা উচিত ছিল তাঁকে এতক্ষণ উপেক্ষা করেছি বলে অপ্রতিভ বোধ করছি। কিন্তু আলাপ শুরু করি কেমন করে?

কুণ্ঠিত চোখ দুটি জিতেনের মুখের দিকে ফিরিয়ে তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম, একে পেলে কোথায়?

পাব আর কোথায়? মাটি ফুঁড়ে উঠলেন উনি।—বলেই একটু যেন হাসল জিতেন।

কথাকটির মতই দুর্বোধ্য ওই তার হাসিও। আমি বিহ্বল ভাবে বললাম, মাটি ফুঁড়ে উঠলেন মানে?

মানে ওই যা বললাম, তাই। মাটি ফুঁড়ে উনি যদি না উঠে থাকেন তবে নিশ্চয়ই আশমান থেকে নেমেছেন।

আরও দুর্বোধ্য হেঁয়ালি ওটি। না বুঝে আমি মূঢ়ের মত জিতেনের মুখের দিকে চেয়ে আছি দেখে সে আবার বললে, তা ছাড়া আর কি বলব আমি? আমার মাথার কি কিছু ঠিক ছিল তখন, না খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবকিছু দেখতে পারছিলাম? আপনার লোক দুটি তো মালপত্র তাদের পিঠে নিয়ে চলে এল ওখান থেকে। আর বাহাদুর এদিকে খালি গায়ে হিহি করে কাঁপতে কাঁপতে হাউমাউ করে কাঁদছে। তখন একবার অবশ্য আমার মনে হয়েছিল

যে, দিই বেটাকে অলকনন্দার খদের মধ্যে ঠেলে ফেলে। কিন্তু তা পারলাম না। অগত্যা হারামজাদাকে আমারই পিঠের ওপর তুলে নিলাম।

সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। বিশ্বাসই হয় না আমার যে, জিতেন ওই কথাটা বলেছে এবং আমি নিজের কানে শুনেছি তা। দুই চোখ বড় করে বার দুই ঢোক গিলবার পর আমি বললাম, কি বললে তুমি? তুমি পিঠে তুলে নিলে বাহাদুরকে?

তা ছাড়া করি কি আমি!—জিতেন এবার যেন একটু বিরক্ত হয়েই উত্তর দিল: প্রায় একুশ দিন তো ওই হারামজাদা আমাদের সোয়া-মণি বোঝাটা ওর নিজের পিঠে নিয়ে পিছনে পিছনে এসেছে আমাদের। আজও আমাদের সেই বোঝাটা ওর পিঠে ছিল বলেই তো এই দুর্দশা হল ওর। তার পর ওকে ওখানে ফেলে আমি চলে আসি কেমন করে?

হাঁ করে শুনছিলাম আমি। কেবল যে আমার রসনাই তখন নির্বাক হয়ে গিয়েছে তা নয়, মনও আমার বিশ্বাস ও অবিশ্বাস উভয়কেই অতিক্রম করে যেন অনুভূতির উপরের স্তরে গিয়ে স্তব্ধ হয়েছে। মুখে দূরে থাক, কোন কথা আমার মনেও আসে না আর।

কিন্তু জিতেন আমার বিহ্বল মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল। এখন একটু যেন সলজ্জ ভাব তার। ঈষৎ কুণ্ঠিত স্বরেই সে আবার বললে, কিন্তু মণিদা, আমি পারব কেন? শরীর আর মনের সমস্ত শক্তি একত্র করে ওই ভাঙা জায়গাটা পার হয়ে এসেছিলাম। তার পরেই মনে হল যেন আমার নাভিশ্বাস উঠছে। বুঝেছিল বুঝি বাহাদুরও—'হাঁ হাঁ—বাবুজী, বাবুজী'—বলতে বলতে ও নিজেই আমার গলা ছেড়ে দিয়ে ঝুপ করে পথের উপর পড়ে গেল। আর আমি ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলাম মূর্তিমান আশ্বাসের মত এই অতিকায় পুরুষটিকে। চোখোচোখি হতেই হেসে বললেন উনি, য়হ কাম আপসে হো নহী সকতা বাবুজী। লেকিন আপ ঘাবড়াইয়ে মত্—হম অপনা পিঠ পর ইসকো উঠা লেঙ্গে।

যেমন কথা তেমনি কাজ। পরক্ষণেই বাহাদুরকে নিজের পিঠে তুলে নিয়েছিলেন তিনি; তারপর নিয়েও এসেছেন তাকে এই গড়ুরচটি পর্যন্ত।

সসম্ভ্রম বিস্ময়ে লোকটির দিকে আবার ফিরে তাকালাম আমি। আর তখনই তাঁর হাতের আধ-পোড়া বিড়িটিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনিও উঠে দাঁড়ালেন।

আমাদের আলাপের সারাংশ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। সেই জন্যই আমি তাঁকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার পূর্বেই নিজের মাথাটাকে একটু ঝেঁকে মুচকি হেসে তিনি বললেন, নহী বাবুজী—আশমানজমিন কুছ নহী হ্যায়। হম পিছেসে আ রহা থা। ইনলোগোঁকা হাল দেখকর কুছ কুছ সমঝ লিয়া ঔর অপনা পিঠপর উঠা ভী লিয়া জখমী আদমীকো।

ততক্ষণে কৃতজ্ঞতা ছাড়াও আরও যেন কি কি দিয়ে বুকের ভিতরটা আমার কানায় কানায় ভরে উঠেছে। আমি গাঢ়স্বরে বললাম, লেকিন আপনে হমলোগোঁকো বহুত উপকার কিয়া। ক্যা হম দেঙ্গে আপকো?

কুছ নহী,—উত্তর দিলেন লোকটি: আপকা কোই কাম হমনে কিয়া ভী তো নহী। কাম কিয়া বদরীবিশালকে জিনহোনে মুঝে থোরাসে তাকত দেকরকে ইস সনসারমে ভেজ দিয়া।

হাসতে হাসতেই কথা কটি বললেন তিনি; বলেই দোকান থেকে নেমে গেলেন পথের উপর; সেখান থেকে আমাদের দিকে আবার ফিরে তাকিয়ে বললেন, অব হম চলতে বাবুজী—জয় বদরীবিশালকী।

বেশ মিষ্টি তাঁর মুখের হাসিটুকু, মিষ্টি কণ্ঠস্বরও; কিন্তু—

জিতেন তখন বলেছিল যে, লোকটি হয় মাটি ফুঁড়ে উঠেছে, নয়তো নেমেছে আকাশ থেকে। এখন আমার নিজের চোখের সামনেও তেমনি একটি ব্যাপার ঘটল যেন। তাঁর বক্তব্যটি ঠিক ঠিক বোঝবার পর আর দেখা পেলাম না তাঁর।

অন্ধকারে বিদ্যুদ্দীপ্তি যেন। ক্ষণপ্রভা মিলিয়ে যাবার পর চারিদিকে আবার গভীর অন্ধকার। আমাদের সমস্যা যেমন ছিল প্রায় তেমনি রয়েছে।

চালের নীচে আগুনের ধারে এসেও বাহাদুরের অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন হয় নি। এখনও যন্ত্রণায় বিকৃত তার মুখ, থেকে থেকে চোখের জল তার দুই গাল বেয়ে ঝরে পড়ছে। ধরাধরি করে তাকে দাঁড় করাবার জন্য আবার একটা চেষ্টা করা গেল। কিন্তু ফল একেবারে বিপরীত—চীৎকার করে কান্না শুরু করল সে।

চীৎকার বন্ধ হলেই আবার সেই তার বিড়বিড় প্রলাপ শুরু হয়, হমনে ক্যা কিয়া—হায় ভগবান।

সওয়া যায় না অত বড় মানুষটার অমন শিশুর মত কান্না। আমি জিতেনের মুখের দিকে চেয়ে বললাম, কি করা যাবে এখন?

জিতেন একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে উত্তর দিল, আমরা আর কি করব—ডাক্তার যখন নই। ওকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

তা তো সেই পিপুলকুঠিতে। সেখানে ওকে পাঠাবার জন্য বাহন চাই যে। মাথার উপর এখন একটু ছাদ আছে, এই যা তফাত। নইলে মৌলিক সমস্যা যেমন ছিল তেমনি রয়ে গিয়েছে।

একটু দূরে নিয়ে গিয়ে জিতেনকে বললাম কথাটা—ওভারসিয়রের ওই মজুর দুটি ছাড়া আর তো কোন লোক নেই এখানে। আরও কিছু টাকা কবুল করে ওদের দিয়েই বোঝা বওয়ানো ছাড়া আর কি উপায় হতে পারে।

কিন্তু প্রস্তাব শুনেই যেন তেলে-বেগুনে জলে উঠল জিতেন: কথামত দশ টাকা আপনি ওদের যদি দিতে চান তো দিন। কিন্তু অতিরিক্ত আর এক পয়সাও নয়।

ওই লোকগুলির বিরুদ্ধে অমনি বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা আমারও মনে, কিন্তু ওদের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আমাদের উপায়ই বা কি আছে? অসহায়ের মত আমি ওই কথাটা জিতেনকে বলতেই সে দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর দিল, অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তারা দুই-ই এক। এই লোকগুলিকে আর এক পয়সাও দেব না আমি। ন্যায্য মজুরি দিয়ে পেশাদার কুলি আনব। আপনি বসুন এখানে, আমি কুলি আনতে যাচ্ছি।

আমার মাথাটা আবার যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। বিহ্বল হয়ে আমি বললাম, তুমি আবার যাবে?

যাব বইকি!—জিতেন উত্তরে বললে: ওর একটা গতি করতে না পারলে আমরাও তো নড়তে পারছি নে এখান থেকে।

কিন্তু গিয়ে সময়মত ফিরতে পারবে তো? খুব কাছে তো নয় পিপুলকুঠি?

সেখানে যাব না আমি—যাব ভেলাকুচি।

তার মানে সামনের দিকে—আবার সেই ভয়ঙ্কর পথে একটি মাত্র নয়, একাধিক ধস অতিক্রম করে! ভয়ে বুক কেঁপে উঠল আমার।

কিন্তু আমার আপত্তিতে কান দিল না জিতেন, আশঙ্কা হেসে উড়িয়ে দিল। সে বললে যে, দু-দুবার ধস অতিক্রম করবার ফলে ধস এড়িয়ে চলবার

কায়দাটা শিখে নিয়েছে সে। তা ছাড়া বৃষ্টি যখন থেমে গিয়েছে তখন ভাঙনের সে তোড়ও হয়তো এখন নেই।

তা হয়তো ঠিক। তবুও সংশয় যায় না আমার। সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার পূর্বেই জিতেন হেসে বললে, আপনার বুঝি ভয় হচ্ছে যে, আবার ওদিকে গেলে আমি আর ফিরে নাও আসতে পারি? কিন্তু ভাববেন না, আমি ফিরে আসবই; আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কুলিও নিয়ে আসব।

জিতেন পথে নামতে না নামতেই বাহাদুরের কথা কানে এল আমার। ব্যাকুল স্বরে সে বলছে: আপভী জাইয়ে বাবুজী, আপ ভী।

কাতর অনুনয় কেবল তার মুখের কথাতেই নয়, হাত বাড়িয়ে আমার একখানা পাও চেপে ধরল সে। আবার বললে, মেরে ওয়াস্তে আপকী যাত্রা নষ্ট মত্ করনা—আপভী জাইয়ে ছোটা বাবুজীকা সাথ।

আমার বিহ্বল ভাব, কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। কিন্তু জিতেন ও কথা শুনে হাসল, আবার তখনই সে ধমকও দিল বাহাদুরকে: চুপ কর্ হারামজাদা। নিজে তো তুই পা ভেঙে বসে আছিস, এখন অন্য কুলি না পেলে আমরাই বা যাব কেমন করে?

জিতেন চলে যাবার পর বুড়ো দোকানী আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললে, ভাববেন না বাবুজী, কুলি ওখানে পাওয়া যাবে। আর একটিমাত্র কুলিও যদি পাওয়া যায় তবে তাকে নিয়েই চলে যাবেন আপনারা। নেপালীটা পড়ে থাকে থাকুক এখানে, ও আপনিই ভাল হয়ে যাবে।

সায় দিল সেই ওভারসিয়র: ঠিক বাবুজী, এ পথে কুলিকামিন হরদম জখম হয়। সেজন্য যাত্রীরা কেউ বসে থাকে নাকি, না ফিরে যায়?

শুনেই বাহাদুর আবার ভেউভেউ করে কাঁদতে শুরু করল দেখে ওভারসিয়রটি তাকে একটি ধমক দিয়ে বললে, তুই বেটা জখম হয়েছিস তোর নিজের দোষে। তার জন্য তোর যাত্রীকে তুই হয়রান করছিস কেন? হেঁটে ফিরে যা তুই, আর তা যদি না পারিস তো দুদিন পড়ে থাক এখানে। নিজে তুই কুলি হয়েও অন্য এক কুলির পিঠে চাপবার শখ কেন তোর?

শুনে নিজের কপাল নিজে চাপড়ায় বাহাদুর, আর সেই বুলি তার মুখে: হায় ভগবান—হমনে ক্যা কিয়া!

ওরা সকলেই কিন্তু দাঁত বের করে হাসে, থেকে থেকে আবার ধমকও দেয় বাহাদুরকে।

বাহাদুরের ঢের আশাই [illegible] ধমক

দিলাম ওভারসিয়রকে তার হৃদয়হীন আচরণের জন্য। কিন্তু সেজন্য লজ্জা পাওয়া দূরে থাক, উত্তরে লোকটি যা আমাকে বললে, তা পরোক্ষ বিদ্রূপ আর কি—নেপালীটার শয়তানি বোঝবার মত বুদ্ধিই নাকি আমার নেই।

হয়তো সত্যিই ওরা বিশ্বাস করে না যে, বাহাদুর গুরুতরভাবে জখম হয়েছে। বুড়ো দোকানীও একবার অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মতই গম্ভীর স্বরে আমাকে বললে যে, কুলিটার 'নিয়াস' হয়েছে যা এই পাহাড় অঞ্চলে অনেকেরই হয়ে থাকে।

চিকিৎসার বিধানও দিল সে—আগুনে পুড়িয়ে টকটকে লাল লোহার সিক দিয়ে ওর দুই পায়ে কয়েকবার ছেঁকা দিলেই এখনই নাকি ও চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে।

মাথা নেড়ে সায় দিল ওভারসিয়র। আর শুধুই তাই নয়, ওই আসুরিক চিকিৎসা-পদ্ধতি তখনই তারা বাহাদুরের উপর প্রয়োগও করতে চায়।

হাঁ হাঁ করে বাধা দিলাম আমি—আহত অসহায় লোকটিকে মেরে ফেলবার মতলব নাকি ওদের?

ওই রকম একটা আশঙ্কাই আমার মনে আরও প্রবল হয়ে উঠল যখন ওই ওভারসিয়র অযাচিতভাবে আমাকে উপদেশ দিল বাহাদুরের পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে দিয়ে ওই গড্ডুরচটিতেই তাকে ফেলে রেখে যেতে।

জিতেনকেও আমার ওই আশঙ্কার কথা খুলেই বলতে হল।

ঘণ্টাদেড়েক পর দুটি কুলি সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসেছিল সে। তখন খুবই উৎফুল্ল ভাব তার। পথ তাকে টানছে—এগিয়ে যাবার পরিকল্পনাই তারও মনে। বাহাদুরের মজুরি তাকে চুকিয়ে দিয়ে একটি কুলির পিঠে চাপিয়ে তাকে পিপুলকুঠির দিকে রওনা করিয়ে দেবে, তারপর দ্বিতীয় কুলিটিকে নিয়ে আমরা পাড়ি দেব ভেলাকুচির দিকে—সেখানে নাকি আমাদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থাও সে করে এসেছে।

আমারও ইচ্ছা এগিয়ে যাবার, কিন্তু জিতেনের প্রস্তাবে মন সায় দেয় না আমার। একান্তে ডেকে নিয়ে সব কথা খুলে বললাম তাকে, মায় ওই আসুরিক চিকিৎসা-পদ্ধতির খুঁটিনাটিও। তারপর বললাম, ওই হাত-পা, না কোমরভাঙা অক্ষম লোকটিকে নগদ কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে এ রকম

জায়গা [illegible] । কুলির হাতে সঁপে দিলে [illegible] পরিবর্তে সোজা যমালয়েও গি[illegible] উঠতে পারে।

মন দিয়ে শোনবার পর কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইল জিতেন, তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে সে বললে, ঠিকই বলেছেন আপনি—এ অবস্থায় বাহাদুরকে একলা ছেড়ে দেওয়া যায় না। পিপুলকুঠি পর্যন্ত আমাদের ওর সঙ্গে যেতে হবে।

কিন্তু ওই কথা বলতে বলতেই দেখি যে বিরক্তিতে কালো হয়ে উঠেছে তার মুখ। একটু থেমেই হাতের লাঠিখানা সশব্দে মাটিতে ঠুকে রীতিমত তিক্তকণ্ঠে সে আবার বললে, সেই হাওড়া স্টেশনেই আপনাকে বলি নি আমি—ধর্মপথে সবচেয়ে বড় বাধা হল কর্তব্যজ্ঞান। চুলোয় যাক আমাদের বদরীনাথদর্শন। ঘাড়ের বোঝা আগে নামাই।

ফিরে চললাম।

নিজেরই আমার বিশ্বাস হয় না, ঘর-বাড়ি ছেড়ে প্রায় দেড় হাজার মাইল দূরে চলে এসেছি। প্রায় তিন সপ্তাহ হয়ে গেল—কেবল চলছি আর চলছি। দিন পনের কেটেছে এই হিমালয়ের গিরিকন্দর আর আদিম অরণ্যে। শিখরের পর শিখর, উপত্যকার পর উপত্যকা পার হয়ে এসেছি। দুর্গম পথে পায়ে হেঁটেই তো চলেছি প্রায় শ খানেক মাইল। লক্ষ্য বদরীনাথ। খুব কাছাকাছিই এসেছিলাম সেই লক্ষ্যের—সামনে মাইল পঁচিশ মোটে পথ। তবুও আর এগিয়ে না গিয়ে ফিরেই চলেছি।

অভাবনীয় পরিণতি। কোন কষ্টকেই কষ্ট মনে করি নি, গ্রাহ্য করি নি কোন বাধাকেই—সেদিন সকালেও প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং আমার ভাঙা পায়ের ব্যথাকেও নয়। অচল হয় নি আমার সে ভাঙা পা-খানি, সে দুর্যোগও কেটে গিয়েছে। তবুও যাত্রা ব্যর্থ হল আমার।

দুঃসহ ওই ব্যর্থতার বেদনা, কোন দিক থেকেই সান্ত্বনা পাই নে।

আমরা গড়ুরচটিতে উপস্থিত থাকতেই দুটি-একটি করে দেশী ও বিদেশী পথিক দুদিক থেকেই এসে জুটছিল ওই ছোট দোকানটিতে। যোশীমঠের দিক থেকে যাঁরা এসেছেন, আশ্বাসের বাণী শুনিয়েছেন তাঁরা—এখন তেমন আর ভাঙছে না ওদিকের পাহাড়গুলি। অতিরিক্ত মূর্তিমান আশ্বাস তো আমাদেরই জিতেন—একবার নয়, চার-চারবার ওই জায়গাগুলি নিরাপদে

আতক্রম করেছে সে। এগিয়ে [illegible] নিরাপদে পার হতে পারতাম, তবুও এগিয়ে যাওয়া হল না, যেন নির্মম নিয়তি ঠেলে ফিরিয়ে দিল আমাকে।

রূঢ় বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে অভিজ্ঞ পথিকের আশ্বাস মনে হয় যেন উপহাস। উপহাস করছেন স্বয়ং প্রকৃতিও। আমরা বিপরীত দিকে যাত্রা করবার সঙ্গে সঙ্গেই রোদ উঠল।

আমার মনের কাটা-ঘায়ে নুনের ছিটেও পড়ে। মাঝপথ থেকে ফিরে যাচ্ছি শুনে সহানুভূতি প্রকাশ করে কেউ কেউ। একবার একটু ভর্ৎসনাও শুনতে হল। সেই সঙ্গে একটি বক্রোক্তিও।

পথে দেখা হল এক এক করে পাটনার সেই যাত্রীদলের সব কজনের সঙ্গেই। আবহাওয়ার উন্নতি হয়েছে দেখে পিপুলকুঠি থেকে যার যার বাহনের উপর আসীন হয়ে রওনা হয়েছেন তাঁরা। আজই সকালে বৃষ্টি মাথায় করে বদরীনাথের দিকে যাত্রা করছি দেখে আমাদের দৈহিক মঙ্গলকামনায় উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন তাঁরা। এখন তাঁরাই আবার বিমর্ষ হলেন আমাদের পারত্রিক কল্যাণের চিন্তায়। চুক্তিমত পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে দিয়ে অনায়াসে যে কুলিকে বিদায় করে দেওয়া চলে—যেমন তাদের দীর্ঘ যাত্রাপথে একাধিক অসুস্থ কুলিকে তাঁরাই বিদায় করেছেন—তেমনি একটি কুলির পিছনে বদরীনাথকে ছেড়ে ছোটে নাকি কোন ধর্ম্মপ্রাণ যাত্রী!

ম্লানমুখে শুকনোমত একটু হেসে আমি উত্তরে বললাম, স্বয়ং বদরীনাথজীই তো ছাড়লেন আমাকে—তাঁর দোরগোড়া থেকে ফিরিয়ে দিলেন।

ঐসে মত্ বোলিয়ে বাঙালীবাবু।

প্রবীণ বিহারী উকিল গম্ভীর মুখে ভ্রূভঙ্গি করে মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন আমাকে: ভগবান কভী কোইকো ছোড়তে নহী হ্যায়। আপ অপনা দিলমে দেখিয়ে। শায়েদ আপহীকে মনমে দর্শন করনেকী ইচ্ছা নহী থী।

মনে জোর পাই নে প্রতিবাদ করবার। শ্রদ্ধা ভক্তি ও ঐকান্তিক আগ্রহ যে আমার মনে নেই তা আমার চেয়ে বেশী আর কে জানে—পথ চলতে চলতে ক্রমাগতই রূপ দেখে বিহ্বল হয়েছি, দেহ ক্লান্ত হলে ঘরের আরাম বা শহরের নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে আমার মন, চড়াই ভাঙতে ভাঙতে মনের চোখে যেন হাতছানি দেখেছি পিছনে ফেলে-আসা সমতলভূমির। তারপরেও যেটুকু নিষ্ঠা ও আগ্রহ ছিল তাও অটুট আছে

বলে এখন আ[illegible] নে। যে ধস বাহাদুরের পা না কোমর ভেঙেছে সে আমার মনটাকেও তো রেহাই দেয় নি—ভেঙে দিয়েছে আমার নিজের সাহস ও উদ্দমকেও। সুতরাং মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাবার পথে আহত বাহাদুরের অক্ষম দেহটাই যে এখন একমাত্র বাধা তা আমি জোর গলায় ঘোষণা করি কেমন করে!

মনের অগোচরে পাপ নেই বলেই অপরাধীর মত ম্লানমুখে চুপ করেই ছিলাম। বোধ করি তাই বুঝতে পেরেই ভদ্রলোক আবার একটু আশ্বাস ও উপদেশ দিলেন আমাকে: জো কিয়া অচ্ছা হী কিয়া আপনে। লেকিন পিপুলকুঠিমে জাকরকে ইস কুলিকো ছোড় দিজিয়ে। ঔর উহাঁসে দুসরা এক মজবুত কুলি লেকর ফির আ জাইয়ে। ইতনা নিকটতক আকরকে ভী দর্শন নহী করকে ঘর লৌট জানা কোই কামকী বাত নহী হ্যায়।

ওই যা একটু আশা আমার ভাঙা মনের কোন এক কোণে টিমটিম করে জ্বলছিল। নিবিড় অন্ধকারে অত্যন্ত ক্ষীণ একটি দীপশিখা যেন। কিন্তু পিপুলকুঠিতে পৌছতে না পৌছতেই তাও নিভে গেল।

শহর এলাকায় প্রবেশ করতেই জিতেনের সঙ্গে দেখা। পথের ধারেই দাঁড়িয়ে ছিল সে। আমাকে দেখেই বললে, কোন লাভ হল না মণিদা। দুর্ভোগ আরও ভুগতে হবে।

পিপুলকুটিতে যা আছে তা একটি ডিসপেনসারি মাত্র। তাতেও ডাক্তার নেই। যাত্রীর মরসুম ফুরিয়ে আসছে বলে গুটিকয়েক শিশি-বোতল নিয়ে ঠাটটুকু যিনি বজায় রেখেছেন তিনি কম্পাউণ্ডার। আবাসিক হাসপাতাল আছে সেই চামৌলিতে।

সে তো আরও প্রায় দশ মাইল দূরে!

উত্তরে জিতেন তিক্তকণ্ঠে বললে, কেবল দশ মাইল নয়, কম করেও চোদ্দ ঘণ্টার পথ। কাল সকাল আটটার আগে বাস পাওয়া যাবে না।

রোগী নিয়ে তা হলে এখানেই আমাদের রাত কাটাতে হবে?

তা ছাড়া আর উপায় কি।

শুনতে শুনতে নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে আমার। সারাটা পথ বাহাদুরের কাতরোক্তি শুনতে শুনতে এসেছি। একবার তার গায়ে হাত দিয়েছিলাম—তখন মনে হয়েছিল যে জ্বর এসেছে তার। আর নিজের জন্যও আমার দুশ্চিন্তা কি কম। এ তো আবার সেই পিপুলকুঠি যেখানে কাল ভাল

এক বাটি চা পাই নি, অসংখ্য ছারপোকার অবিরাম নির্মম দংশনের জন্য সারারাত চোখের দুটি পাতা এক করতে পারি নি। সেই সব স্মৃতি এখন একসঙ্গে মনে জেগে উঠল আমার। আমি রুদ্ধনিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় থাকতে হবে—আবার সেই ধর্মশালায় ?

না।—মাথা নেড়ে উত্তর দিল জিতেন : অন্য একখানা ঘর পেয়েছি।

শুনে একটু আশ্বস্ত বোধ করলেও তখনই আবার বাহাদুরের কথা মনে পড়ে গেল আমার। তাকে নিয়ে কাণ্ডিওয়ালা ততক্ষণে কাছে এসে গিয়েছে। দেখি যে পিঠের ঝুড়িতে চোখ বুজে নির্জীবের মত বসে আছে বাহাদুর। যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট তার মুখ, দুই চোখের কোণ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে মনে হল।

আমি ফিরে আবার জিতেনের মুখের দিকে চেয়ে বললাম, ঘরই না হয় পাওয়া গেল। কিন্তু এটাকে নিয়ে কি করব ?

জিতেন উত্তর দিল, কম্পাউণ্ডার লোক ভাল। বলেছেন যে, আমাদের ঘরে এসেই রোগী দেখে যাবেন তিনি। ঘরে যান আপনারা—আমি ডেকে আনছি তাঁকে।

॥ ২৩ ॥

সেই পিপুলকুঠিই তো! আজ সকালেই জিতেন বলেছিল যে, এখানে থাকার চেয়ে জাহান্নমে যাওয়াও ভাল। অথচ ঘণ্টাদশেক পরেই এ কি বিস্ময়কর পরিবর্তন তার! কি করে যে হল তা আজও ভেবে পাই নে।

সত্যিই ভাল ঘর। বেশ ভাল। আশাতীত রকমের ভাল। গৃহস্থ বাড়ির ধবধবে তকতকে শোবার ঘর। এক রাত্রির ভাড়া এক টাকা, খুশী হয়েই কবুল করেছে জিতেন।

ভাল কেবল ছাদ দেয়াল মেঝে নিয়ে ওই ঘরখানাই নয়, যাদের ঘর তারাও ভাল। ভাল চারিদিকের পরিবেশও।

দিন কেটেছে তেপান্তরের মাঠে—বল্লমের ফলার মত কখনও বৃষ্টির ফোঁটা, কখনও বা হু-হু করা বাতাসের খোঁচা খেয়ে খেয়ে। তেমনি তীক্ষ্ণ খোঁচার মত বুকে এসে বিঁধেছে থেকে থেকে এক একজন মানুষের মুখের কথা বা নীরব উপেক্ষা। কিন্তু এখন একেবারে বিপরীত।

আশ্রয় পেয়েছি যেন একটি সুরক্ষিত দুর্গের মধ্যে। না মন্দির এটি! ঘরে ঢুকতেই ধূপের গন্ধ পেলাম।

যাঁর বাড়ি তিনিই সপরিবারে বাস করেন পাশের ঘরখানাতে। ধূপকাঠি পুড়ছে সেখানে। কানে এল বুঝি গৃহলক্ষ্মীর কঙ্কণঝঙ্কার।

আমরা সদলবলে ঘরে গিয়ে ঢুকতে না ঢুকতেই দুটি ছেলে মেয়ে নাচতে নাচতে ছুটে এল। একটির তো পা টলছে—এতই ছোট সে। তাদের একজন আধো আধো স্বরে বলে, জয় বদরীবিশালকী। দ্বিতীয়টি বললে, এক পাই দো শেঠ।

মুখে 'হঠ জা' 'হঠ জা' বলতে বলতে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ওই শিশুদের মা—মাঝবয়সী মহিলা একজন। ছোটটিকে কোলে তুলে নিয়ে তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন, বৈঠো বাবুজী, আরাম করো। বহুত তখলিফ হুয়া হোগা সব কোইকা। কৌন জখম হুয়া? দেখে দেখে।

ততক্ষণে কাণ্ডিকুলি দ্বিতীয় কুলিটির সাহায্যে বাহাদুরকে ঝুড়ি থেকে নামিয়ে মেঝের উপর বসিয়ে দিয়েছে। মহিলাটি আমার হাতের সঙ্কেত বুঝে বাহাদুরের কাছে গিয়ে বললেন, ক্যা হুয়া রে? কাঁহাপর চোট লগা? ক্যায়সা বুরবক তু জো সামালকে চল নহী সকে?

তিরস্কারের ভাষা হলেও কোমল কণ্ঠস্বর মহিলার। অনেক দূর থেকে একটি বিস্মৃতপ্রায় সঙ্গীতের রেশ আমার কানে ভেসে এল যেন। বাহাদুরের চোখে আবার দেখি যে ধারা নেমেছে।

ঘটনাগুলি সত্যিই যে ঘটছে তা যেন বিশ্বাস হয় না আমার।

তবুও ঘটল অমনই আরও অনেক ঘটনা।

একটু পরেই জিতেনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ওই ঘরে এসে প্রবেশ করলেন স্থানীয় ডিসপেনসারির ভারপ্রাপ্ত কম্পাউণ্ডার। তাঁর বিদ্যা কম, কিন্তু হৃদয় আছে। আবাসিক হাসপাতাল এখানে নেই বলে একটু যেন লজ্জিতই তিনি। ভদ্র, অমায়িক ব্যবহার। যত্ন করে বাহাদুরকে তিনি দেখলেন, দেশী বুলিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা কথা তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর জিতেনকে লক্ষ্য করে বললেন, এখন কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তবে জ্বর যখন হয়েছে তখন ভিতরের কোন একটা যন্ত্র নিশ্চয়ই বিকল হয়েছে ধরতে হবে। আমি তেমন কিছু করতে পারব না। কাল সকালেই আপনারা ওকে চামৌলির হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবেন।

শুনে জিতেন অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললে, সেটাও এই রকম হাসপাতালই হবে না তো?

না বাঙালীবাবু—লজ্জিত হাসিমুখে প্রতিবাদ করলেন ভদ্রলোক—লক্ষ্ণৌ-এর মত না হলেও বেশ ভাল হাসপাতাল সেটি। ঔষধ পথ্য শুশ্রূষা সব ব্যবস্থাই আছে সেখানে। ডাক্তারও গুণী লোক—অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জন।

বাহাদুরের নির্দেশমত তার ব্যথার জায়গাটাতে কি একটা লোশন লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন তিনি। দু-তিনটি বড়িও দিলেন খেতে। চলৎশক্তিহীন রোগীর জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম অবিলম্বেই সরকারী মেথরের মারফতে আমাদের ঘরে পৌছিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজের অক্ষমতার জন্য আর একবার আমাদের কাছে মার্জনা চেয়ে তবে বিদায় নিলেন তিনি।

ঔষধের পর পথ্য। সারাটা দিন না খেয়ে আছে বাহাদুর, অথচ গায়ে বেশ জ্বর। সুতরাং জিতেনকে বললাম ওর জন্য কোন দোকান থেকে একটু দুধ আনতে।

কিন্তু বারণ করলেন সেই মহিলা। এতক্ষণ কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। রোগীর সঙ্গে এবং আমাদের সঙ্গে কম্পাউণ্ডারের যেসব কথাবার্তা হয়েছে তার সবই শুনে থাকবেন। আমি দুধের কথা তুলতেই তিনি মাথা

নেড়ে বললেন, নহী বাবুজী। বুখারি রহনেসে ভৈসীকে দুধ নহী পিলানা চাহিয়ে। উসকো দেনে হোগা সাবুদানা।

বিজ্ঞের মত কথা, গিন্নীর মত ভারিক্কী চাল। তবু বেশ ভাল লাগল তা। আমি হেসে বললাম, কিন্তু বহিন, সাবুদানা এখানে পাব কোথায়?

কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করে তিনি উত্তর দিলেন, দোকান থেকে এনে দাও, আমার ঘরেই জ্বাল দিয়ে দিচ্ছি আমি। উনান তো আমার জ্বলছেই। তোমরা আমার হাতে যদি খাও তবে তোমাদের জন্যও ডালরুটি দিতে পারি আমি।

আগের মতই কোমল মধুর স্বর; হাসি হাসি মুখ মহিলার। মূর্তিমতী সান্ত্বনা যেন। গতকাল অপরাহ্ণ থেকে আজ ঘণ্টাখানেক পূর্ব পর্যন্ত পর পর অনেকগুলি দুর্ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে আমার মনের মধ্যে যত ক্ষোভ ও গ্লানি জমেছিল সব যেন দূর হয়ে গেল এই সদ্যপরিচিতা পার্বত্য রমণীর সহৃদয় ব্যবহারে। তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করে আমি বললাম, আমরা, বহিন, জাত মানি নে। তোমার হাতের ডালরুটি বদরীনাথের প্রসাদ মনে করেই খাব আমরা। কিন্তু বিনিময়ে আমি যদি কিছু তোমাকে দিই তুমি নেবে তো?

মহিলাকে একটু বিব্রত দেখে পরক্ষণে খুলেই বললাম কথাটা। শুধু বলা নয়, খুলে দেখিয়েও দিলাম আমার প্রস্তাবের নিরাবরণ বাহ্য রূপও।

কেবল সেই কোটা তরকারিগুলিই নয়, চামৌলির বাজার থেকে আগের দিন তেল-নুন-মসলা ইত্যাদি যা যা কিনেছিলাম সব ঝোলা থেকে বের করে দিয়ে আমি আবার বললাম, তোমার ভাণ্ডার থেকে তোমাদের জন্যও আজ আর কিছুই খরচ করবার দরকার নেই। এইগুলিই রাঁধ তুমি। অবশিষ্ট যা থাকে তাও তোমারই। ভবিষ্যতে আবার আমাদের প্রয়োজন হলে তখন কিনে নেব আমরা।

এত সব উপকরণ দেখে যত খুশী মহিলা, বিব্রত যেন তার চেয়ে অনেক বেশী। ভাল ভাল জিনিস তিনি রাঁধলে আমাদের মুখে রুচবে কিনা সেইজন্য উদ্বেগ তাঁর। আমি আশ্বাস দিলেও আশ্বাস পান না তিনি। মা মাসী ভগিনী দুহিতার কথা মনে পড়ে যায় আমার।

বিস্ময়ের ঘোরটা আর কাটতে চায় না। বাইরে আসবার পর বরং আরও বাড়ছে তা।

শেষভোজন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার পর চায়ের পিপাসা মেটাবার জন্য দোকানে গিয়েছিলাম। গতকালের তিক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি তখনও মন থেকে মুছে যায় নি। স্বতন্ত্র একটু গরম জল সাহস করে চাইতে পারলাম না। অন্য দশজনের জন্য তৈরী চা যত বিস্বাদই হোক না কেন, তাই খানিকটা গলাধঃকরণ করে যথাসম্ভব মৌতাত জমাবার উদ্দেশ্যে পথের উপরে দাঁড়িয়েই এক গ্লাস চা চেয়েছিলাম। কিন্তু ভরা গ্লাসটি আমার দিকে বাড়িয়ে ধরেও দোকানী আমার মুখের দিকে চেয়ে আবার টেনে নিল তা। তারপর একটু সন্দিগ্ধ স্বরে সে বললে, আপহী বাবুজী কাল গরম পানী মাংগা থা না ?

আমার সন্দেহ অন্য রকম—কাল অমন একটি ফরমাশ করেছিলাম বলে আজ ফরমাশ না করেও অপমানিত হতে হবে নাকি! বিব্রত ভাবে মাথা নাড়লাম আমি।

কিন্তু না, হাওয়া ইতিমধ্যে বদলে গিয়েছে। আমাকে সঠিক ভাবে চিনতে পারবার পর দোকানী স্মিতমুখে বললে, উঠকে বৈঠিয়ে বাবুজী। হম পাঁচ মিনিটকে অন্দর আপকো আচ্ছা গরম পানী দেঙ্গে।

ভাল খাদ্যের প্রতিশ্রুতির চেয়েও অবিলম্বে সুপেয় চা পাবার সম্ভাবনা ঢের বেশী প্রীতিপ্রদ আমার কাছে। আমি পুলকিত হয়ে উঠে বসলাম।

কেবল ভাল চা নয়, নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে পরম উপাদেয় এবং উপযুক্ত নোনতা জলখাবারও পাওয়া গেল।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতেই লক্ষ্য করেছিলাম দোকানের মেঝেতে একটি জ্বলন্ত স্টোভ এবং তার কাছেই খুব চটকদার একখানা শাড়ি পরা খুব ফর্সা এক ভদ্রমহিলাকে। মাথায় কাপড় নেই এবং নাকে নাকছাবি আছে দেখে যা অনুমান করেছিলাম তার সমর্থন পেলাম ওই ঘরের মধ্যেই সাদা পাঞ্জাবি এবং লুঙ্গির মত করে সাদা ধুতি পরা সুদর্শন একজন পুরুষকে দেখে। দক্ষিণ-ভারতীয় দম্পতি তাঁরা।

ভদ্রলোক দোকানীর ভাণ্ডার থেকে 'উপমা' প্রস্তুত করবার জন্য আবশ্যকীয় উপাদান সংগ্রহ করছিলেন। নামটা আমার কানে গিয়েছিল, তারপর বস্তুরও ভাগ পেলাম আমি।

বলা নেই কওয়া নেই, ভদ্রলোক পাতায় করে খানিকটা সেই উপাদেয় খাদ্য এনে দিলেন আমাকে। একেবারে টাটকা—তখনও ধোঁয়া উঠছে, আর খাঁটি ঘৃতের সুগন্ধ তাতে।

সৎকর্ম বা অপকর্ম যা আমি করেছিলাম তা একখানা বিস্কুট ওই দোকান থেকে পয়সা দিয়ে কিনেও দাঁতের অভাবে চিবুতে না পেরে পিরিচের উপর ফেলে রাখা ; তারপর শুধু চা-ই ঢকঢক করে গিলছিলাম আমি।

ভদ্রলোক খাদ্যটুকু সসঙ্কোচে আমাকে পরিবেশন করবার পর ইংরেজীতে বললেন, আপনি অনুগ্রহ করে এটুকু খেলে আমার স্ত্রী ও আমি উভয়েই খুশী হব। যাঁর জন্য আমাদের দেশীয় এই খাদ্য আমার স্ত্রী ওই ধার-করা স্টোভের উপর নিজের হাতে এইমাত্র প্রস্তুত করলেন সেই আমার মায়েরও দাঁত নেই—ঠিক আপনারই মত অসহায় অবস্থা তাঁর।

ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হলেও লজ্জা নয়, আনন্দের রোমাঞ্চ অনুভব করলাম আমি। চমকে মুখ ফিরিয়ে দেখি যে, ভদ্রলোকের মুখমণ্ডলে অনুকম্পা নয়, সশ্রদ্ধ অনুনয় ফুটে রয়েছে। অদূরে মেঝের উপর তাঁর স্ত্রী হাসিমুখে চেয়ে আছেন আমার দিকে। নিশ্চয়ই তিনিই প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন লোহার মত শক্ত বাসী বিস্কুটখানাকে নিয়ে আমার দুরবস্থা ; আমি তাঁর দিকে তাকাতেই তিনিও ইংরেজীতেই বললেন, আমাদের ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন ; আর একটুও বিব্রত হবেন না আপনি—আমাদের মায়ের জন্য, এই দেখুন, অনেক আছে।

যে কোন অবস্থাতেই 'উপমা' প্রিয় খাদ্য আমার ; সেদিন ওই অবস্থায় ও জিনিস তো মনে হল যেন অমৃত।

দোকানে বসেই একটু আলাপ হল ওই দম্পতির সঙ্গে। তামিল ব্রাহ্মণ—চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারির সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে একটু নাকি সম্বন্ধও তাঁদের আছে। মাদুরার কাছাকাছি একটি গ্রামে পৈতৃক বাসভূমি ভদ্রলোকের, তবে চাকরি উপলক্ষে নানা শহরে ঘুরে বেড়ান তিনি। কলকাতাতেও একাধিকবার এসেছেন বললেন, এবং সেইজন্য বাঙালী দেখলেই খুশী হন তিনি—কলকাতার কালীঘাট, চিড়িয়াখানা, ময়দান প্রভৃতির স্মৃতি নিয়ে কিছুক্ষণ রোমন্থন করবার সুযোগ পাওয়া যায় বলে।

তবে সে রাত্রে কেদারবদরীর স্মৃতি নিয়েই বিভোর দুজনে। ভদ্রলোক তাই কিছু কিছু শোনালেন আমাকে। বৃদ্ধা জননীকে নিয়ে নির্বিঘ্নে উভয় তীর্থই দর্শন করে ফিরতে পেরেছেন বলে যেমন গভীর পরিতৃপ্তি তাঁর মনে তেমনি দুই দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতাও। আমাদের দুর্ঘটনার খবর আমার মুখ থেকে শুনে উভয়েই সমবেদনা প্রকাশ করলেন।

আমার মনের ক্ষতের উপর আর এক পোঁচ প্রলেপ লাগল যেন। মাদ্রাজী

দম্পতির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একা একাই ঘুরে বেড়ালাম কিছুক্ষণ। সেই সব পথঘাট, সেই ধর্মশালা, সেই সব ঘরবাড়িই এখন যেন নতুন ঠেকছে চোখে। ধর্মশালার দোতলায় উঠে গিয়ে সব কখানা ঘরই এক একবার উঁকি দিয়ে দেখলাম। আজ আর তত ভিড় নেই ওখানে, বাজারেও ভিড় কম। কালকের মত হাঁড়িপানা মুখ আজ আর একটিও চোখে পড়ল না।

আমাদের নতুন বাসায় পাতানো বহিনের কাছ থেকে কেবল যে মুখরোচক খাদ্যই পাওয়া গিয়েছে তা নয়, শুকনো কম্বলও পাওয়া গিয়েছে খানচারেক। সে রাত্রে নিদ্রা সম্পূর্ণ নির্বিঘ্ন—না বৃষ্টির ফোঁটা, না দুর্গন্ধ, না একটি ছারপোকা।

অথচ সেই পিপুলকুঠিই!

পরদিন সকালে উঠে মুখ ফুটে বলেই ফেললাম জিতেনকে: ভুল হয় নি তো আমাদের? এ কি সত্যিই পিপুলকুঠি?

উত্তর না দিয়ে কেবল হাসল জিতেন—তার মনেও তত আর ক্ষোভ নেই।

দিনের আলোকে গৃহস্থবাড়ির ঝকঝকে তকতকে ঘরখানি আরও ভাল দেখাচ্ছে। বাইরে আজ আবহাওয়াও ভাল। বৃষ্টি তো নেই-ই। তার উপর তেমন উজ্জ্বল না হলেও রোদ উঠেছে। অল্প শীতে ভালই লাগে সে রোদটুকু। প্রাতঃকৃত্যের তাগিদ মেটাবার জন্য কিছুটা পথ হাঁটতে হল। তাও ভালই লাগল। শৌচাগার দেখলাম বেশ পরিচ্ছন্ন জমাদার মোতায়েন আছে সেখানে। হাসিমুখে সেলাম করল সে। দুটি পয়সা বকশিশ পেয়েই খুশীতে একেবারে ডগমগ।

মুখহাত ধোবার জন্য আরও একটু দূরে কলতলায় যেতে হল।

ভিড় দেখে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ পাশের কোন একটা বাড়ি থেকে যেন পরিচিত একটা স্বর কানে এল আমার। সংস্কৃত মন্ত্র আবৃত্তি করে কেউ বুঝি কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করছে—অথবা অমনি আবৃত্তি করছে হয়তো। আর একটু মনোযোগ দিতেই কয়েকটি কথাও বুঝতে পারলাম। তার পর সম্পূর্ণ শ্লোকটিই মনে পড়ে গেল আমার:

"ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
ওঁ মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবঃ রজঃ॥"...ইত্যাদি

শুনেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল মন—এ যে আমারই অন্তরের প্রতিধ্বনি। কতকটা এই রকমই তো মনে হচ্ছিল যেন আমার—এখানকার আকাশ,

বাতাস, মাটি সবই আজ মনে হচ্ছিল মধুময়। বাইরে থেকে মধু গিয়ে জমেছে আমার মনে, না আমারই মনের মধু বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে—তাই ভাবতে ভাবতে আমার আসল কাজটাই ভুলে গেলাম আমি।

তন্ময় হয়ে ভাবছিলাম, কিন্তু হঠাৎ একটা ছেদ পড়ল যেন।

চোখ কান ইত্যাদি ইন্দ্রিয়, এমন কি মন ছাড়াও আরও কিছু বোধ হয় আমাদের মধ্যে আছে যার মাধ্যমে পারিপার্শ্বিকের কোন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমরা অকস্মাৎ সচেতন হয়ে উঠি। তাই হল আমার। চোখে না দেখেও হঠাৎ এক সময়ে খুব তীব্রভাবে আমি অনুভব করলাম যে, কে যেন একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে। সচেতন হয়ে সন্ত্রস্ত ভাবে চোখ দিয়ে খুঁজতে শুরু করেই পরক্ষণেই দেখতেও পেলাম তাকে।

শুধু যে তাঁর চোখ দুটি দিয়েই আমাকে দেখছেন তা নয়, হাসিমুখে দেখছেন তিনি। পুরুষ নয়, একজন মহিলা। বেশ সুন্দর মুখখানি।

বিব্রত হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম আমি। কিন্তু সেই সহাস্যদৃষ্টি তবুও আমাকে বিদ্ধ করছে বুঝে আবার তাকাতে হল সেই মুখখানির দিকে। আমার চোখে চোরা চাউনি, কিন্তু সম্পূর্ণ অকুণ্ঠিত দৃষ্টি সেই মহিলার। তখনও তিনি আমারই দিকে চেয়ে হাসছেন।

প্রথমে কেবলই অস্বস্তি বোধ করেছিলাম, এখন একটু বিরক্তিও জেগে উঠল মনে। কিন্তু তার তাড়নায় তৃতীয় বার মহিলার দিকে তাকাতেই বিদ্যুদ্দীপ্তির মত মনে পড়ে গেল আমার। অচেনা তো উনি নন—কাল রাত্রে উনিই আমায় উপহার দিয়েছিলেন তাঁর নিজের হাতের তৈরি 'উপমা'। সেই মান্দ্রাজী ভদ্রলোকের স্ত্রী উনি। কাল রাত্রেও তো দেখেছিলাম—ঠিক এমনি সহাস্য চোখেই কালও আমার দিকে তাকিয়েছিলেন উনি।

চিনতে পারবার পর যা কিছু সঙ্কোচ আমার তা প্রথমেই তাঁকে আমি চিনতে পারি নি বলে। মাফ চাইলাম আমার সে ভুলের জন্য। উনি উদার-ভাবে ক্ষমাও করলেন। তার পর ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল আমাদের। আমার অন্তরে সঞ্চিত মধুর পরিমাণ আরও একটু বৃদ্ধি পেল যেন।

নিজেদের বাসায় ফিরে আসতে আসতে সেই বৈদিক মন্ত্রই মনে মনে আবৃত্তি করছিলাম আমি। কিন্তু ঘরে এসে ঢুকতে না ঢুকতেই তাল কেটে গেল যেন।

জিতেনের অবস্থা দেখি একেবারে অন্তরকম।

আমাদের ঝোলাঝুলি থেকে সব জিনিস বের করে মেঝেতে চারিদিকে ছড়িয়ে মাঝখানে চটি একখানা বই হাতে নিয়ে বসে অন্যমনস্ক হয়েছে সে। মুখের ভাব তার গম্ভীর ; চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন একটা আবেশ।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ব্যাপার কি জিতেন?

উত্তর না দিয়ে হাতের বইখানা সে আমার হাতে তুলে দিয়ে বললে, ওই জায়গাটা একবার পড়ে দেখুন তো।

কনখলের শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম থেকে যে খানকয়েক প্রচার-পুস্তিকা বিনা-মূল্যে পাওয়া গিয়েছিল তারই একখানা বই। কোন একটি ঝুলিতে এতদিন অন্যান্য জিনিসের নীচে অযত্নে চাপা পড়ে ছিল। ঝুলি উপুড় করবার পর প্রথমে মেঝেতে এবং তারপর জিতেনের চোখে পড়েছে।

এখন আমার চোখেও পড়ল। স্বামী বিবেকানন্দের বহুপ্রচলিত একটি রচনা থেকে ক্ষুদ্র একটি উদ্ধৃতি :

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন পূজিছে ঈশ্বর।"...

জানা কথাই তো। তবে তা নিয়ে জিতেনের এত ভাবনা কেন?

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। শুনে জিতেন মৃদুগম্ভীর স্বরে বললে, বদরীনাথ শেষে এইরূপেই আমাদের দর্শন দিলেন নাকি?—হাতের ইঙ্গিতে বাহাদুরকে দেখিয়ে দিল সে।

চমকে উঠলাম আমি—দেহের শিরায় শিরায় আমার অকস্মাৎ যেন অত্যন্ত উচ্চ শক্তির তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চারিত হয়েছে। এত কথাও মনে আসে ছেলেটার!

তার মন্তব্যের উত্তর না দিয়ে অদূরে বাহাদুরের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলাম আমি। চোখ বুজে শুয়ে আছে সে, জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে তার। কপালে হাত দিতেই বেশ বুঝতে পারলাম আমি যে, গায়ে তার কাল রাত্রের চেয়েও বেশী জ্বর আছে এখন। তবে আমার ছোঁয়া পেয়েই জবাফুলের মত লাল চোখ দুটি মেলে বাহাদুর কাতরকণ্ঠে বললে, বাবুজী!

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালাম আমি। জিতেনকে বললাম, জিনিসপত্র গুছিয়ে ঝোলাঝুলি বেঁধে ফেল তুমি। আমি বাসের টিকিট কিনতে যাচ্ছি।

॥ ২৪ ॥

হতভাগাটাকে নিয়ে সমস্যার আমাদের অন্ত নেই।

পিপুলকুঠিতে থাকতেই বাহাদুরের প্রাপ্য টাকাটা হিসাব করে তাকে দিতে গিয়েছিলাম, কিন্তু নেবে না সে। ওই জ্বরগায়েও হাত নেড়ে, মাথা নেড়ে সে কি দৃঢ় প্রত্যাখ্যান তার—হমনে আপকী যাত্রা নষ্ট কর দী। তব রূপয়া কৈসে লে সকতা। নহী লেঙ্গে হম—কভী নহী লেঙ্গে।

বেশী পীড়াপীড়ি করতে ভরসা হয় না। ১০২° ডিগ্রী জ্বর দেখেছি তার গায়ে। বেশী উত্তেজিত হলে নতুন কোন উপসর্গ দেখা যদি দেয়—সেই আশঙ্কা।

সুতরাং টাকাগুলি আবার নিজের পকেটেই যথাস্থানে রেখে দিয়ে বিব্রত-মুখে কুলির প্রতীক্ষা করছিলাম। তখন হঠাৎ পায়ে টান লাগল আমার।

টান নয়—বাহাদুরই আমার একখানা পা জড়িয়ে ধরেছে। আমি তার দিকে তাকাতেই কাতরস্বরে সে বললে, আর একটা কুলি এখান থেকে নিয়ে তোমরা, বাবুজী, বদরীবিশাল চলে যাও। আমার জন্যে আর হয়রান হয়ো না তোমরা। কেবল একটা গাড়িতে আমাকে তুলে দাও—তা হলেই হবে।

সেই গরুর মত ড্যাবডেবে চোখ তার; মুখের ভাবে সকাতর সনির্বন্ধ অনুনয়। চেয়ে থাকা যায় না তার সেই মুখের দিকে।

সেইজন্যই তার ওই কথা শোনবার পর চুপ করেও থাকতে পারলাম না। বললাম, গাড়িতে না হয় তুলে দিলাম, কিন্তু যাবি কোথায় তুই ?

উত্তরে সে মৃদুস্বরে বললে, শ্রীনগর।

শুনে অমন অবস্থাতেও হাসি পেল আমার। বললাম, শ্রীনগরে কোথায় যাবি তুই ? রুক্মিণীর কাছে ?

মাথাটা একটু ঝেঁকে স্বীকার করল বাহাদুর। আমি জিতেনের মুখের দিকে চেয়ে দেখি যে, সেও মুচকি মুচকি হাসছে। আমার চোখের দৃষ্টিতেই মনের প্রশ্ন বুঝতে পেরে সে বললে, শ্রীনগরে ওর ভাবী শ্বশুরবাড়িতে ওকে পাঠাতে পারলে সব দিক দিয়েই ভাল হত। কিন্তু লোকটা যে একেবারে অচল। তার উপর এত জ্বর রয়েছে ওর গায়ে। একেবারে একা একা ওকে আমরা ছেড়ে দিই কেমন করে ?

ওই দ্বন্দ্বই আমারও মনে। সুতরাং মৌন থেকেই সায় দিতে হল। একটু পরে

জিতেনই পুনরায় বললে, এ[illegible] ওকে পরীক্ষা না করালে কিছুই ঠিক করা যাবে না। সুতরাং চামোলির হাসপাতালে ওকে নিয়ে যেতে হবেই। আর অন্ততঃ সে পর্যন্ত ওর সঙ্গে না গিয়ে আমাদেরও নিস্তার নেই।

তার মানে বদরীনাথ থেকে আরও দশ মাইল পিছিয়ে যাওয়া। তাই যেতে হল। ফিরে আবার যখন চামোলি গিয়ে পৌছলাম তখন বেলা প্রায় এগারটা। সেখানে নতুন ফ্যাসাদ আবার। প্রথমে তো হাসপাতালে যেতেই চায় না বাহাদুর ; বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দেবার পর আমাদের জন্য নতুন এক সমস্যার সৃষ্টি করল সে।

তখন একেবারে বিপরীত আচরণ তার। দুর্ঘটনা ঘটবার পর থেকেই ক্রমাগতই তো সে আমাদের অনুরোধ করে আসছিল তাকে ফেলে রেখে আমাদের গন্তব্য পথে এগিয়ে যাবার জন্য। সেই লোকটিরই এ কি হল এখন !

হাসপাতালের ঘরে মেঝের উপর আধ-শোয়া অবস্থায় দুই হাতে আমার পা জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বাহাদুর বললে, হমকো ছোড়কর মত জায়ো বাবুজী—তব তো হম মর জায়েঙ্গে।

যা আশঙ্কা করেছিলাম তা নয়। আর যা ভাবি নি এ যে তাই !

সংস্কৃতি ও সভ্যতার পীঠস্থান কলকাতার বাসিন্দা আমি। জনকল্যাণ রাজ্যের রাজধানী মহানগরী কলকাতা। সেখানেও শক্ত রোগীকে অ্যাম্বুলান্স গাড়িতে চাপিয়ে বড় বড় হাসপাতালের দোরে দোরে ধরনা দিয়েও কতবারই তো ভর্তি করতে পারি নি। এই অসভ্য পার্বত্য এলাকায় ছোট একটি হাসপাতালে অপরিচিত যাত্রী আমি, পারব কি এই কুলিটাকে ভর্তি করতে।

এমনি একটি আশঙ্কাই মনে ছিল আমার।

সুতরাং বাহাদুরকে উপরে সড়কের ধারেই জিতেনের জিম্মায় রেখে একাই আমি নীচে নেমে গিয়েছিলাম খোঁজ-খবর করতে। সেখানে কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমার সব আশঙ্কার নিরসন হল।

ছোট হাসপাতাল, সীমিত আয়োজন। কিন্তু ওটাকে পরিচালনা করছে যে মন সেটা ছোট নয়।

রোগীর তেমন ভিড় যে [illegible] সেটা নিশ্চয়ই একটা বড় কারণ। তবু সেটাকেই একমাত্র কারণ বলে মানতে পারি নে।

হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার আমার মুখ থেকে রোগীর ইতিহাস ও রোগের বর্ণনা শুনেই তৎক্ষণাৎ বললেন, নিয়ে আসুন রোগীকে, আমি এক্ষুণি ভর্তি করে নিচ্ছি।

যেমন কথা তেমনি কাজ। ডাক্তার রোগী দেখছেন, সঙ্গে সঙ্গেই কেরানী না কম্পাউণ্ডার আমার মুখ থেকে শুনে রোগীর নাম-ধাম ইত্যাদি ভর্তির খাতায় লিখে নিচ্ছেন। লিখতে লিখতেই জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, ওর টাকাপয়সা কিছু আছে নাকি? থাকলে আপিসে জমা করে দেওয়াই নিরাপদ।

আমার নিজের একটি বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল তাতে। বাহাদুরকে দ্বিতীয়বার আর জিজ্ঞাসা না করেই তার পাওনা সব টাকা তার নামে জমা করিয়ে কেরানীর হাতে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আমি।

ততক্ষণে ডাক্তার রোগীর প্রাথমিক পরীক্ষা শেষ করেছেন। স্যুট-পরা ডাক্তার রোগীর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তাকে পরীক্ষা করছিলেন; হয়ে গেলে উঠে আমার কাছে এসে বললেন, বড় রকম কোন জখম হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। বুকটাই যা একটু খারাপ দেখছি। তা রেখে যান ওকে। এর পর যা করবার তা আমরাই করব।

আমি সসঙ্কোচে বললাম, লোকটি একে গরীব, তায় নির্বান্ধব। দামী ওষুধ-টষুধ যদি লাগে—

লাগলে আমরাই দেব।—হাসিমুখে বললেন ডাক্তার।

হাড়ের ছবি-টবি যদি নিতে হয়?

দরকার হলে সে ব্যবস্থাও আমরাই করব।

তবুও সংশয়ের দৃষ্টিতে আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছি দেখে তিনি হেসে বললেন, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? তা আমরা নাও যদি কিছু করি তা হলেও আপনি ওর জন্য আর কি করবেন? যত ভাল মানুষই আপনি হোন না কেন, ডাক্তার তো আপনি নন!

আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, না, আপনাকে অবিশ্বাস করি নি আমি। শুধু ভাবছিলাম যে, ওর চিকিৎসার জন্য অতিরিক্ত কিছু টাকা আপনার কাছে রেখে যাব কি না!

কোন দরকার নেই।

ডাক্তার কথা ছাড়াও তাঁর মুখের হাসি ও হাতের ইঙ্গিতে আশ্বাস দিলেন আমাকে। তারপর আবার বললেন, মোটামুটি সব ব্যবস্থাই এখানে আছে। আর যা নেই তা এই দুর্গম স্থানে হাজার টাকা খরচ করলেও সময়মত পাওয়া যাবে না। সুতরাং দার্শনিকের মনোবৃত্তি নিয়ে ওকে রেখে যান এখানে। বদরীনাথ থেকে ফেরবার পথে আশা করি যে, ওকে আপনারা সঙ্গে নিয়েই যেতে পারবেন—যদি তাই ইচ্ছা হয় আপনাদের।

অতদূর বাড়িয়ে তখন ভাবতে পারছিলাম না আমি ; আর যা ভাবছিলাম তা স্বল্প পরিচয়ের ক্ষেত্রে বলাও যায় না। সুতরাং ঘুরিয়ে বললাম, দেশেই ফিরে যাচ্ছি আমরা। যে ধস দেখে এসেছি তাতে আবার ওই পথে চলবার সাহস হচ্ছে না।

শুনে কিন্তু অন্যান্য অনেকের মত ডাক্তারও বিস্মিত। আমার মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, এত কাছে থেকে ফিরে যাবেন দর্শন না করেই ? কেউ কি তা করে ?

উত্তরে আবার বললাম সেই সড়কের কথাই। কিন্তু ডাক্তার আশ্বাস দিলেন : সড়কের কথা ভেবে ভয় পাবেন না। আমাদের রাষ্ট্রপতির গৃহিণী আজই এই পথে যাচ্ছেন বদরীনাথ দর্শন করতে। সুতরাং আর কি রাস্তা খারাপ থাকতে পারে ? এখন সামনে এগিয়ে গেলেই দেখতে পাবেন যে, এই গাড়োয়াল জিলার সব ইঞ্জিনিয়র আর সব মজুর ভাঙা পথ মেরামত করতে লেগে গিয়েছে।

বলতে বলতে একটু যেন ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠল ডাক্তারের ওষ্ঠপ্রান্তে।

হতেও পারে। লাল সাঙ্গার লাল রঙ মুছে দিলে কি হবে, যে বিদ্বেষ ও বিদ্রোহের প্রতীক ওই রঙ তার প্ররোচনা আসে যে বৈষম্য থেকে তা তো দূর হয় নি। কারণ থাকলে কার্যকে ঠেকাবে কে ? স্বাধীন ভারতে রাজারাণী না থাকলেও রাজকীয় আড়ম্বর অব্যাহত রয়েছে বলে জনচিত্তের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ হয়তো এই সরকারী ডাক্তারের মনেও কমবেশী সংক্রামিত হয়েছে। কিন্তু তখন নিজের সমস্যা নিয়েই রীতিমত বিব্রত আমি। সুতরাং কথা আর বাড়ালাম না। ডাক্তারের মন্তব্যের কোন উত্তর না দিয়ে বাহাদুরের কাছে গেলাম বিদায় নিতে। আর তখনই, আমি চলে যাচ্ছি শুনেই সে আমার দুই পা

জড়িয়ে ধরে আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, আপ তো মেরে মাতা-পিতা হ্যায়, বাবুজী। মুঝকো ছোড়কর মত জায়ো।

আবার যেন ধস নামছে আমার চোখের সামনে। আবার কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা আমার। কিন্তু জিতেন দেখি হাসছে। আমি বিব্রতভাবে তার মুখের দিকে তাকাতেই সে হাসতে হাসতেই বললে, এটা প্রকৃতির পরিশোধ। এতদিন যে বেশ এড়িয়ে এসেছেন আপনি, এই তার প্রতিফল। পিতা-মাতা হবার দায় যে কি তা বুঝুন এখন।

ডাক্তারও দেখলাম যে হাসছেন। তিনিও একটু খোঁচা দিয়েই বললেন, কত যাত্রীর কত কুলিই তো এ পথে চলতে চলতে জখম হয়। আর সব যাত্রীই পথেই তাদের ফেলে রেখে অন্য কুলি ভাড়া করে এগিয়ে যায়। আপনারা যখন সাধ করে উলটো আচরণ করেছেন, তখন ও বেটা আপনাদের পেয়ে বসবে না তো কি!

তবে তার পরেই তিনি স্বয়ং এবং হাসপাতালের আর সব লোক বাহাদুরকেও বোঝাতে আরম্ভ করলেন। নানাভাবে তাঁরা আশ্বাস দিলেন ওকে। ডাক্তারের নিজের মুখের কথা এবং চোখের ইঙ্গিতে আমার সমস্যার সাময়িক একটা সমাধানও পেয়ে গেলাম আমি। সুতরাং বাহাদুরের দৃষ্টি এড়িয়ে তাকে আমি বললাম, আমরা একেবারে চলে যাচ্ছি নে বাহাদুর—উপরে যাচ্ছি নাওয়া-খাওয়ার জন্য। তা হয়ে গেলেই ফিরে আসব আবার।

বাহাদুরের দৃঢ় মুষ্টি থেকে আমার পা-খানিকে ছাড়িয়ে নিয়ে উপরে উঠে এসেছিলাম। কিন্তু আমার নিজের মন আমাকে মুক্তি দিচ্ছে কোথায়?

আধঘণ্টা পরে পরেই বাস ছাড়ছে। যেদিকে খুশি যেতে পারি এখন। তবুও টিকিট-ঘরের কাছেও যেতে পারলাম না।

জিতেনের মনেও বুঝি ওই একই দ্বন্দ্ব চলছিল। কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে পায়চারি করবার পর সে আমার কাছে এসে বিরক্ত কণ্ঠে বললে, ভালই হত ওকে সোজা শ্রীনগরে নিয়ে গেলে—ওর আপনজনের কাছে ওকে ফেলে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে চলতে পারতাম আমরা।

তাতেই মনে পড়ে গেল আমার যে, দিন দুই পূর্বে এই চামৌলিতে বসেই রুক্মিণীর পিতার নাম ঠিকানা আমার নোটবইতে টুকে নিয়েছিলাম আমি। তাড়াতাড়ি বই খুলে দেখলাম যে, ঠিকই আছে লেখাটা। তাই জিতেনকে

দেখিয়ে আমি বললাম, এই লোকটিকে একখানা চিঠি লিখে সব খবর জানিয়ে দিলে হয় না? খবর পেলে সে আসতেও পারে এখানে।

একটু দেরিতে উত্তর দিল জিতেন। চিন্তিত মুখে আবার কিছুক্ষণ পায়চারি করবার পর সে গম্ভীরস্বরে বললে, তা হলে চিঠি নয়, 'তার' করতে হবে। আর বাসভাড়াটাও সেই সঙ্গে পাঠিয়ে দিলে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়।

প্রস্তাবটি আমার কাছেও ভালই লেগেছিল। তদনুসারে পোস্ট-আপিসের কাজটা সেরে আসবার পর জিতেন উৎফুল্ল হয়ে বললে, এইবার বিবেকের কাছে বেকসুর খালাস আমরা। এবার চলুন ওই পিপুলকুঠির দিকেই। ওখান থেকে নতুন একটি কুলি নিয়ে কাল সকালে আবার বদরীনাথের পথে যাত্রা করা যাবে।

কিন্তু 'উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে'। আবার বাধা পড়ল।

ভাঙা পথ মেরামত হয়েছে খবর পেয়েছি। বাহাদুর কুলির যে অচল দেহটা বোঝা হয়ে আমাদের পঙ্গু করেছিল তাকেও কাঁধের উপর থেকে নামাতে পেরেছি। বিবেকের বাধাও আর নেই এবং আমার নিজের ভাঙা পায়ের ব্যথাটাকেও অতিক্রম করবার মত জোর এসে গিয়েছে আমার মনে। তবুও দেখি যে পথ বন্ধ। এবার বেঁকে বসল আমাদের শূন্য পকেট।

দুজনে হিসাব করে টাকা এনেছিলাম। কিন্তু হিসাবের অতিরিক্ত অর্থ ইতিমধ্যেই খরচ করে বসে আছি। যে কটি টাকা অবশিষ্ট আছে তা ওই চামৌলি থেকেই কলকাতায় ফিরে যাবার জন্যও যথেষ্ট নয়। এখন আবার দ্বিতীয় একটি কুলি নিয়ে অতিরিক্ত দিনসাতেকের জন্য সামনের অনিশ্চিত পথে যাত্রা করব কোন্ ভরসায়!

অল্প টাকা বারবার গুনলে পারমাণে বৃদ্ধি পায় কি না তাই পরখ করলাম কিছুক্ষণ। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। নিরাশ হয়ে জিতেনের মুখের দিকে চেয়ে বললাম, ও সাধটা এবারের মত শিকেয় তুলেই রাখতে হবে, কারণ টাকা ফুরিয়ে গিয়েছে।

টাকা না থাকার যে যুক্তি তা একেবারে অকাট্য। জিতেনের মত বেয়াড়া লোকও এবার আর তা খণ্ডন করতে চেষ্টা করল না। উত্তরে বদরীনাথ পর্বতশ্রেণীর দিকে কিছুক্ষণ উদাস বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবার পর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে সে বললে, তবে ফিরেই চলুন। কোন্ পথ ধরবেন—হরিদ্বার না কোটদ্বারের?

দুটিই বাসের পথ। তবে চামৌলি থেকে গাড়োয়াল জিলার রাজধানী পৌড়ি হয়ে কোটদ্বার রেলস্টেশনে যাবার পথ অর্ধেকেরও বেশী নতুন হ জেনে সেই পথে ফিরে যাওয়াই ঠিক করলাম আমরা।

যাত্রা করবার পূর্বে আর একবার বাহাদুরকে দেখে আসতে হবে।

ফিরেই চলেছি—কোটদ্বারের দিকেই।

আজ আর একটুও অনিশ্চয়তা নেই, কুহকিনী আশার বিদ্যুদ্দীপ্তি মনের দিগন্তে একবারও ফুটে উঠছে না। মনের মধ্যে আজ নির্মম সত্যের কঠিন উপলব্ধি। যাত্রা আমার ব্যর্থ হয়েছে—দর্শনের পূর্বেই বদরীনারায়ণের মন্দিরের দিক থেকে একেবারে বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে দ্রুতগামী মোটরগাড়িতে চড়ে সত্যসত্যই ঘরের দিকে ফিরে চলেছি এখন। জীবনের এই অপরাহ্ণ-বেলায় ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভেও আশার হাতছানি দেখতে পাই নে। যে দুর্গম পথ, আর ব্যয়সাধ্য ভ্রমণ। অসম্পূর্ণ যাত্রা সম্পূর্ণ করবার জন্য আর কি কোনদিন এই হিমালয়ে আসতে পারব!

এক একটি শৃঙ্গ, এক একটি উপত্যকা পার হই, আর মনে হয় যে জন্মের মতই পিছনে ফেলে চললাম তাকে।

তবু মনে আজ ক্ষোভ নেই। সেই বোবা কান্নাটা বুকের ভিতর থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত আজ আর ঠেলে ঠেলে উঠছে না।

গাড়িতে চাপবার পূর্বে বাহাদুরকে আবার দেখে এসেছি। চোখের দেখা বই নয়—তখন ঘুমিয়ে ছিল সে। পা টিপে টিপে তার শয্যার কাছে গিয়ে দুদণ্ড তার মুখখানি দেখেই আবার পা টিপে টিপেই বেরিয়ে এসেছি। ভালই হয়েছে তাতে—তার কান্না আর কানে শুনতে হয় নি। আর ভালই দেখেছি তাকে -বেশ শান্তিতেই ঘুমোচ্ছিল সে। ডাক্তারও বলেছেন যে, সে ভালই আছে। হাড়গোড় নাকি ভাঙে নি—পায়ের কয়েকটি মাংসপেশী অকস্মাৎ সঙ্কুচিত হয়ে সেদিন ওই বিভ্রাট ঘটিয়েছিল। তার সঙ্গে আছে 'শক' আর একটু নিউমোনিয়া—এই পেনিসিলিনের যুগে যাকে রোগ বলেই বিবেচনা করা হয় না। দৃঢ় বিশ্বাসের গভীর স্বরে ডাক্তার আশ্বাস দিয়েছেন আমাকে যে, তিন-চার দিনের মধ্যেই বাহাদুর সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যাবে।

কিন্তু মনে যে আমার ক্ষোভ নেই, ওই আশ্বাসই তার একমাত্র কারণ নয়। আমার হৃদয়ের পাত্রটি আরও অনেক উপাদানে পূর্ণ হয়ে আছে বলেই ক্ষোভ আর সেখানে প্রবেশ করবার পথ পায় নি।

আশ্চর্য! দেবদর্শন যে আমার হয় নি তাই যেন এখন মানতে চায় না আমার মন।

না-ই বা পেলাম ছোট একটি মন্দিরের মধ্যে চতুর্ভুজ বিগ্রহের দর্শন! বিরাট বদরীনাথ তো আমাকে বিমুখ করেন নি! পথ চলতে চলতে দূর থেকে অনেকবারই দেখেছি তাঁর ঝলমল কিরীটকুণ্ডল, তাঁর প্রশান্ত বয়ানে প্রসন্ন নয়নের স্নিগ্ধ দৃষ্টি। পৌড়ি শহরে বাস থামবার পর আরও একবার দর্শন দিলেন বদরীবিশাল।

নির্মল প্রভাতে তরুণ সূর্যের সোনালী কিরণে উদ্ভাসিত দেখলাম অনেক দূরে অর্ধবৃত্তের আকার এবং প্রায় রামধনুবর্ণের বোধ করি অর্ধেকটা হিমালয়ই—চৌখাম্বা, ত্রিশূল এবং আরও কয়েকটি দুর্জয় শৃঙ্গকে পাশে নিয়ে কেদার-বদরী উভয় তীর্থই যেন আমাকে দর্শন দেবার জন্যই বিপুল গরিমা ও বিরাট মহিমা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

মন্দির পর্যন্ত যেতে পারলেও আমার ছোট ছোট দুটি চশমাপরা চোখ দিয়ে আর বেশী কি দেখতাম?

আর কেমন করে বলি আমি যে, তরঙ্গিত হিমালয়ের শিখরে শিখরে কেবল সুদূরের বিস্ময় হয়েই আমাকে তিনি দর্শন দিয়েছেন? খুব কাছে থেকেও হিমালয়ের যে অপরিমেয় ও অতুলনীয় শোভা দেখলাম দিনের পর দিন, তা কি ছিল কেবলই গাছ, মাটি, পাথর?

ইতিপূর্বে দেশ-বিদেশে কত দৃশ্য, কত মানুষই তো দেখেছি। খুব কাছে থেকে দেখলেও তা ছিল যেন রেলগাড়িতে চলতে চলতে দেখা—চোখের সামনে ক্ষণিকের জন্য ফুটে উঠেই মিলিয়ে গিয়েছে তা। কিন্তু বিগত প্রায় তিন সপ্তাহকাল এই হিমালয়েরই অসংখ্য শিখরে-কন্দরে, উপত্যকায়-অধিত্যকায়, অরণ্যে-উপবনে, শিলায় ও সলিলে দুই চোখ ভরে যা দর্শন করেছি, তার কিছুই, এই এত দিন পরেও, কই, হারিয়ে বা ফুরিয়ে যায় নি তো!

আগে কোনদিন যা অনুভব করি নি, এ পথে তাই যে আমার সাক্ষাৎ উপলব্ধি। দূরে ওই আকাশচুম্বী ত্রিশূল শৃঙ্গের মতই এও এক অনন্ত বিস্ময়। আর এ তো সুদূরের নয়, আমার অন্তরেই যে অধিষ্ঠান এর।

এবার আমার অবিরাম গতিপথে চঞ্চল ইন্দ্রিয়সমূহের অত্যন্ত সীমিত শক্তির আওতার মধ্যে হয়তো ক্ষণিকের জন্যই ধরা পড়েছিল যত দৃশ্য, যত ধ্বনি, যত রস, তার সবই তো দেখছি যে স্থান-কাল-পাত্রকে অতিক্রম করে আমারই মনের মধ্যে অক্ষয় হয়ে রয়েছে। অবচেতন মনে ম্রিয়মান স্মৃতির

এক বিশৃঙ্খল স্তূপ নয় তা। টুকরো টুকরো দৃশ্য, বিচ্ছিন্ন ঘটনা, সাময়িক সুখ-দুঃখের মৃদু হিল্লোল ইন্দ্রিয়ের সঙ্কীর্ণ দ্বারপথে, আমার অন্তরের মণিকোঠায় প্রবেশ করে ফুল হয়ে ফুটেই কেবল ওঠে নি, না জানি কোন্ নিপুণ মালাকরের কোমল অঙ্গুলির জাদুস্পর্শে অদৃশ্য এক স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত হয়ে নয়নমনোহর বিচিত্র একগাছা মালা হয়ে বিরাজ করছে সেখানে। মধুমত্ত ভৃঙ্গসম আমার লুব্ধ মনের এখন পরম আশ্রয় তা—অনন্ত বিচরণক্ষেত্র।

সেইসব চড়াই-উতরাই, নিবিড় অরণ্য, কল্লোলিনী স্রোতস্বিনী, আকাশচুম্বী পর্বতমালা, অমল-ধবল বরফের তরঙ্গায়িত মহাসমুদ্র, অসীমের সাদর আমন্ত্রণ, রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্য ও জীবনের লীলায়িত হিন্দোল—এখনও চোখ বুজলেই সবই তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

রূপ নয়, অপরূপও নয়—রূপে রূপে প্রতিরূপ। যাঁর, তিনিই তো জীবনের দেবতা বদরীনারায়ণ। নিজের অজান্তে প্রতি পদক্ষেপেই জাগ্রত বদরীনাথকে চোখ ভরে দর্শন করেছি বলেই তো রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের এত প্রাণময় স্মৃতি আমার মনে।

এই তাঁর শাশ্বত বিলাসক্ষেত্রে তিনিই আমাকে দেখিয়েছেন সীমার মাঝে অসীমের, নিসর্গের কোলে অনৈসর্গিকের অভিব্যক্তি। তাই এখনও চোখ বুজলেই দেখছি সেই সব বালক-বৃদ্ধ-নরনারীকেও—যাঁরা আমার যাত্রাপথে তাঁদের সাময়িক সাহচর্য ও ক্ষণিকের প্রীতির সঙ্কীর্ণ বাতায়নপথেও মানুষের নারায়ণের বিপুল মহিমা বার বার আমার মনের চোখের সামনে প্রকাশ করে দেখিয়েছেন। যে সৌরভ, যে হাসি, যে বেদনা পিছনে ফেলে এলাম মনে করেছিলাম তার সবই তো এখন দেখছি আমার মনের মন্দিরেই অক্ষয় হয়ে বিরাজ করছে। রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিপূর্ণ আমার স্মৃতির মধুচক্র। ক্ষোভ সেখানে ঠাঁই পাবে কোথায়?

"যখন নয়ন মুদিয়া থাকি, অন্তরে গোবিন্দ দেখি,"—বলেছিলেন বৈষ্ণব মহাজন। অতবড় দাবি করতে পারি নে আমি। তবে দর্শন হল না বলে কোন ফাঁকে মনে আমার একটু ক্ষোভ যদি জাগেও তা হলেও এখন আর সান্ত্বনার অভাব হয় না। আমার মনের বীণার তারে একালের মহাজন মহাকবির নতুন সুর তখনই বেজে ওঠে। একবার ওষ্ঠপ্রান্তেও উছলে উঠল তা।

পৌড়ি ছেড়ে আসবার পর জিতেনকে বিষণ্ণ দেখে তার একখানা হাত ধ
আমি বললাম :

"জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।"

—শেষ—